নিবেদিতা স্মৃতি

বিশ্বনাথ দে

সম্পাদিত

পরিবেশক

অনির্বাণ প্রকাশনী

৩এ গঙ্গাধরবাবু লেন

কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
১লা আষাঢ়। ১৩৭২

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
১৮ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ-চিত্র
প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক, ছবি ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
অজিতকুমার সামই
ঘাটাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

ভগিনী নিবেদিতার একান্ত অনুরাগী

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু-অবলা বসুর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

এই প্রসঙ্গে

ভগিনী নিবেদিতা ভারতমাতার উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দের এক অনুপম উপহার। স্বামী বিবেকানন্দ যেন তাঁকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার দৃঢ়মূল থেকে ছিন্ন করে এনে রোপণ করেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভূমিতে।

ভগিনী নিবেদিতা এমনই এক মহাপ্রাণ রমনী, যিনি বিদেশিনী হয়েও ভারতকে মাতৃভূমি জ্ঞান করে তার সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। জন্ম তাঁর সুদূর আয়র্ল্যাণ্ডে, ইংলণ্ডে লালিত-পালিত আর ভারত ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। জীবন ও কর্মের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর আদর্শবাদ ও আত্মোৎসর্গ তাঁকে শাশ্বত জীবনের অধিকারী করেছিল।

ভগিনী নিবেদিতার পিতা-মাতা ছিলেন ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান। জন্মক্ষণেই তাঁর মাতা তাঁকে উৎসর্গ করেন ভগবৎ-সেবায়। ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং ছিলেন আত্মত্যাগ সত্যানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিতা। অপেক্ষা ছিল শুধু এক মহৎ প্রাণের জ্বলন্ত স্পর্শ—যে স্পর্শে তাঁর অন্তরে আত্মত্যাগের সুপ্তবহ্নি জ্বলে উঠবে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতে হলো তারই সূচনা।

'হিন্দুযোগী'র সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত না হবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন এবং নিজের প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধ সত্ত্বেও হিন্দুযোগীর চরিত্র ও শিক্ষার মহত্ত্ব তাঁকে অভিভূত করে। তাই তিনি নিজেই এই সাক্ষাতের পরিণাম সম্বন্ধে লিখেছেন, 'ইনি যে বীরোচিত উপাদানে গঠিত ছিলেন, তা আমি হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম, এবং তাঁর স্বজাতিপ্রেমের নিকট আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে চেয়েছিলাম।'

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গুরুর নিকট যে গভীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন, তাঁর উপর গুরুর অগাধ বিশ্বাস এবং যিনি তাঁকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন সেই শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ—এই সকলের ফলেই তাঁর আদর্শের পথে, সাধনার পথে দৃঢ় পদক্ষেপ করা সম্ভব

হয়েছিল। নানাভাবে তিনি দুর্ভাগা পরাধীন ভারতের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। ভারতের তরুণ সম্প্রদায়কে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন দেশপ্রেমে, আহ্বান করেছিলেন ভারতমাতার মুক্তি-সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে। ভারতীয় নারীর শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে তিনি অনলস পরিশ্রম করে গেছেন। তদানীন্তন ভারতের বহু জ্ঞানী-গুণী-প্রতিভাবান মনীষী-ব্যক্তির উপর তিনি আপন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, রাজনীতি—সর্বক্ষেত্রেই ছিল ভগিনী নিবেদিতার অবাধ পদসঞ্চার।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও ভগিনী নিবেদিতা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজনীতি ছিল আক্রমণশীল এবং আবেদন-নিবেদনমূলক নরমপন্থী রাজনীতি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেব নেতৃবৃন্দেব বন্ধু, কারণ তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ভারতবর্ষে 'ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে যখন সমগ্র জাতি কোন দুর্বলতা, দুর্ভাগ্য অথবা অভিযোগের দাবীতে নয়, পরন্তু এক মহান জাতীয়তা, এক উত্তরাধিকারের বিরাট সদা-জাগ্রত চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হবে'—এই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

ভগিনী নিবেদিতার জীবন ছিল কঠোর দুঃখ, পরীক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধনাপূর্ণ। তিনি বলেছেন, 'সাহসের সঙ্গে বরণ কর তোমার নিজের অন্ধকার, তোমার দীপালোক বহুজনের অন্ধকার দূর করে আনন্দ দান করবে। তুচ্ছতম কাজটিও আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন কর, বিসর্জন দাও উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা।'

তাই, আজ আমাদের এই আকাঙ্ক্ষাসর্বস্ব, অবিন্যস্ত, এলোমেলো জীবনযাত্রার দিনে 'নিবেদিতা-স্মৃতি' গ্রন্থ প্রকাশ করার প্রয়োজনবোধ দেখা গেছে। এই মহিয়সী নারীর মহান নিবেদিত জীবন দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করুক—এই শুধু কামনা।

—বিশ্বনাথ দে

সূচীপত্র



নিবেদিতার উদ্দেশ্যে

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

পবিত্রা নিবেদিতা!

বৎসে!

তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আনন্দ করিতে।

আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়? দার্জিলিঙ্ যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলে, 'আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।'

আমি ত জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে, দেখা করিতে আইস না। শুনিতে পাই, মৃত্যুশয্যায় আমাকে স্মরণ করিয়াছিলে; যদি দেবকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া কখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ এই উপহার গ্রহণ কর।

আমার আদর্শ দুই একটি কথায় বলা যাইতে পারে। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে মনুষ্য-সমাজে তাহা প্রকাশ করা এবং জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এই দেবত্ব কি ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায় তাহার উপায় নির্ধারণ করা।

কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই সংসার। পুরুষ হউক, নারী হউক, অত্যাচারিতের প্রতি আমি দয়া বোধ না করিয়া পারি না; আবার যে অত্যাচার করে তাহার প্রতিও আমার তেমনি করুণা।

আমি দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখিতেছি যে, অজ্ঞতা হইতেই মানুষের যত দুঃখ-কষ্ট, অন্য কিছু হইতে নয়। পৃথিবীতে আলোর দিশারী কে হইবে? অতীতে আত্মোৎসর্গই ছিল নীতি। হায়, কত যুগ পরে আমরা আবার তাহা ফিরিয়া পাইব? এই পৃথিবীর কল্যাণ সাধনের জন্য যাঁহারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সাহসী, তাঁহাদেরই আত্মোৎসর্গ করিবার দিন আজ। অনন্ত করুণা ও মৈত্রীতে পূর্ণ অসংখ্য বুদ্ধেরই আজ প্রয়োজন।

বর্তমানে পৃথিবীর সকল ধর্মই প্রাণহীন, অসার। জগতে এখন চরিত্রবলেরই প্রয়োজন। জগৎ এমন সব মানুষ চাহিতেছে যাহাদের জীবন জ্বলন্ত, নিষ্কাম প্রেমের পূর্ণাহুতিস্বরূপ। সেই প্রেমের শক্তিতে উচ্চারিত বাক্যে বজ্রের মত কার্য করিবে।

আমার এই নিশ্চিত ধারণা হইয়াছে যে, তোমার মন সর্বসংস্কার-মুক্ত; তোমার মধ্যে সেই শক্তি নিহিত আছে যাহা এই পৃথিবীকে নাড়া দিতে পারে। এই রকম আরো অনেক মানুষ আসিবে। আমি চাই বলিষ্ঠ বাক্য, বলিষ্ঠতর কাজ। জাগো, জাগো মহাপ্রাণ! জগৎ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। তোমার নিদ্রা যাইবার

অবসর কোথায়? যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আহ্বানে নিদ্রিত দেবতা জাগিয়া উঠিয়া সাড়া না দিতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আহ্বান চলিবে। জীবনে আর কী দরকার? ইহা অপেক্ষা মহৎ কাজ পৃথিবীতে আর কি আছে?

আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করি না, কাজ করিতে করিতে কাজের খুঁটিনাটি ঠিক করি। পরিকল্পনা-কথা ভাবি না। উহা আপনা হইতেই ঠিক হইয়া যায়। আমার কথা শুধু জাগো, জাগো।

আমার আশীর্বাদ সর্বক্ষণের জন্য তোমাকে ঘিরিয়া থাকুক।

ভগিনী নিবেদিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনরি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইঁহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজি, এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভাল বোধ হয় না।

মোটের উপর তাঁহার এই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষেয় ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসঙ্গত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় ত জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা ত সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটারকমে কাজ চালাই। তাহাতে

অন্ধকারে ঢেলা মারা হয়—তাহাতে অনেক ঢেলার অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মত চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতর পাইকারীভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।

যদিচ আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা, বেশ আপনার নিজের প্রণালীমতই কাজ করিবেন, আমি কোনো প্রকার ফরমাস করিতে চাই না। বোধ করি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, না, আমার এ কাজ নহে। বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন—সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনরির মত মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোনো একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।

তাহার পরে মাঝে মাঝে নানাদিক দিয়া তাঁহার পরিচয়লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি

গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

আজ এই কথা আমি অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।

নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনো প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগ-স্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কি, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্ব প্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড় জিনিস আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তুর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড় তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎজীবন ;—তাঁহার দিক হইতে

তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই ;—প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সে জন্য মানুষ যত প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন—নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না—নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিছু না—ভয় না, সঙ্কোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।

এই যে এতবড় আত্মবিসর্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না। এই আত্মবিসর্জনকে অত্যন্ত অসঙ্কোচে নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড় একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কি বুদ্ধি, কি হৃদয়, কি ত্যাগ, প্রতিভার কি জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করতে হইবে।

যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের গর্ব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনো আমরা গর্ব করিতেছি। তিনি যে আপনার জীবনকে এমন করিয়া দান করিয়াছেন সেদিক দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে আমরা সে পরিমাণে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি না, যে পরিমাণে এই ত্যাগস্বীকারকে আমাদের গর্ব করিবার উপকরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড় কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদেরই ধর্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই যত বড় করিয়া লইতেছি তাঁহার দিকের দানকে ততই খর্ব করিতেছি।

বস্তুত তিনি কি পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে—অর্থাৎ আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন একথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে

যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন—তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষেয় অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমান-কালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড় করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু নির্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।

যেমনি হৌক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেইদিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে, হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে যেটা চক্ষে পড়ে সেটা এই যে, তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবলভাবে কর্মী ছিলেন। কর্মের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছেই—কেন না তাহাকে বাধার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়—সেই বাধার নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু ভাব জিনিসটা অক্ষুণ্ণ অক্ষত। এই জন্য যাহারা ভাববিলাসী তাহারা কর্মকে অবজ্ঞা করে অথবা ভয় করিয়া থাকে। তেমনি আবার বিশুদ্ধ কেজো লোক আছে তাহারা ভাবের ধার ধারে না, তাহারা কর্মের কাছ হইতে খুব বড় জিনিস দাবি করে না বলিয়া কর্মের কোনো অসম্পূর্ণতা তাহাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না।

কিন্তু ভাবুকতা যেখানে বিলাসমাত্র নহে, যেখানে তাহা সত্য, এবং কর্ম যেখানে প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনা-মাত্র নহে, যেখানে তাহা ভাবেরই সৃষ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড়

হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘপ্রতিহত সূর্যের বর্ণচ্ছটার মত কিরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

ভগিনী নিবেদিতা যেসকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনটারই আয়তন বড় ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আবস্ত ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেখানেই দেখিযাছি বাহিবের বড় আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কাবণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবাবে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকাবে বড় কবিয়া দেখাইবাব জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড় করিয়া দেখাইতে হইলে যেসকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয় তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

এইজন্যই এই একটি আশ্চয দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার এমন অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে যে কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন তাহা পৃথিবীব লোকের চোখে পড়িবার মত একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা কবে না এও সেইরূপ। তাঁহাব এই কাজটিকে তিনি বাহিরে কোনোদিন ঘোষণা করেন নাই এবং আমাদের কাহাবও নিকট হইতে কোনোদিন ইহার জন্য তিনি অর্থ সাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। তিনি যে ইহার ব্যয় বহন কবিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।

তাঁহার শক্তি অল্প বলিয়াই যে তাঁহার অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র ইহা সত্য নহে।

একথা মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতার যে ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে

পারিতেন। তাঁহার যে-কোনো স্বদেশীয়ের নিকটসংস্রবে তিনি আসিয়াছেন সকলেই তাঁহার প্রবল চিত্তশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট যে খ্যাতি তিনি জয় করিয়া লইতে পারিতেন সেদিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন নাই।

তাহার পর এদেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া এখানেও তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুব্ধ করে নাই। অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে। কিন্তু শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। কারণ, দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ করিয়া লয়।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। অথচ নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্বেই এ কথার আভাস দিয়াছি তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত। তাঁহার এই পাশ্চাত্য-স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোন অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না—কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু—তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি

যাহা ভাল মনে করিতেন তাহাকেই জয়ী করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত জোর দিয়া লড়াই করিতেন, সেই জয়গৌরব নিজে লইবার লোভ তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতরকার সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এদেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।

অথচ তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহার মধ্যে রুচিগত বা বুদ্ধিগত আভিজাত্যের অভিমান ছিল ;—তিনি জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়াই যে তাহাদের নেতার পদের জন্য উমেদারী করেন নাই তাহা নহে। জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত – এ সম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্যবুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতই ভালবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই "পীপল্"কে এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি ত ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ব-বোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people

তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনি ত লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয় ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকট করিয়া জানিবার শক্তি আমবা লাভ করি নাই।

আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ঐরূপ কোনো একটি সমষ্টিগত সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে যে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি তাহাব কাবণ আছে। আমরা এইরূপ বৃহৎ ব্যাপক সত্তাকে কেবলমাত্র মন দিয়াই দেখিতে চাই, চোখ দিয়া দেখি না। যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোক-সাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ কবিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীববাসিনী একজন সামান্য মুসলমান রমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপব নহে --কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহাব শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।

লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি তাহাদের সংস্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সর্বতোভাবে জানিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন। তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম কথাকাহিনী পূজাপদ্ধতি শিল্পসাহিত্য তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কেবল বুদ্ধি দিয়া নয়

আন্তরিক মমতা দিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নিত্য পদার্থ আছে তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁজিয়াছেন। মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং একটি গভীর মাতৃস্নেহ বশতই তিনি এই ভালটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন। এই আগ্রহের বেগে কখনও তিনি ভুল করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু শ্রদ্ধার গুণে তিনি যে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন সমস্ত ভুল তাহার কাছে তুচ্ছ। যাঁহারা ভাল শিক্ষক তাঁহারা সকলেই জানেন শিশুর স্বভাবের মধ্যেই প্রকৃতি একটি শিক্ষা করিবার সহজ প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; শিশুদের চঞ্চলতা, অস্থির কৌতূহল, তাহাদের খেলাধূলা সমস্তই প্রাকৃতিক শিক্ষাপ্রণালী; জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রকারের একটি শিশুত্ব আছে। এইজন্য জনসাধারণ নিজেকে শিক্ষা দিবার ও সান্ত্বনা দিবার নানাপ্রকার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। ছেলেদের ছেলেমানুষী যেমন নিরর্থক নহে তেমনি জনসাধারণের নানাপ্রকার সংস্কার ও প্রথা নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা নহে—তাহা আপনাকে নানাপ্রকারে শিক্ষা দিবার জন্য জনসাধারণের অন্তর্নিহিত চেষ্টা—তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক শিক্ষার পথ। মাতৃ-হৃদয়া নিবেদিতা জনসাধারণের এই সমস্ত আচার ব্যবহারকে সেইদিক হইতে দেখিতেন। এইজন্য সেই সকলের প্রতি তাঁহার ভারি একটা স্নেহ ছিল। তাহার সমস্ত বাহ্যরূঢ়তা ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির চিরন্তন গূঢ় অভিপ্রায় তিনি দেখিতে পাইতেন।

লোকসাধারণের প্রতি তাঁহার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা একদিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর একদিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মত প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না—অথবা যেখানে রাজার কোনো অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছ

হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্যলোকের অসঙ্গত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন; কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার "পীপ্‌ল"দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা কিছু ভাল তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধা-দৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন। তাহার কারণ এ নয় যে সত্য গোপন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহার কারণ এই যে তিনি জানিতেন, অশ্রদ্ধার দ্বারা ইহাদিগকে আপমান করা অত্যন্ত সহজ এবং স্থূলদৃষ্টি লোকের পক্ষে তাহাই সম্ভব —কিন্তু ইহাদের অন্তঃপুরের মধ্যে যেখানে লক্ষ্মী বাস করিতেছেন সেখানে ত এই সকল শ্রদ্ধাহীন লোকের প্রবেশের অধিকার নাই— এইজন্যই তিনি এই সকল বিদেশীয় দিঙনাগদের "স্থূলহস্তাবলেপ" হইতে তাঁহার এই আপন লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, এবং আমাদের দেশের যেসকল লোক বিদেশীর কাছে এই দীনতা জনাইতে যায় যে, আমাদের কিছুই নাই এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার তীব্ররোষের বজ্রশিখার দ্বারা বিদ্ধ করিতে চাহিতেন।

এমন য়ুরোপীয়ের কথা শোনা যায় যাঁহারা আমাদের শাস্ত্র পড়িয়া, বেদান্ত আলোচনা করিয়া, আমাদের কোনো সাধুসজ্জনের চরিত্রে বা আলাপে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তি লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছেন; অবশেষে দিনে দিনে সেই ভক্তি বিসর্জন দিয়া রিক্ত হস্তে দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্রে যাহা পড়িয়াছেন সাধুচরিতে যাহা দেখিয়াছেন সমস্ত দেশের দৈন্য ও অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া তাহা দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের যে ভক্তি

সে মোহমাত্র, সেই মোহ অন্ধকারেই টিঁকিয়া থাকে, আলোকে আসিলে মরিতে বিলম্ব করে না।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার যে শ্রদ্ধা তাহা সত্যপদার্থ, তাহা মোহ নহে—তাহা মানুষের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের শ্লোক খুঁজিত না, তাহা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া মর্মস্থানে পৌঁছিয়া একেবারে মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিত। এইজন্য অত্যন্ত দীন অবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশকে দেখিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সমস্ত দৈন্যই তাঁহার স্নেহকে উদ্বোধিত করিয়াছে, অবজ্ঞাকে নহে। আমাদের আচার ব্যবহার, কথাবার্তা, বেশভূষা, আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়া-কলাপ একজন য়ুরোপীয়কে যে কিরূপ অসহ্যভাবে আঘাত করে তাহা আমরা ঠিকমত বুঝিতেই পারি না, এইজন্য আমাদের প্রতি তাহাদের রূঢ়তাকে আমরা সম্পূর্ণ ই অহেতুক বলিয়া মনে করি। কিন্তু ছোট ছোট রুচি, অভ্যাস ও সংস্কারের বাধা যে কত বড় বাধা তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, কারণ, নিজেদের দেশের ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে আমাদের মনেও সেটা অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে। বেড়ার বাধার চেয়ে ছোট ছোট কাঁটার বাধা বড় কম নহে। অতএব এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার বাঙালীপাড়ার এক গলিতে একেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া যে বাস করিতেছিলেন তাহার দিনে রাত্রে প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র বেদনার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল। এক প্রকার স্থূলরুচির মানুষ আছে তাহাদিগকে অল্প কিছুতেই স্পর্শ করে না—তাহাদের অচেতনতাই তাহাদিগকে অনেক আঘাত হইতে রক্ষা করে। ভগিনী নিবেদিতা একেবারেই তেমন মানুষ ছিলেন না। সকল দিকেই তাঁহার বোধশক্তি সূক্ষ্ম এবং প্রবল ছিল; রুচির বেদনা তাঁহার পক্ষে অল্প বেদনা নহে; ঘরে বাহিরে আমাদের অসাড়তা, শৈথিল্য, অপরিচ্ছন্নতা, আমাদের অব্যবস্থা ও সকল প্রকার চেষ্টার অভাব, যাহা পদে পদে আমাদের তামসিকতার পরিচয় দেয় তাহা প্রত্যহই

তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেইখানেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই যে প্রতিমুহূর্তের পরীক্ষা, ইহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন।

শিবের প্রতিই সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতীও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদেব সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মত এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?

একদিন স্বয়ং মহেশ্বর ছদ্মবেশে তপঃপরায়ণা সতীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বি, তুমি যাঁহার জন্য তপস্যা করিতেছ তিনি কি তোমার মত রূপসীর এত কৃচ্ছ্রসাধনের যোগ্য? তিনি যে দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ, তাঁহার যে আচার অদ্ভুত। তপস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে, তথাপি তাঁহারি মধ্যে আমার সমস্ত মন "ভাবৈকরস" হইয়া স্থিত রহিয়াছে।

শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি

বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল। এই জন্য তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাঁহার রূপের অভাব দেখিয়া রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে চলিয়া যায় তিনি তাঁহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর করিয়া দেয়—যেন এই কথাটিকে নিঃসংশয় সত্যরূপে জানিতে পারি যে মানুষের মধ্যে শিব আছেন, দরিদ্রের জীর্ণকুটীরে এবং হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যেও তাঁহার দেবলোক প্রসারিত—এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য বিরূপতা ও কদাচারের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া এই পরমৈশ্বর্যময় পরমসুন্দরকে ভাবের দিব্য দৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন তিনি মানুষের এই অন্তরতম আত্মাকে পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং যাহা কিছু আছে সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লন। তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন, আরামকে তুচ্ছ করেন, সংস্কারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্তকালের জন্য দৃক্‌পাতমাত্র করেন না।

নিবেদিতার মহাপ্রাণতা ও ত্যাগের কথা আমরা ধারণা করিতে পারিব না। দেশ উপযুক্ত হইলে তাঁহার মূল্য বুঝিবে। কতদিন তাহার সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিয়াছি একটি পুতুল বা এক টুক্‌রা পাথর দেখিয়া বিহ্বল হইয়া কি সৌন্দর্য, প্রাচীন ভারতের কি গৌরব তাহার মধ্যে দেখিতে পাইতেন, আমরা তাহা দেখিয়া অবাক হইতাম। এই পরাধীন দেশে জন্মিয়া আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

সকল বিষয়ে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। যদি তিনি তাঁহার স্বদেশে য়ুরোপে কাজ করিতেন তবে নাম যশ অর্থ তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িত। সে সব ত্যাগ করিয়া প্রায় অর্ধাহারে তিনি আজীবন আমাদের দেশের জন্য তিলে তিলে প্রাণ দিলেন।

তিনি সত্যই ভারতের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

নিবেদিতা

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

নিবেদিতা ছিলেন বিবেকানন্দের উপসংহার। কিন্তু উপসংহার বলিয়া তিনি ঠিক বিবেকানন্দের প্রতিরূপ ছিলেন না। নিবেদিতার জীবনের সামান্যমাত্রও স্পর্শ যাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই সেই জ্যোতির্ময় জীবনের বিশালতা, গভীরতা ও শক্তিসঞ্চার দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। একটি দুর্লভ সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ আমরা পাই নিবেদিতার মধ্যে। নিবেদিতার চরিত্রে এবং চিন্তায় দেখিয়াছি ভারতীয় ভাবধারা এবং সাংস্কৃতিক মহিমার সহিত আধুনিক ভাবধারাও উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়াও নিবেদিতা ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। ভারতের শিক্ষা কি, সাধনা কি, সমাজের মর্মকথা কি, তাহা তিনি তেমন করিয়াই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যেমন করিয়া বুঝিলে আমরা যথার্থ ভারতীয় হইয়া উঠিতে পারি—এক বিদেশিনীর পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

কিছুকাল আগে নিবেদিতা বিদেশে আমার রোগশয্যাপার্শ্বে থাকিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। আজ আমার পালা। আমাদের সকলেরই আশা ছিল তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অন্তিম-মুহূর্ত আসিয়া গিয়াছে।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিবেদিতা আমাদিগকে সহাস্য বদনে অভ্যর্থনা করিতেন, কথা যাহা বলিতেন তাহার মধ্যেই তাঁহার চিত্তের নির্ভীকতার পরিচয় পাইতাম। সব সময়েই ভারতের মেয়েদের শিক্ষার কথা ভাবিতেন, আলোচনা করিতেন। তাঁহার জীবনের সমস্ত সঞ্চয়, পুস্তকের যাবতীয় আয়—এ সবই তিনি ভারতের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

দার্জিলিঙ-এ আসিবার কয়েকদিন পূর্বে নিবেদিতা প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম হইতে একটি প্রার্থনা বাণী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং উহা মুদ্রিত করাইয়া তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার বিদায়-বাণী। ভগিনী নিবেদিতার সমগ্র জীবনই ছিল প্রার্থনা……উমা-হৈমবতীর যে উপাখ্যান তিনি আমাদের নিকট জীবন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন, নিবেদিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেই উপাখ্যানটি আমার বার বার মনে পড়িতেছিল। এই শরৎ ঋতুতেই তো উমা পিত্রালয়ে আসিয়া থাকেন। আমার সম্মুখেই তো আর একটি উমাকে দেখিতেছি, যিনি বহু জন্মের পরে তাঁহার নিজ আবাস ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন।……তারপর অন্তিম-মুহূর্তে নিবেদিতার কণ্ঠ হইতে যখন অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইল ঃ

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥

তখন দেখিলাম তাঁহার সমস্ত মুখখানি একটি দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

নিমীলিত নয়নে নিবেদিতা ভারতের ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন।

সন্ধ্যাকালে আমরা সকলেই বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া ধ্যান করিতাম। বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, এ বৃক্ষটি তাহারই বংশধর। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ইহার একটি শাখা সিংহলে লইয়া গিয়া সেখানকার রাজা তথায় প্রোথিত করেন। অল্প কিছু দূরে একখানি গোলাকার প্রস্তরখণ্ড ছিল, তাহার উপরে একটি বজ্র খোদিত ছিল। কথিত আছে, এই বজ্রটি স্বয়ং ইন্দ্র বুদ্ধদেবকে দিয়াছিলেন। এই বজ্রটি দেখিয়া নিবেদিতা বলিলেন, ইহাকে ভারতের জাতীয় চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করা কর্তব্য। আমরা সকলে ইহার অর্থ জানিতে চাহিলে নিবেদিতা বলিলেন, ইহার অর্থ এই যে, যখন কেহ সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেন, তখন তিনি এই বজ্রের মতই শক্তিশালী হইয়া দেবতাদের নির্দিষ্ট কার্য করেন। এই জন্যই বোধ হয় নিবেদিতা এই বজ্র-চিহ্নকে তাঁহার পুস্তকের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই একই কারণে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের শীর্ষদেশে জগদীশচন্দ্র এই বজ্র-চিহ্ন স্থাপন করেন।

সন্ধ্যাবেলা নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ এবং আমরা একত্রে বাহির হইতাম। সুজাতা বুদ্ধদেবকে সোনার থালায় করিয়া পায়েস খাইতে দিয়াছিলেন। সুজাতার পায়েস ভক্ষণ করিয়াই বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেন। সুজাতার বাড়ি ছিল উরুবেলা গ্রামে। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা একটি গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম। ঐ গ্রামটিকে এখন উর্বিল বলা হয়। নিবেদিতা বলিলেন, এই গ্রামেই সুজাতা বাস করিতেন। উৎসাহ ও আনন্দের আতিশয্যে নিবেদিতা সেই

গ্রামের কিছু মৃত্তিকা তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, সুজাতার গ্রামের মৃত্তিকা পবিত্র। নিবেদিতা ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং এই তীর্থগুলির নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

আমরা যে মোহন্তের বাড়ি উঠিয়াছিলাম, সেইখানে প্রতিদিন নিবেদিতা আমাদের সকলকে ওয়ারেন-এর বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বই হইতে এবং এড্‌উইন অরর্ণল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' হইতে কবিতা পড়িয়া শুনাইতেন। একদিন সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে আমরা সকলে যখন বোধিবৃক্ষ তলে গিয়া বসিলাম, তখন লক্ষ্য করিলাম একটি আশ্চর্য-চরিত্রের মানুষকে। তাহার নাম ফুজী। একজন দরিদ্র জাপানী সে। দীর্ঘকাল ধরিয়া সে কষ্ট করিয়া পয়সা জমাইয়াছে তাহার জীবনের একটি স্বপ্ন চরিতার্থ করিবার জন্য। ভগবান তথাগত যে স্থানটিতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, ফুজীর ইচ্ছা, সেই পুণ্য তীর্থস্থানটি সে একবার দর্শন করিবে। অবশেষে সে এইখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং যাত্রানিবাসের একটি ঘরে অতি সামান্যভাবে সে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফুজী আসিয়া বোধিবৃক্ষ তলে বসিয়া এই স্তোত্রটি পাঠ করিত ঃ

নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়
নমো নমো গোতমচন্দিমায়,
নমো নমোনন্তগুণণ্ণবায়,
নমো নমো সাকিয়নন্দনায়।

সন্ধ্যার সেই নিস্তব্ধ ও শান্ত মুহূর্তে জাপানী কণ্ঠে এই সংস্কৃত স্তোত্রটি যেন মন্দিরের সুমধুর ঘণ্টাধ্বনির মত শুনাইত। নিবেদিতা সযত্নে ফুজীকে প্রতিদিন আহার্য দিতেন। ফুজীর কণ্ঠে উচ্চারিত এই স্তোত্রটি রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল। তাঁহার 'নটীর পূজা'য় শ্রীমতীর প্রার্থনায় কবি এই ফুজীর স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

নিবেদিতা প্রসঙ্গে

মতিলাল ঘোষ

ভগিনী নিবেদিতাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তাঁহার মহৎ চরিত্রের গুণেই তিনি ইহা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি সকলেরই ভগিনীসমা ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ কেবলমাত্র বাগবাজারের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিংবা কলিকাতা বা ভারতবর্ষেব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না—উহা সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তবে বাগবাজারের অধিবাসীদিগের নিকট তাঁহার স্মৃতি বিশেষভাবে পবিত্র এই কারণে যে, এই অঞ্চলেই ছিল তাঁহার কর্মক্ষেত্র এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি এইখানকার অধিবাসীদের সুখ-দুঃখের সমভাগিনী ছিলেন এবং তাঁহার নিরলস সেবার দ্বারা তিনি সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন।

তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কেবলমাত্র স্নেহময়ী জননী অথবা ভগিনীরূপে রুগ্ন ও পীড়িতের সেবা করিতেন না—সে কলেরা কিংবা প্লেগের দ্বারা আক্রান্ত হউক না কেন—কিম্বা আত্মীয়স্বজন বা বান্ধবহীন অনাথ বা বিধবার যে তিনি দুঃখমোচন করিতেন তাহা নহে—সকলের জন্যই তাঁহার হৃদয় উন্মুক্ত ছিল। তাঁহার মুখের হাসি হইতে কেহই বঞ্চিত হইত না এবং করুণা তো সকলেই পাইত। নিবেদিতা যেন নারীকুলে সম্রাজ্ঞী বিশেষ ছিলেন। মানবী আকারে তিনি ছিলেন দেবী—যিনি দুঃখযন্ত্রণাক্ষুব্ধ এই মানব-সমাজে সুখ ও শান্তি আনিবার জন্য স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের সব কিছুই তিনি ভালবাসিতেন, তবে অন্ধ অনুরাগবশতঃ নহে, স্বাধীন বিচারশক্তির ভিতর দিয়াই তিনি এই সমাজের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি শুধু বিদুষী ছিলেন না, অসামান্যা

বুদ্ধিশালিনীও ছিলেন। হিন্দুর সামাজিক বিধি-বিধানের মধ্যে তিনি যে সৌন্দর্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা উচ্ছ্বাস বা অন্ধ অনুরাগ-বশতঃ নহে, তন্ন তন্ন করিয়া অনুশীলন করিবার ফলেই। পাশ্চাত্য জগতের নিকট নিবেদিতা যেভাবে ভারতবর্ষকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, একমাত্র সেই কারণেই তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়।

নিবেদিতা ছিলেন বিদুষী এবং উন্নত চরিত্রের মহিলা। বিদেশ হইতে এই দেশে আসিয়া এই দেশকেই তাঁহার জন্মভূমি জ্ঞান কয়িয়াছিলেন এবং অবশেষে এই দেশের মৃত্তিকাতেই তাঁহার অন্তিম শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হইয়া ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং আচারে ব্যবহারে কথাবার্তায় তাঁহার মধ্যে নিষ্ঠাবতী হিন্দু-রমণীর ভাব এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহা দেখিয়া মনে হইত সত্যই তিনি যেন পূর্বজন্মে ভারতের কন্যা ছিলেন। নিজেকে তিনি সর্বতোভাবে ভারতের কল্যাণে উৎসর্গ করিয়া দিয়া তাঁহার গুরুর দেওয়া সুন্দর নামটিকে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি আজ যে আমরা এত অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছি, ইহার কারণ ভগিনী নিবেদিতা ইহার শুষ্ক অস্থিপঞ্জরে প্রাণ সঞ্চার করিয়া আমাদের সম্মুখে ইহা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি যদি আর কিছু না করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও আমরা ইহার জন্যই নিবেদিতার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিতাম।

তিনি হিন্দুধর্মকে অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রত যাপনের মত তিনি জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই জীবনের মূল্য বুঝি নাই, মূল্য দিই নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের রাখী ছিলেন নিবেদিতা এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই সম্পর্কে তাঁহার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাহা যোগ্যতার সহিত, আন্তরিকতার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন। এমন গভীর ভারতপ্রীতি কোনো বিদেশীর মধ্যে দেখি নাই। কিন্তু নিবেদিতাকে বিদেশিনী বলিতে আমার বাধে। আমার তো মনে হয় তিনি ভারতীয়দের অপেক্ষা বেশী ভারতীয় ছিলেন।

শিক্ষায়, দীক্ষায়, সেবায়, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে—সকল ক্ষেত্রেই আমরা তাঁহাকে পাইয়াছিলাম।

নিবেদিতা আজ নাই, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম ও কীর্তির মধ্যে তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন তাঁহার অজস্র রচনার মধ্যে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষা সুন্দর রচনা আমি খুব কমই পাঠ করিয়াছি। যদি কোন ফুলের সৌন্দর্যের সহিত নিবেদিতার অন্তরের সৌন্দর্যের তুলনা দিতে হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে যে-ফুলটির নাম আমার মনে আসে তাহা হইল শ্বেতপদ্ম। শ্বেতপদ্মের মতই শুভ্র ও পবিত্র ছিল তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতি। তিনি পবিত্রতার মতই পবিত্র—যেন মূর্তিমতী পবিত্রতা। আমাদের সৌভাগ্য যে, নিবেদিতাকে আমরা পরমাত্মীয়া-রূপে আমাদের মধ্যে পাইয়াছিলাম। ভারতের জাতীয় পুনরুত্থানের ইতিহাসে 'নিবেদিতা' এই নামটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

নিবেদিতা-রামানন্দ প্রসঙ্গে

সীতা দেবী

ভগিনী নিবেদিতার সহিত রামানন্দবাবুর বন্ধুত্ব ও কর্মক্ষেত্রে যোগ কলিকাতায় আসার পর আরো ঘনিষ্ঠ হয়। প্রায়ই দেখা যাইত 'প্রবাসী' অফিস হইতে ছবি কিংবা প্রবন্ধের প্রুফ লইয়া কেহ তাঁহার সেই বোসপাড়া লেনের ক্ষুদ্র বাড়িতে চলিয়াছে।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার প্রবন্ধ কাহাকেও সংশোধন করিতে দিতেন না। ভগিনী নিবেদিতার নিকট যাঁহারা কাজ লইয়া যাইতেন তাঁহাদেরও তিনি শুধু পত্রবাহক হিসাবে দেখিতেন না। রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের কতটা জ্ঞান, দেশের বিষয় তাঁহারা কিছু জানেন কিনা সব খোঁজ লইতেন। যদি দেখিতেন হিন্দুর ছেলে হইয়াও হিন্দুর মহাকাব্য সম্বন্ধে ইঁহারা তেমন কিছু জানেন না, তাহা হইলে ভগিনী নিবেদিতা চটিয়া যাইতেন।

রামানন্দবাবু প্রায়ই নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে এবং কখনো বা জোড়াসাঁকোর অবনীন্দ্রনাথের বৈঠকে নিবেদিতার সহিত নানাবিধ আলোচনা করিতেন। ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর গৃহেও ইঁহাদের নানা প্রসঙ্গ হইত। বাঙালীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রা সবের মধ্যেই নিবেদিতা যে সৌন্দর্যের সন্ধান করিতেন ইহা তাঁহাদের কথোপকথন হইতে বুঝা যাইত।

'প্রবাসী'র প্রথম বৎসরই অজন্তা গুহা বিষয়ে নিবেদিতা সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং ক্রমে অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অগ্রগামী শিল্পীদের চিত্রে কাগজ অলঙ্কৃত করিতে থাকেন। অজন্তা গুহার চৈত্য ও বিহারগুলির সম্বন্ধে তিনি প্রবাসীতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

একদিন পীড়িত রামানন্দবাবুকে তিনি দেখিতে আসিলেন।

সুদীর্ঘ, শুভ্র পরিচ্ছদ ও বিলাতি জুতা পরিয়া তিনি আসিয়াছিলেন। রোগীর ঘরের সামনে আসিয়াই জুতা জোড়া খুলিয়া রাখিলেন।

য়ুরোপীয় মহিলাকে জুতা খুলিতে দেখিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই নিবেদিতা ইংরেজিতে বলিলেন—'আমি জানি, জুতা খুলিতে হয়।'…তিনি 'মডার্ণ রিভিয়ু'র জন্মকাল হইতেই (১৯০৭) লেখা দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে সম্পাদককে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তেমন সাহায্য সচরাচর কাহারও নিকট মিলে না। রামানন্দবাবু বলিতেন যে, নিবেদিতা সাধারণ কথাবার্তার সময় সম্পাদকের কাজের দোষত্রুটী যাহা দেখিতেন, তাহার কঠোর সমালোচনা করিতেন। সেই সমালোচনাও কম মূল্যবান ছিল না। নিবেদিতা প্রকৃতই তাঁহার ভগিনী ছিলেন এবং নিবেদিতার জীবন-পথে যাঁহারা তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের কাছেই নিবেদিতা সত্যই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়াছিলেন। নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁহার।

প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি

বিপিনচন্দ্র পাল

১৯১০ সালে মিস্ নোবলের [ভগিনী নিবেদিতা] সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সে অদ্ভুত পরিচয়। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হইলেই একটা ঝগড়া পাকাইয়া উঠিত অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ঝগড়ার দরুণ উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় কোন বৈরি ভাব লেশমাত্র জাগে নাই। এ সকল ঝগড়ার ফলে আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধারও কোন ব্যাঘাত কখনও জন্মে নাই। সেই প্রথম পরিচয়ের কথা মনে করিয়াই নিবেদিতার গোটা ছবিটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে।

আমি ব্রাহ্ম-সমাজের লোক, নিবেদিতা ইহা জানিতেন। আর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাঁহার একটা গভীর অশ্রদ্ধা ছিল। নিবেদিতার স্বচ্ছচিত্তে কখনও কোন মনোভাব ঢাকা থাকিত না। সুতরাং সৌজন্যের খাতিরেও আমার সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে তিনি তাঁহার অন্তরের অশ্রদ্ধা গোপন করিতে পারিলেন না। একেবারে সোজাসুজি আমাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজকে আক্রমণ করিলেন। বলিলেন,—'ব্রাহ্ম-সমাজের লোকেরা, বিশেষতঃ মেয়েরা অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িতেছেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি ব্রাহ্ম-মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়াছেন ত ?'

নিবেদিতা : হ্যাঁ।

আমি : মিসেস পি. কে. রায়কে চেনেন্ ?

নিবেদিতা : চিনি। অমন মেয়ে অতি অল্পই দেখিয়াছি।

আমি : মিসেস জে. সি. বোসকে চেনেন ?

নিবেদিতা : মিসেস বোস রমণীর শিরোমণি।

আমি : এঁদের ছোট বোনকে জানেন ?

নিবেদিতা : সি ইজ লাভ্‌লি।

আমি : শিবনাথ শাস্ত্রীর মেয়েকে দেখেছেন—মিসেস সরকার ?

নিবেদিতা : হ্যাঁ, দেখেছি। সী ইজ ভেরি গুড্‌।

আমি : আপনি বোধ হয় জানেন, এঁরা সকলেই ব্রাহ্ম-মেয়ে।

এইখানেই প্রথম পালা শেষ হইল। পরদিন সন্ধ্যায় আমাদের উভয়ের সংগ্রামের তৃতীয় পালার অভিনয় হয়।···

সেদিন মিসেস বুল বোষ্টনের স্কুল সমূহের শিক্ষয়িত্রীদিগকে তাঁহার বাটিতে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রায় দুই-তিন শত শিক্ষয়িত্রী এই উপলক্ষে মিসেস বুলের বাড়ীতে সমবেত হন। কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়া আমি একটা ঘরে একপাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। দৈবদুর্বিপাকে সে ঘরে নিবেদিতা অনেকগুলি শিক্ষয়িত্রীর নিকটে ভারতবর্ষের কথা কহিতেছিলেন। আমি নীরবে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম। ক্রমে জাতিভেদের কথা উঠিল। নিবেদিতা জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময় আমার উপর তাঁহার চোখ পড়িল। আমাকে নির্দেশ করিয়া কহিলেন, 'ঐ মিঃ পাল বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মরা জাতিভেদ মানেন না এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি অপরিমিত নয়। মিঃ পালও জাতিভেদ মানেন না এবং সনাতন ধর্মের উপর তাঁহার আস্থা নাই।'

তখন সকলের চোখ আমার উপরে পড়িল। এ অবস্থায় আমার নীরব থাকা অসম্ভব হইল।

আমি কহিলাম—'জাতিভেদ সম্বন্ধে বিদেশীয়দিগের একটা ভুল ধারণা আছে। সেটা এই যে, এই জাতিভেদ আছে বলিয়াই ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিতেছে না ; এবং যতদিন এই জাতিভেদ উঠিয়া না যাইবে, ততদিন ভারতবর্ষের লোক এক জাতিতে পরিণত হইয়া আত্মশাসনের অধিকার লাভ করিতে পারিবে

না। এই কথাটা নিতান্তই ভুল। জাতিভেদ থাকা বা না থাকার উপরে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কিছুতেই নির্ভর করে না। আমাদের দেশে জাতিভেদ আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শ্রেণীভেদ সাঙ্ঘাতিক আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ড ও আমেরিকার শ্রেণীভেদ থাকা সত্ত্বেও যেমন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কোন সাঙ্ঘাতিক ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নাই, সেইরূপ ভারতে জাতিভেদ আছে বলিয়া জাতীয় স্বাধীনতা লাভের কোন অন্তরায় নাই। কিন্তু অন্যদিকে একথা মানিতেই হইবে যে এই জাতিভেদ হিন্দু ভারতের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। এই জাতিভেদ আছে বলিয়া আমরা অবাধে আমাদের মানুষ বলিয়া যে একটা অধিকার আছে, সেই অধিকার সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি না।'

নিবেদিতা অমনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'একথা ঠিক নহে। আপনি ব্রাহ্ম বলিয়া হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ করিতেছেন।'

আমি কহিলাম,—'হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণেতর জাতির ধর্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিবার অধিকার নাই।...ইংরেজি শিক্ষা এই প্রাচীন শাস্ত্রের বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিয়াছে বলিয়াই আমরা আজ ব্রাহ্মণ না হইয়াও বেদ পড়িতে পারিতেছি, বেদান্ত-ধর্মের আলোচনা করিতে পারিতেছি এবং ধর্ম প্রচার করিতে পারিতেছি। প্রচলিত শাস্ত্রের প্রাচীন প্রভাব যদি আজ থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের নিকটে ধর্ম-প্রচার করিবার অপরাধে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দের এবং আমার কণ্ঠে চারি আঙুল পরিমাণ গরম গলান সীসা ঢালিয়া দিয়া আমাদের এই অনধিকার চর্চার প্রায়শ্চিত্ত করাইত।'

নিবেদিতা এই কথাতে একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—'মিথ্যা কথা। স্বামীজিকে হিন্দুরা ধর্মগুরুর পদে বরণ করিয়া লইয়াছে।'

আমি কহিলাম,—'মিস্ নোবল, আপনি স্ত্রীলোক না হইলে এই অপমানের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারিতাম। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুদিগের ধর্মগুরু নহেন। হিন্দু-সমাজ তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করে নাই। তিনি রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির মতন একজন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক মাত্র।'

নিবেদিতার কোমল প্রাণে এ আঘাত সহ্য হইল না। আমার কথায় তাঁর গুরুর অপমান হইয়াছে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মর্মাহত হইয়া নিবেদিতা নীরব হইয়া গেলেন।

একটি দিনের স্মৃতিকথা

জি. ভি. দেশমুখ

১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা নাগপুরে আসিয়াছিলেন। তখন দশেরার সময়। মরিস কলেজের ছাত্ররা একটি পুরস্কার-বিতরণী সভার আয়োজন করিল। সেই সভায় সভানেত্রীত্ব করিলেন ভগিনী নিবেদিতা। সভা হইল পাধানের দিন—দশেরার ঠিক আগের দিন। এই দিনটিতে বিশেষ করিয়া অস্ত্রের পূজা হইয়া থাকে। একটি ক্রিকেট খেলায় বিজয়ী ছাত্রদের পুরস্কার দিবার আয়োজন হইয়াছিল এই সভায় ; কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল নিবেদিতার বক্তৃতা শোনা। সিটি স্কুলের ড্রইং হলে এই সভায় অনুষ্ঠান হইল সকাল বেলায়। আমি তখন মরিস কলেজের ছাত্র, তাই এই সভায় যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। নিবেদিতা পুরস্কার বিতরণ করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেদের জাতীয় ক্রীড়াকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশী খেলায় গর্ব বোধ করিবার জন্য তিনি মরিস কলেজের ছাত্রদের তিরস্কার করিতেও ছাড়িলেন না। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সেই তেজস্বিনী নারী এমন কথাও বলিলেন যে, তিনি যদি আগে জানিতে পারিতেন তাহা হইলে এই অনুষ্ঠানে তিনি কখনই সভানেত্রীত্ব করিতে সম্মত হইতেন না। নিবেদিতা ঠিক এই কথা কয়টি বলিয়াছিলেন, 'আজ দশেরার পুণ্যতিথি—শস্ত্রপূজা করিবার দিন। আজ জগৎ-জননী শক্তি-রূপিণী মায়ের পূজা। শক্তি-সাধনার এই পীঠস্থানে দশেরা উপলক্ষে যে দেবীর অর্চনা হয় তিনি দেবী দুর্গা—তাহার দশ হাতে দশ প্রহরণ। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, তোমরা দেবী দুর্গা ও তাঁহার তরবারীকে বিস্মৃত হইয়াছ —ভুলিয়া গিয়াছ তাঁহার শক্তির বাণী। ভোঁসলা রাজাদের স্মৃতি-বিজড়িত এই রাজধানীতে আসিয়া আজিকার দিনে

আমি আশা করিয়াছিলাম মারাঠার বীরত্বের নিদর্শন কিছু দেখিব।'

এইভাবে নিবেদিতা তাঁহার বক্তৃতার সুতীক্ষ্ণ কশাঘাতে কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের জর্জরিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চৈতন্য হইল। নিবেদিতার মনের ইচ্ছা অবগত হইয়া পরের দিন অর্থাৎ দশেরার দিন তাঁহারা বীরত্ব-ব্যঞ্জক অসি ক্রীড়া, মল্লক্রীড়া প্রভৃতি প্রদর্শনের আয়োজন করিলেন।

বক্তৃতা শেষে নিবেদিতা চলিয়া গেলেন। ছাত্র এবং অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া যারপর নাই মুগ্ধ হইলেন। মল্লক্রীড়া ও অসি-ক্রীড়ায় পারদর্শী এমন কয়েকটি ছাত্রকে খুঁজিয়া বাহির করা হইল। অধ্যাপক এম. খুব উৎসাহের সঙ্গে পরবর্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। কেননা, নিবেদিতার তিরস্কার তাঁহার মর্মে বেশী করিয়া বিঁধিয়াছিল এবং নাগপুরের ছাত্রদের সম্পর্কে নন্দের এই তেজস্বিনী শিষ্যা অনুরূপ ধারণা লইয়া ফিরিয়া যাইবেন, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। আমার উপর বিশেষভাবে ভার পড়িল ক্রীড়াবিদ্‌দের একত্র করিবার জন্য এবং আমাকেও ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য অধ্যাপক এম. বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। আমি লাঠি ও তরবারী খেলা উত্তমরূপে জানিতাম।

পরের দিন মরিস কলেজের হোষ্টেলের প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তিন ঘণ্টা ধরিয়া বিবিধ খেলার ভিতর দিয়া নাগপুরের ছাত্রদের শক্তিচর্চার পরিচয় পাইয়া নিবেদিতা মুগ্ধ হইলেন। তখন তিনি আমাদের উদ্দেশে বলিলেনঃ আমাদের দেশে ('আমাদের দেশ' বলিতে ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষকেই বুঝিতেন) উচ্চ শিক্ষা অত্যন্ত দ্রুত হারে চলিতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে খুব বেশী সংখ্যায় গ্র্যাজুয়েট বাহির হইতেছে। কিন্তু এই গ্রাজুয়েটদের দিকে তাকাইলে মনে হইবে ইহাদের শরীরে শক্তির

লেশমাত্র নাই—ইহারা দুর্বল, ভীরু, ইহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, ইহারা বিপদের সময়ে তাহাদের মা ও বোনদের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে অসমর্থ। সমাজে এই সব দুর্বলদের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। আজ দেশ চায় স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল পেশীবহুল শক্তিমান এবং স্বদেশপ্রেমিক তরুণ। বিদেশী সরকারের পদলেহী মানুষের আজ প্রয়োজন নাই। এই শক্তিমান সবলেরাই দেশকে তুলিয়া ধরিবে। একটি বিদেশী গভর্নমেণ্টের স্বেচ্ছাচার শাসনকে জীয়াইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে সেই শাসনযন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে তোমাদের লজ্জাবোধ করা উচিত।

কলিকাতায় তাঁহার [সিস্টার নিবেদিতা] দুইটি বক্তৃতার কথা আমার বিশেষভাবে স্মরণ হয়। ১৯০২ সালের শরৎকালের এক রবিবার। সন্ধ্যায় তাঁহার বাগবাজারের স্কুলে গিয়াছি। এই স্কুলেই তিনি বাস করিতেন। সন্ধ্যার অবসরেই তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের সহিত মিলিত হইতেন, আলাপ-আলোচনা করিতেন। কিন্তু সেদিন আমি যাওয়া মাত্র বলিলেন—'আজ গল্প করিবার সময় নাই; এখন বক্তৃতা দিতে যাইতে হইবে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'কোথায়?'

বলিলেন—'কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটে; একটি স্কুলে।'

নিবেদিতার সঙ্গেই চলিলাম।

স্কুলের উঠানটি লোকে ভরিয়া গিয়াছিল—বেশীর ভাগই যুবক এবং পুরুষ। বক্তৃতামঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন একজন কথক; তাঁহার পাশে একটি মাটির টবে তুলসী গাছ। উপরে শামিয়ানা টানানো।

আমরা প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কথক ঠাকুর রামায়ণ হইতে একটি আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। এক ঘণ্টা ধরিয়া কথকঠাকুর আবৃত্তি করিলেন—সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সেই সুন্দর কথকতা শুনিতে লাগিল। একজন দোভাষী রামায়ণের যে অংশটুকু কথক আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন—কোন্ অংশ তাহা আমার সঠিক মনে নাই। কথকের আবৃত্তি শেষ হইলে পরে নিবেদিতা উঠিলেন বক্তৃতা করিতে। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই (নিবেদিতা তাঁহার বক্তৃতায় কখনো ভনিতা করিতেন না, একেবারে সোজাসুজি বক্তব্য বিষয় আরম্ভ করিতেন) তিনি ভারতীয় ছাত্রদের

আদর্শ সম্পর্কে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কথকের আবৃত্তি ছিন্নসূত্র অবলম্বন করিয়া রামায়ণের নীতির প্রতি শ্রোতাদের মনকে আকর্ষণ করিলেন এবং শ্রোতাদের মনে তাহার আশ্চর্য ফল প্রত্যক্ষ করিলাম।

নিবেদিতা বলিলেন—'তোমরা কী মনে কর কেবল রামায়ণ আবৃত্তি করিলে কিংবা রামচন্দ্রের গুণকীর্তন করিলেই রামায়ণ-পাঠ সার্থক হইল? যে আদর্শ প্রাচীন ভারতের নর-নারীদের জীবনকে উদ্বোধিত করিত, সেই আদর্শের গৌরব বোধ করাই কী যথেষ্ট কিংবা সেই গৌরবজনক আখ্যায়িকা জানাই কি যথেষ্ট? আমি মনে করি তাহা যথেষ্ট নয়। যে সমাজ হইতে রামায়ণের উদ্ভব, সেই সমাজ কী চিরদিনের মত মৃত? রামায়ণের কাহিনী কী অতীতের মধ্যেই নিঃশেষিত? না, তাহা নয়। রামায়ণের কাহিনী, রামায়ণের ভাবধারা ভারতের জনসাধারণের হৃদয় হইতে আজো উৎসারিত হইতেছে। আমি তাই ভারতের তরুণ সম্প্রদায়কে বলি—তোমরা তোমাদের নিজস্ব রামায়ণ রচনা কর; রচনা কর আখ্যায়িকা দিয়া নয়, জন্মভূমির প্রতি অন্তরের সেবা দিয়া। জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও চিন্তায় ফুটাইয়া তোল রামায়ণকে, তবেই তো রামায়ণ পাঠ সার্থক হইবে।'

বলা বাহুল্য, শ্রোতারা নিবেদিতার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইল, উদ্বদ্ধ হইল।

আর এক দিনের ঘটনা মনে আছে।

স্থান—ডালহৌসি ইনস্টিটিউট। শ্রোতা বেশীর ভাগই ভারতীয়, কয়েকজন উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয়ও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য।'

নিবেদিতার পক্ষে অদ্ভুত বিষয়। চৈতন্য লাইব্রেরীর বার্ষিক

উৎসব উপলক্ষে এই সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন স্যার এডমণ্ড এ'লস—ভাইসরয়ের পরিষদের সামরিক সদস্য। ভাইসরয়ের অর্থসচিব স্যার এডওয়ার্ড ল ব্রহ্মচর্যের স্বপক্ষে বক্তৃতা করিলেন আর সিভিল সার্ভিসের একজন বর্ষীয়ান পার্শী সভ্য বলিলেন বিবাহের স্বপক্ষে। এই পার্শী সিভিলিয়ান তখন বাংলা প্রদেশের আবগারী বিভাগের কমিশনার ছিলেন। তারপর উভয়ের বক্তব্যের আলোচনা করিয়া বক্তৃতা দিলেন ভারতীয় বিচার বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি বিবাহ সম্পর্কে প্রচলিত ভারতীয় চিন্তাধারাই ব্যাখ্যা করিলেন। সর্বশেষে সভাপতি, ভগিনী নিবেদিতাকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন।

নিবেদিতা বক্তৃতা মঞ্চে এক য়ুরোপীয় মহিলার পাশেই বসিয়াছিলেন। নিবেদিতা ধীরভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন এবং প্রারম্ভেই সভাপতিকে তিনি শিষ্টতাপূর্ণ সকৌতুক ভৎর্সনা করিলেন। তারপর কয়েকটি তীক্ষ্ণ ও সুচিন্তিত কথার ভিতর দিয়া জায়াত্ব সম্পর্কে প্রাচ্য আদর্শের ভাবধারা বিশ্লেষণ করিলেন এবং পাশ্চাত্য নারীর সহিত ভারতীয় নারীর একটি সুন্দর তুলনামূলক আলোচনা করিলেন। সমাজে ও গৃহে জননী ও জায়ারূপে নারীর যে বৈশিষ্ট্য তাহা তিনি নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করিলেন।

সেদিন নিবেদিতার এই দশ মিনিটের বক্তৃতাটি এত উপভোগ্য হইয়াছিল যে তাহা আমার চিরদিন মনে থাকিবে।

মিঃ এস. কে. র‍্যাটক্লিফ্ তখন 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ও ভগিনী নিবেদিতার অনুরাগী বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন।

নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার

লেডি মিণ্টো

মার্চ ১, ১৯১০—সম্প্রতি জনৈকা মিস্ নোবলকে দেখিবার জন্য আমি কলিকাতার এক দরিদ্রতম পল্লীতে গিয়াছিলাম। মিস্ নোবল ভারতীয় ধরনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। দেখিলাম তিনি একজন আদর্শবাদী এবং হিন্দুধর্মের ভিতর তিনি সুগভীর মহিমা দেখিতে পাইয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার যুক্তি আমি ঠিকমত বুঝিতে পারি নাই। আমি আত্মগোপন করিয়া গিয়াছিলাম; সঙ্গে ছিলেন একজন মার্কিন ভদ্রলোক, মিঃ ফিপসন আর ভিক্টর ব্রুক (ভাইসরয়ের মিলিটারী সেক্রেটারী)। আমি সিস্টার নিবেদিতার স্কুলটি দেখিতে গিয়াছিলাম। অনেকগুলি ছাত্রী সেখানে পড়ে। তাঁহার শিক্ষাদানের পদ্ধতি দেখিয়া ও স্কুল-পরিচালনায় তাঁহার একক কৃতিত্বের কথা শুনিয়া আমি যারপর নাই বিস্ময় বোধ করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, যাঁহাদের মধ্যে তিনি বাস করেন, তাঁহারা উচ্চবর্ণের হিন্দু, কিন্তু তাঁহারা দরিদ্র অথচ গর্বিত। নিবেদিতা তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের ও গুণাবলীর খুব প্রশংসা করিলেন। পৃথিবীর সকল জাতির ধর্ম ও দর্শনের সহস্র বৎসরের ইতিহাস তিনি গভীরভাবে পাঠ করিয়াছেন এবং তাঁহার ধারণা যে সে দর্শন ও জ্ঞানের ধাত্রী হইল ভারতবর্ষ।

সিস্টার নিবেদিতা বাগবাজারের একটি সংকীর্ণ গলিতে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র বাড়ীতে বাস করেন। অনিন্দ্যসুন্দর তাঁহার মুখ; সে-মুখ প্রতিভাদীপ্ত। সহজেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তিনি আমাকে গঙ্গার তীরে যেখানে তাঁহার আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বাস করিতেন, সেই স্থানটি দেখিয়া আসিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। কয়েকদিন পরে ভিক্টর ব্রুককে সঙ্গে লইয়া সিস্টার

নিবেদিতার বাড়িতে আসিলাম ও তাঁহাকে লইয়া একখানা ভাড়া করা মোটর গাড়িতে করিয়া আমি বেলুড় মঠ দেখিতে গেলাম। তাঁহার সহকারিণী সিস্টার ক্রিস্টিনও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। নিবেদিতা আমাদিগকে বিবেকানন্দের শয়ন-ঘরটি দেখাইলেন। এই ঘরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম—কেমন যেন একটি পবিত্র ভাবে তাঁহার মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমরা নৌকা করিয়া ফিরিলাম। সেদিনের অপরাহ্ণটি খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। সিস্টার নিবেদিতা তাঁহার চারিপাশের সব কিছুর মধ্যেই সৌন্দর্য দেখিয়া থাকেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট—শ্রদ্ধা ও ভক্তিমিশ্রিত সেই কণ্ঠস্বর আমার খুব ভালো লাগিয়াছিল।

ম্যাক্সমূলার রামকৃষ্ণদেবের একখানি জীবন-চরিত লিখিয়াছেন।

সেই জীবন-চরিতের একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিলেন নিবেদিতা। সমালোচনাটি বাহির হইল স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায়। সমালোচনা তো নয়, যেন পাশ্চাত্যের বেদান্ত-চিন্তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস। এই একটি রচনাদ্বারাই ভারতবর্ষে আসিবার অল্প কয়েকদিন পরেই, নিবেদিতা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। এই প্রথম রচনাটিতেই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

নির্জন তপস্যা নিবেদিতার জন্য নহে, স্বামীজি ইহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাই শিষ্যার লেখার কাজে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। যখন কলিকাতায় প্লেগ হইল, অমনি নিবেদিতা কলম ধরিলেন, এই বিষয়ে কত প্রবন্ধ আর রিপোর্ট লিখিলেন। সেগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। তখন হইতে ভারতীয় সংবাদপত্রের জগতে নিবেদিতার প্রবেশ অবারিত হইল। 'এক্সপ্রেস' পত্রিকায় কলিকাতার বাঙালিদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে নিবেদিতার ধারাবাহিক প্রবন্ধ সেদিন সকলের নিকট অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সেইসব প্রবন্ধে ভারতবর্ষের অনাদি ছন্দ ধ্বনিত হইত। গ্রাম্য জীবনের কাহিনী, হিন্দু-পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি, বাঙালী হিন্দুর পূজা-পার্বণ—সব কিছু নিপুণ তুলিতে আঁকিতেন নিবেদিতা। এমন করিয়াই নিবেদিতা ইংরেজ-পাঠকদের নিকটে সেদিন ভারতবর্ষকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। এ সবই তিনি স্কুলের কাজের অবসর সময়ে লিখিতেন। লণ্ডনে থাকিবার সময়েও তাঁহার লেখনীর বিরাম ছিল না—সেখানকার কত

সংবাদপত্রে লিখিতেন। লেখিকা নিবেদিতা এইভাবে ভারতবর্ষে আসিবার অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিলেন নিবেদিতা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নব্য বাংলার প্রতিভাবান কবি। মহর্ষিকে দেখিয়াছেন। এইবার মহর্ষি-পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছা হইল নিবেদিতার। শিলাইদহ হইতে রবীন্দ্রনাথের ফিরিবার পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়া নিবেদিতা একদিন রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের এই বিদেশিনী শিষ্যাটির কথা রবীন্দ্রনাথও শুনিয়াছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিবিড় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বোধ করিলেন। তারপর হইতেই জোড়াসাঁকোর এই সংস্কৃতি-কেন্দ্র নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিল। ক্রমে তিনি ঠাকুরবাড়ির একজন মান্য অতিথি হইয়া উঠিলেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁহার প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ। ক্রমে অবনীন্দ্রনাথ ও সরলাদেবীর সঙ্গেও নিবেদিতার অন্তরঙ্গ পরিচয় হইল। সংস্কৃতির দ্যুতিতে ঠাকুরবাড়ি যেন ঝল্‌মল্। তাই এইখানে নিবেদিতার যাওয়া-আসা নিয়মিত হইয়া উঠিল। স্বামীজি বাঁচিয়া থাকিতেই ঠাকুরবাড়ির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

রাজদ্রোহের অভিযোগে তিলক ধৃত এবং দণ্ডিত হইলেন। দেশের বরেণ্য নেতা মহারাষ্ট্রের বীর সন্তান, বালগঙ্গাধর তিলকের স্বদেশ-প্রেমের কথা ভারতবর্ষে আসিয়াই নিবেদিতা শুনিয়াছিলেন। তিলক দণ্ডিত হইবার সংবাদে রবীন্দ্রনাথ খুব বিচলিত হইলেন। মোকদ্দমা পরিচালনার সময় তিনি নিজে অর্থসংগ্রহে সহায়তা করিলেন। তারপর রাজদ্রোহ আইনের বিরুদ্ধে টাউন হলে বিরাট প্রতিবাদ

সভায় রবীন্দ্রনাথ "কণ্ঠরোধ" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সেই কথা শুনিয়া নিবেদিতা বুঝিলেন, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কল্পনাবিলাসী কবি নহেন, বাস্তব জগতের সঙ্গে, সাধারণ লোকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় আছে—দেশের স্বাধীনতা-স্পৃহার এবং আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার প্রাণের যোগ আছে।

সেইদিন হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চক্ষে পরম শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া উঠিলেন। নিবেদিতার মধ্যেও কবি এক আশ্চর্য শক্তিময়ী, প্রতিভাময়ী এবং প্রাণময়ী নারীকে দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। নিবেদিতা আসিলেই ধর্ম সম্বন্ধে কথা হয়। নিবেদিতার চক্ষের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের প্রেম আর সৌন্দর্যের জগৎ খুলিয়া যায়। অপরূপ সুমধুর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন, নিবেদিতা মুগ্ধ হইয়া শোনেন, অপার মাধুরীতে তাঁহার মন ভরিয়া উঠে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর আনন্দে কাটিয়া যায়। কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িতে আসেন। জোড়াসাঁকোর প্রাসাদতুল্য বাড়ির তুলনায় নিবেদিতার ভবন অতি সামান্য। বাড়িটির দেয়ালে মাটির প্রলেপ, জানালায় খড়খড়ি নাই, কিন্তু খস্‌খসের পর্দা দেওয়া। তাঁহার সজ্জাহীন সাদাসিধা ঘরটিতে নিবেদিতা কবিকে সমাদর করিয়া বসান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আলোর গানে আর আনন্দের হাওয়ায় সেই সামান্য ঘরটি যেন প্রাসাদের মত গম্‌গম্‌ করিয়া উঠিত। রবীন্দ্রনাথ বসিয়া বসিয়া নিবেদিতার প্রাণের প্রাচুর্য ও অন্তরের সৌন্দর্য দেখিতেন আর বিস্ময় বোধ করিতেন।

ক্রমে নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইল। দুইজনের মধ্যে কত ভাবের আদান-প্রদান হয়। তথাপি কবির নিকট নিবেদিতা-চরিত্র জটিল মনে হইত—মনে হইত তাঁহার স্বভাবে অনেক আপাত-বিরোধ। নিবেদিতার কল্পনার বিশালতা কবিকে স্তম্ভিত করিত, কিন্তু এই বিদেশিনীর স্বভাবের দৃঢ়তা এবং সকল বিষয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ রবীন্দ্রনাথের তেমন ভাল লাগিত না। কিন্তু

নিবেদিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্রসাহিত্যে চিরদিনের মত একটি স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে।

নিবেদিতার মাধুর্য-মণ্ডিত চরিত্র এবং দৃপ্ত ও সমুন্নত ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ছায়াপাত করিয়াছিল। ইহারই ফলে তাঁহার বিখ্যাত সৃষ্টি 'গোরা'। বিবেকানন্দের নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের গোরার মধ্যেই শাশ্বতী হইয়া আছেন। কখন যে তিনি কবি-মানসে একটি উপন্যাসের ছায়া ফেলিয়াছেন, তাহা নিবেদিতা জানিতেও পারেন নাই। গোরা সঙ্কল্পে কঠিন, অথচ সে নম্র-স্বভাব হিন্দু। নেতৃত্ব তাহার সহজাত প্রতিভা। অত্যন্ত গোঁড়া, অথচ মুক্তির উপাসক স্বাধীনতার পূজারী। শেষ পর্যন্ত গোরা জানিতে পারিল, তাহার শরীরে আইরিশ-সৈনিকের রক্ত। এই চরিত্র যখন সবেমাত্র রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে, তখনো কবি নিজেও জানিতেন না ইহার পরিণাম কি হইবে? শুধু জানিতেন একটি পুরুষের চরিত্র আঁকিবেন—নিবেদিতার মতনই কথা বলিতে বলিতে যাহার চক্ষে আগুন ঝলসিয়া উঠে, যাহার ব্যক্তিত্বে আছে একটি দুরন্ত প্রবেগ। গোরা রজতগিরি, নিবেদিতা গৌরাঙ্গী। তারপর যত দিন যাইতে লাগিল, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির সম্মুখে ততই নিবেদিতা পূর্ণ মহিমা আর অদম্য তেজ লইয়া দিনে-দিনে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইলেন। এই নিবেদিতাকেই রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসের পৃষ্ঠায় জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। নিবেদিতার দেহত্যাগের তের বৎসর পরে বাংলা কথা-সাহিত্যে 'গোরার' আবির্ভাব। নিবেদিতা বাঁচিয়া থাকিতেই কবি কত সময় 'গোরা'র কাহিনী লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন: "গোরা রচনা শুরু হয় ১৯০৭ সালে—বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের শেষভাগে।... উপন্যাসের মূল কথাটি হইতেছে যে গোরা আইরিশম্যানের পুত্র; সে বিদেশী, বিধর্মী, ইংরেজ-বিদ্বেষী, খৃষ্টানধর্ম-বিরোধী, তাহার কাছে

হিন্দুধর্মের সমস্তই সত্য, সমস্তই পবিত্র—নির্বিচারে সে সমস্তকে গ্রহণ করিয়াছে। গোরার প্রবল দেশাত্মিকতার উগ্রতা কবি স্বয়ং এক সময়ে তীব্রভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন ; সেই জন্য গোরার যুক্তিজাল এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।···স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা স্পন্দিত হইয়াছিল। গোরার চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাওয়া যায়। নিবেদিতার পক্ষে হিন্দু হওয়ার অসম্ভবত্ব কল্পনা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ যেন আইরিশম্যানের পুত্র গোরাকে উপন্যাসের নায়করূপে সৃষ্টি করিলেন।"

রবীন্দ্রনাথের বহুদিনের ইচ্ছা, কনিষ্ঠা কন্যাটিকে ভাল করিয়া ইংরাজী শিখাইবেন।

প্রথম আলাপের সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাই এই বিষয়ে নিবেদিতাকে অনুরোধ করেন।

"সে কী, ঠাকুরবাড়ীর মেয়েকে বিলিতি মেম বানাবেন ?"

"ইংরেজি ভাষাটা শেখাতে চাই। আর সেই ভাষার মারফৎ যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই শিক্ষা।"

"কিন্তু বাইরে থেকে কোনো একটা শিক্ষা গিলিয়ে দিয়ে লাভ কি ? বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষায় নিজের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে চাপা দেওয়া আমি আদৌ পছন্দ করি না।"

যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিবেদিতা সেদিন রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কবি তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। ইহাই নিবেদিতাকে তাঁহার শ্রদ্ধার পাত্রী করিয়া তুলিয়াছিল। অধ্যাত্ম-জীবনে যিনি কোনো স্বাধীন ইচ্ছা রাখেন নাই, অন্যান্য বিষয়ে সেই নারীর এমন স্বচ্ছ এবং অভ্রান্ত বিচারবুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য লাগিত। আর এই জন্যই বোধ হয়

ভারতে আসিবার অব্যবহিত কাল পরেই বিবেকানন্দ নিশ্চিন্ত মনে নিবেদিতাকে ব্রাহ্মসমাজের সহিত মেলামেশা করিতে দিতে পারিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সহিত বন্ধুত্ব যখন নিবিড় হইয়া উঠিল, তখন নিবেদিতা মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জমিদারী কাছারীতে থাকিতেন। দুরন্ত পদ্মার প্রতি নিবেদিতা যেন অন্তরের একটি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেন। পদ্মার প্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রকৃতির যেন কোথায় একটি মিল ছিল। যেমনি উদ্দাম, উচ্ছ্বলিত আব তেমনি তরঙ্গমন্দ্রিত।

একদিন।

নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া রবীন্দ্রনাথ চলিয়াছেন পদ্মার চরে সূর্যোদয় দেখিতে। সঙ্গে আছেন জগদীশচন্দ্র বসু। উষার সেই নিস্তব্ধ প্রহরে, নিবেদিতা দেখিলেন, কৃষকেরা লাঙ্গল কাঁধে মাঠে আসিয়াছে। তাহাদের জমিদার রবীন্দ্রনাথকে তাহারা দেখিয়াছে অনেকবার। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সুন্দর শুভ্র বসনপরিহিতা গৌরাঙ্গী এক মেমসাহেবকে দেখিয়া তাহারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। আর একটি মেয়ে ছিল নিবেদিতার সঙ্গে। কোথায় গেল সূর্যোদয় দেখা। নিবেদিতা দৌড়াইয়া কৃষকদের নিকটে চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "ভাই, তোমরা এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

"আমরা মেমসাহেবকে দেখছি।"

"মেমসাহেবকে দেখবার কিছুই নেই। তোমাদের গাঁ কত দূরে?"

"ঐ—ঐখানে।"

"চলো, তোমাদের গাঁ দেখে আসি।"

যেমন কথা তেমনি কাজ। পদ্মার চরে যখন সূর্য উঠিল, নিবেদিতা তখন কৃষকদের কুটিরের দাওয়ায় বসিয়া কৃষক-পত্নীর সঙ্গে

গল্প করিতেছেন। এক দিনের খেয়াল নয়। যে কয় দিন তিনি শিলাইদহে ছিলেন প্রতিদিন, মাসের পর মাস, নিবেদিতা যেন রবীন্দ্রনাথকেও চিনিতে পারিতেন না। তাঁহার জমিদারীর যতগুলি গ্রাম ছিল, সমস্ত গ্রামে তিনি ঘুরিলেন এবং ঐ দরিদ্র নরনারীর সঙ্গে প্রাণ মিলাইয়া, মন মিলাইয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের সমভাগিনী হইলেন। তাহাদের সঙ্গে চিঁড়া কুটিলেন, ধান ভানিলেন, তাহাদের নাড়ু-মোয়া খাইলেন; তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের জন্য কত সাহায্য করিলেন। শিলাইদহের গৃহস্থ-বাড়ির রান্নাঘর, শয়নঘর, ঢেঁকাঘর, গরু-বাছুর সব দেখিয়া তাঁহার কী আনন্দ। পল্লী নরনারীর নিজের হাতে তৈরী সেকেলে কাঁথা, ছেলেদের দোলাই, কুলো-ডালা, মাটির পুতুল, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ—এই সব বিচিত্র পল্লীশিল্প নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিত। উৎসাহের সঙ্গে অনেক কিছু সংগ্রহও করিলেন। মুসলমান জোলার তাঁতের রকমারি কাপড় বোনাও তিনি সাগ্রহে দেখিয়া লইলেন। বুনোপাড়ার ছেলেদের অষ্টসখীর নাচগানও শুনিতে ছাড়েন নাই।

ধানক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে, পদ্মার তরঙ্গিত বাঁকে বাঁকে লক্ষ লক্ষ জেলে-জোলা, মাঝি-মাল্লা ও চাষীর যে সহজ জীবন পরিপ্লাবিত হইয়া রহিয়াছে, শিলাইদহে আসিয়া নিবেদিতা যেন সেই জীবনের সন্ধানে মাতিয়া উঠিলেন। এখানকার কুটিরে দীপাধারের স্নিগ্ধ আলো, মাঙ্গল্যের আলপনা, নূতন ধানের স্বর্ণ-মঞ্জরী সব কিছু মিলিয়া নিবেদিতার মানস-কল্পনার নিভৃতে কিরণবর্ণা অনুভূতি জাগাইয়া তুলিল। লাহোরে রামলীলা দেখিয়া তাঁহার ঠিক এই রকম অনুভূতিই হইয়াছিল। সেই অনুভূতির উত্তাপই পরবর্তী কালে নিবেদিতার রচনার ভিতর দিয়া শিক্ষিত বাঙালির হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল।

নিবেদিতার এই রূপ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। যেমন তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন কলিকাতায় যখন

প্লেগ লাগে। সেই মহামারীর সময় কত দিন না নিবেদিতা তাঁহাকে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়াছেন, চুন বিলি করিয়াছেন নিজের হাতে।

তারপর স্বদেশীর দিনে একাধিক সভায় নিবেদিতার সঙ্গে একত্রে বক্তৃতা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বুঝিলেন, এই বিদেশিনীর ভারত-প্রীতি যথার্থ প্রীতিই, মোহ নহে। তবু একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এমন অন্তরঙ্গভাবে এসব জিনিস দেখিবার যথার্থ কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা।" নিবেদিতা উত্তর দিয়াছিলেন—"আছে বৈ কি। গুরু বলিতেন, একটা জাতিকে বুঝিতে হইলে, তাহার সব কিছু গ্রহণ করিতে হইবে।" ভারতবর্ষের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের জন্য বিদেশিনীর এই আকুতি, এই আন্তরিকতা রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রতি যারপর নাই শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। নিবেদিতার প্রতি কবির মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল! নিবেদিতাকে কবি অন্তরের সহিত ভালবাসিলেন। তাঁহার কার্যকুশলতা, উচ্চ আদর্শ ও মহাপ্রাণ যেন মধুর আলোকমূর্তি হইয়া কবির দৃষ্টিদীপের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে লোকমাতার গৌরবময় আসনে স্থান দিলেন। পরবর্তী কালে কবি তাই বলিতেন, বহু বিদেশী পুরুষ ও নারী ভারতের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, নিবেদিতার মত কেহ নহে।

নিবেদিতাও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ ও মানবতার বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি ঔপনিষদিক ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্যে মানব-রস সিঞ্চিত প্রকৃতি ও প্রেমের ঐক্যে গ্রথিত, বর্ধিত ও ছন্দিত। তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার ইংরাজি অনুবাদও করিয়া দিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকোর আর একটি প্রতিভা নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিল। তিনি অবনীন্দ্রনাথ। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব

ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের বিশ্বশিল্প-দরবারে আবির্ভাব—ভারত-শিল্পের এই ইতিহাসে পরম গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া আছেন নিবেদিতা।

আবার নিবেদিতার শিল্প-চেতনার পিছনে আছে বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রেরণা। শিষ্যাকে সঙ্গে লইয়া বিবেকানন্দ যখন উত্তর-ভারত ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন নানা বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বহুবার নিবেদিতাকে অতীত ভারতের শিল্প-মহিমার কথাও বলিতেন। তারপর ১৮৯৯ সালে নিবেদিতাকে লইয়া স্বামীজি যখন শেষবারের মত পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইলেন, তখন স্বামীজির প্রেরণায় নিবেদিতাকে নিউইয়র্কে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রচার করিতে দেখি। ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে পৃথিবীর ধর্মেতিহাস কংগ্রেসে নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া বিবেকানন্দ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে স্বামীজি একটি গভীর বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেন। তাহা "ভারতীয় শিল্পের উপর তথাকথিত গ্রীক প্রভাব।" স্বামীজি বিশেষ তথ্য সহকারে প্রমাণ করিলেন, ভারতীয় শিল্পের শাশ্বত প্রাণ কোনো কালেই গ্রীক-প্রভাবে আচ্ছন্ন হয় নাই। স্বামীজির পূর্বে এই কথা কেহই উচ্চারণ করেন নাই—ইহার সাক্ষী ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। এই প্রসঙ্গে ডক্টর কালিদাস নাগ লিখিয়াছেন ঃ

'প্যারিস হইতে নিবেদিতাকে লইয়া স্বামীজি আবার আরম্ভ করিলেন শিল্পতীর্থপরিক্রমা। এই বার তিনি চিত্র-ভাস্কর্যাদি শুধু দেখাইলেন না, তুলনামূলক আলোচনা ও মন্তব্যও করিতেছেন। চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে পাশ্চাত্য শিল্পধারা—অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার বড় বড় চিত্রশালা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া স্বামীজি ইস্তাম্বুল ও কায়রোর প্রাচ্য-শিল্প নিদর্শনগুলিও পরীক্ষা করেন। পূর্ব হইতে পশ্চিমে শিল্প-প্রভাব কতভাবে গিয়াছে,

কী আগ্রহ তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার! মিশরের বিশ্ববিখ্যাত পিরামিড ও অন্য শিল্পবস্তু লইয়া তিনি এমন মাতিয়া উঠিলেন যে, উন্মুক্ত প্রান্তরে সঙ্গীদের সে বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। ভারতের তথা এশিয়ার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন শিল্পের ইতিহাস লইয়া বক্তৃতার কল্পনাও জাগে নাই, কারণ সেখানে শুধু শিল্পী নয় শিল্পও যেন অস্পৃশ্য! স্বামী বিবেকানন্দ এ-ক্ষেত্রে সত্যই পথিকৃৎ।'

জীবনে তিনি শুধু বেদান্তই প্রচার করেন নাই, ভারতের শিল্প-মহিমার কথা যখন যেখানে পারিয়াছেন, প্রাণ খুলিয়া বলিয়াছেন।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে নিবেদিতা সেদিন শিল্প-রসিক বিবেকানন্দকেও দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার শিল্প-চেতনার সহিত গুরুর এই শিল্প-চেতনা মিলিয়াছিল। নিবেদিতা জানিতেন, 'ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া স্থাপত্যশিল্পে, তাঁহার গুরুর অধিকার পুঁথিগত নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত। পদব্রজে ভারতের প্রধান প্রধান সব মঠ-মন্দির স্বামীজি যেমন তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন এমন কম প্রত্নতাত্ত্বিক বা শিল্পের ঐতিহাসিকেরা দেখিয়াছেন।'

ভারতের শিল্পমহিমা সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু ধ্যান-ধারণা বিবেকানন্দ তাহার সমস্তই নিবেদিতার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন; তাই পরবর্তী কালে নিবেদিতা ভারতীয় শিল্প লইয়া এমন গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। নিবেদিতা তাই বিবেকানন্দের শিল্প-চেতনারও প্রতিনিধি।

ভারতের নবশিল্পের প্রচারে নিবেদিতার দান অসামান্য। ১৯০২ সাল হইতে ১৯১১ সালে যখন দেহত্যাগ করেন তখন পর্যন্ত নিবেদিতা একা অবনীন্দ্রনাথের ও অসিত-নন্দলাল প্রমুখ তাঁহার শিষ্যদের কত চিত্রের লিপিভাষ্য 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকার পৃষ্ঠায় রাখিয়া গিয়াছেন। 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশিত হইবার পূর্বেই নিবেদিতা 'প্রবাসী'র জন্য প্রতি মাসে চিত্র-পরিচয় লিখিয়া দিতেন

রামানন্দবাবু স্বয়ং তাহার অনুবাদ করিয়া ছাপিতেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের গৃহ ও বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের সুচিত্রিত প্রাচীর ও ছাদ আজো নিবেদিতার স্মৃতি বহন করিতেছে। নিবেদিতার প্রেরণাতেই নন্দলাল স্বদেশী চিত্রকলার সুন্দর নিদর্শন এই সব ছবিগুলি আঁকিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্রের গৃহের দেয়ালে ভারতমাতা ছবিগুলি নিবেদিতার ইচ্ছাতেই অঙ্কিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিল। উনিশ শতকের শেষ দশকে অবনীন্দ্রনাথের জীবনে যেন এক বিপ্লবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিল্প-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কেরল-শিল্পী রবি বর্মা প্রচুর সুখ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেন। অবনীন্দ্রনাথও পাশ্চাত্ত্য রীতিতে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে দেখা দিলেন মনীষী ই. বি. হ্যাভেল। হ্যাভেলের সহানুভূতি, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি যেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে এক নূতন পথের নির্দেশ দিয়াছিল। ক্যানভাসে আঁকা বড় বড় তৈলচিত্র বিসর্জন দিয়া অবনীন্দ্রনাথ আঁকিতে লাগিলেন 'কৃষ্ণলীলা', রূপকথার নায়ক-নায়িকা, বুদ্ধ ও সুজাতা, ভারতমাতা প্রভৃতি অমর চিত্রাবলী। সেই বিরাট জাতীয় আন্দোলনের যুগে সংস্কৃতি-কেন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আসিলেন টাইকান ও ওকাকুরা। ওকাকুরা ও হ্যাভেলের বই দুইখানি ভারতীয় শিল্পের আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিল। ইঁহাদের সহিত আসিয়া মিলিলেন নিবেদিতা। ওকাকুরার 'প্রাচ্যের আদর্শ' ('আইডিয়ালস্ অব্ দি ঈষ্ট) পুস্তকের ভূমিকায় নিবেদিতা লিখিলেন—'সমগ্র এশিয়াখণ্ডের প্রত্যেক দেশে একই জীবন স্পন্দিত হইতেছে। প্রাচীন মানবসভ্যতার প্রসূতি এশিয়া চিরদিন এক এবং অখণ্ড···ভারতবর্ষই এশিয়ার সভ্যতার জন্মভূমি। ভারতবর্ষ হইতেই এই সভ্যতা জন্মলাভ করিয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা হইতে ইহা যেমন পৃথক তেমনি উন্নত।' নিবেদিতার এই সিদ্ধান্ত স্বদেশী-যুগের চিত্রশিল্পে

সংক্রামিত হইল। অবনীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে নূতন করিয়া দীক্ষা লইলেন। অবনীন্দ্রনাথের মানসপুত্র নন্দলালকে নিবেদিতাই উদ্যোগী হইয়া অজন্তা-গুহা-চিত্রাবলী নকল করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাই অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে বলিলেন—'ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যিই ভালবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়।'

নিবেদিতা নইলে নন্দলালদের যাওয়া হত না অজন্তায়। কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি। প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকান কনসালের বাড়িতে। ওকাকুরাকে রিসেপশন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা; ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি।

...সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই! আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস হোমউডের বাড়িতে, আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ-চিঠি একটি।

পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরি করেই এসেছিলেন তিনি। বড় বড় রাজা-রাজড়া, সাহেব-মেম গিস্‌-গিস্‌ করছে। অভিজাত বংশের বড় ঘরের মেম সব; কত তাদের সাজ-সজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত কায়দা; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্য ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল করছে। হাসি গল্প গানে বাজনায় মাত্‌।

সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রূপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হলো। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমিষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে লাগল।

উড্‌রফ্‌, ব্লাণ্ট এসে বললেন, 'কে এ?'

তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম! 'সুন্দরী সুন্দরী' কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।...নিবেদিতা যেন সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত। নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল ; কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা। দুটি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি।

নিবেদিতার কথা — আনন্দ কুমারস্বামী

১৯১১ সালে ভগ্নী নিবেদিতার অকাল-মৃত্যুর দরুণ তাঁহার অসমাপ্ত 'হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণকাহিনী' গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার ভার আমার উপর পড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র 'স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠা শিষ্যা ছিলেন নিবেদিতা। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজ-বিজ্ঞানে পারদর্শিনী হইয়া তবেই ভারতের জীবন-প্রণালী, শিল্প ও সাহিত্য লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হন; তাঁহার দ্বিতীয় মাতৃভূমি ভারতের আদর্শ বিষয়ে ও ইহার নর-নারীদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও আন্তরিকতা সত্যই অতুলনীয়।

নানা প্রবন্ধ পুস্তকাদির ভিতর দিয়া লেখিকা নিবেদিতা শুধু পাশ্চাত্য জগতের নিকটে ভারতের মুখপাত্রী হইয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এক অভিনব ভারতীয় ছাত্র-গোষ্ঠীকে, যাহারা ভারতের শাশ্বত ধর্ম ও শিল্পের ভিতর দিয়া জাতীয় আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল।

নিবেদিতার মুখে এমন একটা তেজস্বিতা, দীপ্তি ও পবিত্র মুখশ্রী আমি দেখেছি যা সচরাচর চোখে পড়ে না এবং একবার দেখলে কখনো যা জীবনে ভুলতে পারা যায় না। তাঁর কাছে আমরা এত উৎসাহ পেয়েছি. যে বলবার নয়। তিনি যে আমাদের কি ছিলেন, আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করতাম, কিন্তু প্রকাশ করে বলা কঠিন। নিবেদিতার কাছ থেকেই আমরা বিবেকানন্দের ভাব ও কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হই। আমি তখন গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র। একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা স্কুল দেখতে এলেন। আমি তখন দু'খানা ছবি করেছিলাম। একখানা মা কালীর আর অন্যখানা সত্যভামার মানভঞ্জন।

নিবেদিতা অনেকক্ষণ ধরে খুব যত্ন করে ছবি দু'খানা দেখলেন, প্রশংসা করলেন ও আমাকে উৎসাহ দিলেন। কালীর ছবিখানা দেখে বলেছিলেন, 'আরো একটু ঢলঢলে ভাব হবে, সাজসজ্জা বেশী থাকবে না, আর একটু উন্মাদিনী ভাবের হবে।' আমাকে তাঁর বোসপাড়ার বাড়িতে যাবার জন্যে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন। তিনি ছিলেন একজন যথার্থ শিল্পপ্রেমিক।...

কিছুদিন পরে সহপাঠী সুরেন গাঙ্গুলীকে সঙ্গে করে বোসপাড়ায় নিবেদিতার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সিস্টার ক্রিস্টিন ও নিবেদিতা দু'জনে বসেছিলেন।

নিবেদিতা বললেন—'তোমরা নীচে আসন করে বস, আমি দেখি।'

আমরা দু'জনে নীচে আসন করে বসলাম।

নিবেদিতা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমাদের প্রতি চেয়ে রইলেন।

আমরা নিবেদিতার এই অদ্ভুত আচরণে মনে মনে আশ্চর্য বোধ করলেও মুখে কিছু বললাম না। দেখলাম, কী প্রশান্ত উজ্জ্বল সেই দৃষ্টি—এমনটি সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। তারপর ছোট একটি বুদ্ধমূর্তি এনে আমাদের দেখিয়ে বললেন—'কি দেখছ, বল দেখি?'

আমি উত্তর করলাম, 'একটি বুদ্ধমূর্তি।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু দেখ, আমার গুরুদেবের চেহারার সাথে এ মূর্তির কি আশ্চর্য মিল।'

তারপর নিবেদিতা আমাকে স্বামীজির একখানা ছবি তৈরী করতে অনুরোধ করেন। দিনকয়েক পরে আমি স্বামীজির একখানা ছবি করে নিবেদিতাকে উপহার দিলাম। ছবি দেখে নিবেদিতার আনন্দের সীমা ছিল না। আমাকে তিনি প্রশংসা করেছিলেন, আর বলেছিলেন, 'ছবিতে কাপড়-চোপড় একটু বেশী দেওয়া হয়ে গেছে।'

তারপর থেকে আমি প্রায়ই নিবেদিতার বাড়ি যেতাম, আবার কখন কখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িতেও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হতো। মিসেস হেরিংহ্যামের সঙ্গে আমার আর অসিতের অজন্তা যাওয়ার সব ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন এবং তিনিই এক রকম জোর করে আমাদের সেখানে পাঠিয়েছিলেন। দশ-বার দিন পরে নিবেদিতাও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমাদের কাজ (কাজ ছিল অজন্তার ছবি নকল করা) দেখে তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। শতমুখে তিনি প্রশংসা করলেন।

আমাদের ছিল তখন দেশী শিল্পের গবেষণা কাল। ভিক্টোরীয়া যুগের পর এই প্রথম আবার ভারতবর্ষে ভারতীয় আর্টের ধারা নবীনভাবে এল। আমাদের এই নবধারায় ভারতীয় শিল্পকলার চর্চায় প্রথম উৎসাহদাতা যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন এন. ব্লাণ্ট, জাস্টিস উড্রফ, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, জগদীশ বসু এবং ভগিনী নিবেদিতা। শ্রদ্ধেয় ভগিনী নিবেদিতা আমাদের ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতাদের মধ্যে। নিবেদিতার ১৯১০ সালের প্রদর্শনীর চিত্র সমালোচনা যা মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় সেই বৎসর বেরিয়েছিল তা থেকে তাঁর আমাদের দেশী চিত্রকলার উদ্বোধন-যজ্ঞে কতটা সহানুভূতি ছিল তা জানা যাবে।...

ভগিনী নিবেদিতা সর্বদা আমাদের এই জাতীয় জাগৃতি প্রীতির চক্ষে দেখতেন। আমি এবং নন্দলাল প্রায়ই তাঁর নিকট বাগবাজারে যেতাম। তাঁর বাড়িতে একটি স্কুল ছিল। সব জিনিসপত্র খুব তকতকে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার থাকত। মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে এইভাবে পরিচ্ছন্নতারও শিক্ষা দিতেন তিনি। আমাদের উপদেশচ্ছলে বার বার সাবধান করতেন আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না দি। আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের নবজাগরণ নির্ভর করচে—সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন।...

আমাদের বারবার উপদেশ দিতেন, জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যকে জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ কাজ করতে। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন আমাদের ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে আসতেন এবং শিল্পীদের উৎসাহিত করতেন।

নিবেদিতার জীবন সেবা ও আত্মদানমূলক তপস্যার জীবন। বাহিরের শোভাযাত্রায়, ধ্বজপতাকায় তাঁহার জয় ঘোষণা হয় নাই। গুরুর নিকট হইতে যে অগ্নি তিনি আপন হৃদয়-পাত্রে চয়ন করিয়াছিলেন, তাহার তেজ তিনি সযত্নে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন—সেই অপরিমেয় শক্তিকে সংবরণ করিয়া, তাহার পাবকশিখায় আপনাকেই নিরন্তর দগ্ধোজ্জ্বল করিয়া, তিনি কেবল তাহার আলোটুকুই বিকিরণ করিয়াছিলেন। গুরু তাঁহার এই আত্মসৃষ্ট কন্যাটিকে যে-ব্রত দিয়াছিলেন এবং নিবেদিতা যেভাবে তাহা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, সে-ইতিহাস লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গেল। কাজেই নিবেদিতাকে জানিতে বা বুঝিতে হইলে তাঁহার বাহিরের জীবন-যবনিকার অন্তরালে একবার দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বাংলার মাটিতে নূতন করিয়া হলকর্ষণের পর, যখন নব জীবনের বীজ বপন ও বারিসেচন আরম্ভ হইয়াছে, তখন দিকে দিকে কত অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে নিবেদিতা যেন আর একটি বীজ। এই বীজ যেন সকলের দূরে, এক কোণে—নিজেকেই ফল-পুষ্পে বিকশিত করিবার জন্য নয়, অপরগুলির সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য, এমন ফসলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, যাহা বাজার পর্যন্ত পৌঁছায় না; সে কেবল সার হইবার ফসল। বাংলার মাটিতে তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। সেই কালের অব্যবহিত পরে আমরা বাংলার উদ্যানে ফল-ফুলের যে আকস্মিক বাসন্তী-শোভা দেখিয়াছিলাম, ভগিনী নিবেদিতার নীরব আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকাতলে কোন্ রসধারা গোপনে সঞ্চারিত করিয়াছিল—তাহা নির্ণয় করিবে কে? নিবেদিতার আত্মবিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাঁহার জাতি ও

দেশ, ধর্ম ও শিক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন, এবং বয়োধর্মে এমনই দৃঢ় ও দুশ্চ্ছেদ্য হইয়াছিল যে, শুধু মনে বা ভাবজীবনে নয়—একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়ার কথা কে কোথায় শুনিয়াছে? ধর্মান্তর গ্রহণ বরং সহজ, কিন্তু একই দেহে জন্মান্তর-গ্রহণ কে কোথায় দেখিয়াছে?

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার দেহরক্ষার পরে লিখেছিলেন : 'নিজেকে এমন করিয়া নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই···প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সে-জন্য মানুষ যত প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল—যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন—নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না—নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, লাভ-লোকসান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিছু না—ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।······একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না······তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।'

লোকোত্তর প্রতিভাধরের যোগ্য তর্পণ মহীয়সী প্রতিভাময়ীর উদ্দেশে।

উপমাসম্রাট শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন : মানুষগুলো বাইরে থেকে দেখতে প্রায় এক রকমেরই মনে হয় বটে, কতকটা পুলিপিঠের মতন। কিন্তু তফাৎ হয় পোরের স্বাদে। কারুর মধ্যে গুড়ের পোর, কারুর নারকোলের—তবে সেরা পুলিপিঠের মধ্যে থাকে ক্ষীরের পোর।

মহীয়সী নিবেদিতা জন্মেছিলেন অমৃতের সঙ্গে সুধার পোর নিয়ে। আত্মনিবেদনের অপরাজেয় শক্তি ও পরের দুঃখে ব্যথিয়ে ওঠার কমনীয় শক্তি ছিল যেন তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল। ভবভূতির উপমায় :

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।' একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। একদিকে তিনি ছিলেন যেমন ফুলের মতন নরম, সুন্দর—স্নেহে দরদে সেবায়—অন্যদিকে তেমনি বজ্রের চেয়েও কঠিন, অসহিষ্ণু—দাম্ভিক অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।

ভোগবাদী খ্রীষ্টান পরিবেশে তাঁর জন্ম—আয়র্লণ্ডে। বড় বিচিত্র এই আইরিশ সংস্কৃতি—সমন্বয়শালী: আদর্শবাদ ও বাস্তবপ্রীতি, স্বপ্নচারণ ও ব্যঙ্গবিলাস, বর্ণময় কবিত্ব ও গভ্যময় নিষ্ঠা—সার সার এই ধরনের নানা স্ববিরোধী প্রবণতার সমাহার।

আইরিশ চরিত্রে দেখতে পাই আর একটি সহজ উন্মুখতা: রূপ ও অরূপের সঙ্গম—মিস্‌টিসিস্‌ম্‌ ওরফে অতীন্দ্রিয় অলোকপন্থা। এ-ভাব যাদের মনে একবার ঠাঁই পায় তারা পৃথিবীতে থেকেও আর কিছুতেই পার্থিব বা বিষয়ী হ'তে পারে না—রূপকে তাদের মন মানলেও গভীরে অন্তরাত্মা তৃষিত থাকে সব রূপের উৎস অরূপের নাগাল পেতে —মন্ময়তাকে পাশ কাটিয়ে তন্ময় হ'তে। তাই তো নিবেদিতা বস্তুতান্ত্রিক আবহে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজের মৃন্ময়ী সত্তাকে কোনোদিন অঙ্গীকার করতে পারেন নি, চেয়েছিলেন পদে পদে চিন্ময়ী হ'য়েই ফুটে উঠতে। ফের সেই দুই স্ববিরোধী সমন্বয়: কুসুমের সঙ্গে কুলিশের। তাঁর স্বাদেশিক কবি জর্জ রাসেলের (A.E.) মধ্যেও পাই এই মহনীয় সমন্বয়। তাই না তিনি হ'য়ে উঠেছিলেন নয়া আয়র্লণ্ডের এক দিকপাল স্থপতি।

নিবেদিতারও হ'তই হত কোনো অনুরূপ মহৎ বিকাশ দেশে থাকলেও। অগ্নিশিখা যার আত্মার উপজীব্য তার প্রাণ কি না গেয়ে পারে: 'মাটির সাথে ছিলাম মাটির ম'ত—শিখার ম'ত উঠেছি আজ জ্বলে।' এখানে লোকোত্তর গুরুর সঙ্গে অসামান্যা শিষ্যার সাদৃশ্য বিস্ময়কর: উভয়েই জন্মেছিলেন উর্ধ্বমুখী অগ্নিসত্তা নিয়ে। তাই উভয়েরই পরের দুঃখে প্রাণ কাঁদত, উভয়েই ছিলেন কল্পনায় উর্ধ্বচারী, প্রতিভায় সমধর্মী, চরিত্রে একনিষ্ঠ অথচ সাড়ায় বহুমুখী। শ্রীঅরবিন্দের

সংজ্ঞা "All sides he sees and turns to every call" উভয়েরই সম্বন্ধে সমান প্রযোজ্য।

নিবেদিতা তাই সিন্ধুপারে ভোগবাদীদের আরামনিলয়ে ব'সে আথাল পাথাল ভাবতেন—নিজের জীবনকে 'কোন্ আদর্শের মুখে চালাবেন? নানামুখী ছিল যে তাঁর মনের গতি, প্রাণের তৃষ্ণা।

এমনি সময়ে তৃষার্ত পেল দিশারির দেখা: বিবেকানন্দের অভ্যুদয় হ'তে না হ'তে তাঁর সব অনৈশ্চিত্যের দোলাই থেমে গেল। ঘর ছাড়তে তিনি তো প্রস্তুতই ছিলেন, কেবল ডাক শোনার অপেক্ষা। সে-ডাক বেজে উঠল তাঁর নিয়তি-নির্দিষ্ট গুরুর কণ্ঠে: 'আমি চাই কুড়িটি শিষ্য শিষ্যা যারা নিঃস্ব হ'য়েও বলবে অকুতোভয়ে যে, তাদের ভগবান ছাড়া কোনো সম্পত্তিই নেই! কে সাড়া দেবে এ-ডাকে?' নিবেদিতা লিখছেন: 'বলতে বলতে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন, বললেন জলদমন্দ্রে: কিসের ভয়? ভগবান যদি সত্যি থাকেন তবে কার পরোয়া? আর যদি না থাকেন তবে বেঁচে কী হবে?'*

এই ডাকটির জন্যেই নিবেদিতার প্রাণ মন ছিল পথ চেয়ে—ঠিক যেমন বৃন্দাবনের গোপীরা থাকতেন বাঁশির ডাকের পথ চেয়ে। ইন্দিরা দেবীর একটি অপূর্ব হিন্দি মীরাভজনে আছে:

ইক বাঁসরি থী বাঁসরি মধুবনমে বজ রহী।
ইৎনী জরাসি বাতপে দুনিয়া বদল গঈ।
জীবন বদল গয়া সখি, দুনিয়া বদল গঈ॥
(নীল যমুনায় উঠল বেজে বাঁশের বাঁশি তার।
ছোট্ট সে-ডাক শুনে ভেসে গেল এ-সংসার।
জীবন মরণ অম্‌নি আমার হ'ল একাকার॥)

* বিবেকানন্দের মন্ত্রোক্তিটির বাংলা অনুবাদ হয় না। তিনি বলেছিলেন: "If this is true, what else could matter? *If it is not true, what do our lives matter?*" (নিবেদিতার *My Master as I saw Him*, দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

গুরুর বৈরাগ্য-শঙ্খরবে নিবেদিতারও সংসার গেল ভেসে, জীবন-মরণ হ'য়ে গেল একাকার। সত্যিই তো, কিসের পরোয়া? কী যায় আসে ভোগ হাতছাড়া হ'লে যদি ভগবান এগিয়ে আসেন সব সাধ মেটাতে? আর যদি তিনি না থাকেন তবে কী হবে দুদণ্ড রঙিন ঝিনুক নিয়ে খেলা ক'রে? এ-আনন্দ কি ভোগ না দুর্ভোগ?

অথ, নিবেদিতা ছাড়লেন দেশ, হ'লেন ঘরছাড়া। ঠিক ব্রজগোপীদের মতনই যেন এসে ধর্না দিলেন দিশারির দরবারে ঃ

ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষুন্। (ভাগবত)
ওগো দুর্লভ! দাও তাহাদের ঠাঁই যারা প্রেমে যাচে শরণ,
করুণাকোমল দেবতা যেমন মুক্তিকামীরে করে বরণ।

গুরু ডাকলেনও বটে, শিষ্যা সাড়া দিয়ে কাছে এনে তাকে গ্রহণ করলেনও বটে—যখন সে বলল ঃ 'গুরুদেব! এসেছি তোমার চরণে সব ছেড়ে, দেখ চেয়ে—সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়ান্ তব পাদমূলম্'—কিন্তু বহু পরীক্ষা ক'রে তবে তাকে দিলেন দীক্ষা—যাকে চলতি ভাষায় বলে 'বাজিয়ে নেওয়া'।

গর্বী জাত আইরিশ—আরো বেশি, স্পর্শকাতর। নিবেদিতা ছিলেন মনেপ্রাণে আইরিশ। সুতরাং অভিমানিনী। কাজেই গুরুর সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাধত প্রায়ই। সময়ে সময়ে সংঘাত এমন মর্মান্তিক হয়ে উঠত যে মনে হ'ত—আর পারবেন না—বিশেষ যখন গুরু তাঁকে ধমকাতেন ঃ 'সব আগে তোমাকে ছাড়তে হবে শ্বেতাঙ্গিনীর দুরভিমান—নত হতে হবে দীনতম ভারতীয়ের কাছে—বড়র কাছে মাথা নিচু করতে কে না পারে? তোমাকে হ'তে হবে নিচুর কাছে নিচু।'

নিবেদিতা ক্ষুব্ধ হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, মনের দুঃখে চোখের জলের নদী ব'য়ে যেত। কিন্তু হার মানবেন কেমন ক'রে—যখন গুরুকে মহাপুরুষ ব'লে চিনেছেন একবার? নিবেদিতা বিদ্রোহের

পরে আত্মজয় ক'রে শেষে মাথা নিচু ক'রে এসে দাঁড়াতেন—মেনে নিতেন গুরুর আদেশ অকুণ্ঠেই, ফের যথাবিধি সুরু হ'ত তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্য : দুঃখীর সেবা, নিরক্ষরকে পড়ানো, রুগ্নের শুশ্রূষা, আর্তদের সদাসতর্ক পরিচর্যা—দীনতম খুঁটিনাটিতে, ক্লিন্নতম পরিবেশে।

কিন্তু গুরু শিষ্যাকে পদে পদে শাসন করলেও তার আশ্চর্য মহিমার মর্মজ্ঞ ছিলেন প্রথম থেকেই। তাঁকে একবার লিখেছিলেন (২০ জুন, ১৮৯৭) 'Every word you write I value, and every letter is welcome a hundred times.' (তোমার প্রতিটি কথা আমার কাছে মূল্যবান্, প্রতিটি পত্র আমার কাছে বহুবাঞ্ছিত)। শুধু তাই নয়, তাঁর মনের কত গভীর বেদনার স্বপ্ন-ভঙ্গের কথাই যে তিনি বলতেন এই প্রাণপ্রিয়া অন্তরঙ্গার কাছে—সে বিচিত্র রমন্যাস পথ চেয়ে আছে কোনো এক মহাশিল্পীর যে এ-দুই অগ্নিসত্তার কাহিনী ফলিয়ে তুলবে অতুলনীয় নাট্যকাব্যে।

কিন্তু সবচেয়ে গভীর আনন্দচমকের মধুস্বাদ উপস্থিত হয় এই দুই মহৎ আত্মার শুভদৃষ্টির ইতিহাস থেকে। এর আগে ঘটেছিল ঠিক এমনিই আর এক শুভদৃষ্টি—শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের। বালসরল গুরু সে-ক্ষেত্রে শিষ্যকে বলেছিলেন অকপটেই যে, তিনি শুধু তার পথ চেয়েই ছিলেন এতদিন। নিবেদিতাকে বিবেকানন্দ কোনোদিন এমন কথা খুলে বলেন নি বটে, কিন্তু শিষ্যার নানা রচনা তথা গুরুর নানা পত্রাবলী থেকে আভাষ মেলে এর চমকপ্রদ নাট্যরসের : যে, এ-দুই অগ্নিসত্তার দীপ্ত সহযোগ ছিল তাঁর নির্দিষ্ট যিনি উভয়কে পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাহনরূপে গ'ড়ে, পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাণীবাহ হ'তে—নবভারতের জাগৃতিব্রতের পূজারী পূজারিণী পদে বাহাল ক'রে।

নিবেদিতার কথা প্রথম শুনি লণ্ডনে আচার্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুর মুখে। তাঁর নাম করতেই আচার্যের মুখের ভাবান্তর হ'ত। 'সে ছিল একটা দেখবার মতন বস্তু দিলীপ, অথচ দেখেও যেন বিশ্বাস হ'তে

চায় না।' এই ধরনের সে কত চমৎকার কথা! অনুচ্ছ্বাসী মানুষের মুখে উচ্ছ্বাস যেন আরো মর্মস্পর্শী হ'য়ে ওঠে।

তারপর শুনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে। আমাকে একাধিকবার বলেছিলেন তিনিঃ 'নিবেদিতার ছিল সেই ভালোবাসা দিলীপ, যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।'

কবির কথা অপ্রতিবাদ্য। নিবেদিতার জীবনচরিতের প্রতি পাতায় মেলে তাঁর দিব্য রূপান্তরের কাহিনীঃ তাঁর জীবনে বিপ্লব ঘটেছিল একটি মানুষের আবির্ভাবেঃ স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁকে ভালোবেসেই তিনি শিখেছিলেন হিন্দুর দেবদেবীকে ভালোবাসতে, ভারতকে পুণ্যভূমি ব'লে চিনতে, ভারতের দীন দুঃখী আর্ত নিঃস্বকে কোল দিতে নিজের সন্তানের ম'ত।

সর্বোত্তম প্রেমের উদ্ভব পূজার তৃষ্ণায়, সঞ্চরণ—সেবার আনন্দে, কৃতার্থতা—আত্মনিবেদনে। তাই তিনি নামের মধ্যে দিয়েই দিয়েছিলেন আত্মপরিচয়—আর আত্মবোধ তাঁর মধ্যে উন্মেষিত হয়েছিল গুরুর দীক্ষায়ই। তাই তো তিনি গুরুর তিরোধানের পরে দেখতে পেয়েছিলেন সারা ভারতে তাঁর আবির্ভাব। এ-অসম্ভব সম্ভব হয় কেবল অঘটনঘটনী প্রেমদীক্ষার যাদুমন্ত্রে, যোগবলে। তাই গুরুর মহাপ্রয়াণের পরেও তিনি শুধু যে তাঁর স্বজাতি স্বদেশকে আপনার জাতি ও দেশ ব'লে বরণ করতে পেরেছিলেন তাই নয়, সে-দেশ ও জাতির মুক্তিরণে বিপ্লববাদীদের সঙ্গে প্রাণকে পণ ক'রেও যোগ দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। আর এইখানেই ঘটেছিল তাঁর নিরুদ্ধ অগ্নিসত্তার চোখ-ধাঁধানো বিস্ফোরণ—যার উল্লেখ ক'রে শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই বলতেনঃ 'She was a veritable live wire!' নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা হয়েছিল এই অগ্নিলোকের অন্দরমহলেই। তাইতো নিবেদিতা বুক দিয়ে এসে পড়েছিলেন সতীর্থের সহকারী হ'য়ে, তাঁকে চন্দননগরে পাঠাতে অগ্রণী হয়েছিলেন নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে।

এর পরে তাঁর কথা শুনি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের মুখে। নিবেদিতার কথা বলতে তিনি আত্মহারা হ'তেন সত্যিই। 'আহা, কী মানুষ ছিলেন তিনি দিলীপ—সে দেখাও একটা ভাগ্য—এমন আধারকে পেয়েছিলাম আমরা না চাইতেই—অথচ যেন চিনতে পারি নি।'......ইত্যাদি। তাঁর সে-উচ্ছ্বাসের বারো আনাই ভুলে গেছি, মনে আছে শুধু তাঁর নিবেদিতার নামে উজিয়ে ওঠা—যার একটি অপরূপ পরিচয় পাই তাঁরই লেখায়। তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'-তে তিনি লিখেছেন (১১৪-৫ পৃঃ):

'আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস হোমউডের বাড়িতে, আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ-চিঠি একটি।......বড় বড় রাজরাজড়া সাহেব মেম গিস গিস করছে। অভিজাত বংশের বড় ঘরের মেম সব; কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত কায়দা; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্যে ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল করছে। হাসি গল্প গানে বাজনায় মাত্। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রুপোলিতে মেশানো, উঁচু ক'রে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব, যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হ'ল! সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হ'য়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে লাগল। উড্রফ, ব্লাণ্ট এসে বললেন, 'কে এ?' তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম।

'সুন্দরী সুন্দরী' কাকে বলো তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর আদর্শ হয়ে আছে কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হ'য়ে উঠল।......সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত।...কী

করে বোঝাই সে কেমন চেহারা। ছুটি যে দেখিনি আর, উপমা দেব কি?'

তাঁর সম্বন্ধে আরো কত কথা বলার আছে। কিন্তু ছোট পরিসরের প্রবন্ধকে টেনে বড় করা বাঞ্ছনীয় নয়। তাছাড়া, বলেছি, নিবেদিতার কথা বলার মতন ক'রে বলতে হ'লে লিখতে হয় একটি নিটোল রমন্যাস—প্রবন্ধে সানাবে কেন? তাই ইতি করি শুধু শেষে তাঁর সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের তর্পণের প্রতিধ্বনি ক'রে যে, তাঁর শুধু রূপ নয় —অগ্নিসত্তারও উপমা দেওয়া যায় না। মনে পড়ে সুভাষের একটি প্রায়োক্তি: 'দিলীপ, আমাদের দেশকে যারা কথায় কথায় ছোট করতে চায় আমাদের হাজারো গ্লানির জর্জরতার জন্যে, তাদের পড়তে বলি নিবেদিতার *My Master as I saw Him*। এতবড় স্রষ্টা গুরুর এতবড় দ্রষ্টা শিষ্যা জগতে আর হয়েছে ব'লে জানি না।'

মহীয়সী নারী যে একধারে শক্তি তথা লক্ষ্মী এ স্বর্ণসত্যের সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় মিলবে। এ যুগে নিবেদিতা শুধু সে-সাক্ষ্যে আরো উজ্জ্বল ক'রে দাগা বুলিয়েছেন তাঁর দীপ্র আত্মনিবেদনের স্বর্ণাক্ষরে:

'বিনা শক্তি নাই মুক্তি'—গাহিলেন তন্ত্রে সদাশিব।
'বিনা লক্ষ্মী নাই গৃহ'—গাহিলেন ঋষি সংহিতায়।
গাইলেন কবি: 'বিনা দীপ্তিময়ী প্রেরণাপ্রদীপ
কে জ্বালে স্রষ্টার প্রাণে?' গাহিল সাধক: 'এ-ধরায়
বিনা দেবী অধরায় কে আহ্বান করে যুগে যুগে
পূর্ণ আত্মনিবেদনে জাগৃতির মন্ত্রে বুকে বুকে?'

মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল—যিনি বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে সিস্টার নিবেদিতা এই নামে এখন পরিচিত ও সম্পূজিত—আমার গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশিনী শিষ্যাদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। শুধু অন্যতমা বলি কেন—আমার বিবেচনায় তিনিই ছিলেন সর্বাগ্রগণ্যা। কি বংশ গরিমায়, কি শিক্ষা-দীক্ষায়, কি ব্যক্তিত্বে, কি আধ্যাত্মিক শক্তিতে এবং সর্বোপরি কি ভারতপ্রীতিতে, মিস নোবলের সঙ্গে কারো তুলনাই করা চলে না। নরেন যখন আমাকে লণ্ডনে ডেকে পাঠায় তখন আমি সেখানে গিয়ে সর্বপ্রথম মিস্ নোবলকে দেখি। নরেন তখন দ্বিতীয়বার লণ্ডনে এসেছে ও তখন হিন্দুযোগী হিসাবে 'স্বামী বিবেকানন্দ' এই নামটি ঐ দেশে ধর্মপিপাসু নর-নারীদের মুখে মুখে ফিরত। আমি ১৮৯৬ সালের কথা বলছি।

একদিন দেখলাম মিস নোবল আমাদের ফ্ল্যাটে এসে নরেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নরেনই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তখন থেকেই মিস নোবল স্বামীজিকে গুরু বলে গ্রহণ করেছেন ও তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝেছিলাম যে তিনি তাঁর গুরুর আহ্বানে ভারতবর্ষে গিয়ে তাঁর অভিপ্রেত কাজকর্মের দায়িত্ব নিতে মনস্থ করেছেন। নরেন আমাকে পরে বলেছিল যে, 'মিস নোবল খুব 'good soul' এবং ও এডুকেশন লাইনে আছে। তাই ভাবছি মেয়েদের জন্য যে স্কুল গড়বার পরিকল্পনা আমার আছে তার সকল দায়িত্ব ওকে দেব। মনে হয় ও পারবে।' নরেনের এই নির্বাচন যে অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি, বাগবাজারের 'ভগিনী নিবাস' তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করেছে উত্তরকালে।

মিস নোবল যখন বেলুড় মঠে আসেন তখন আমি আমেরিকায়। শুনেছি এই বিদেশিনী মহিলাকে তার শিষ্যারূপে গ্রহণ করা ও পরে তাকে বেলুড় মঠে এনে রাখার বিষয়টি আমাদের কোন কোন গুরুভ্রাতা, বিশেষ করে রাখাল [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] নাকি প্রীতির চক্ষে দেখেন নি। শেষ পর্যন্ত নরেনকে বাধ্য হয়েই মিস নোবলকে বাগবাজারে স্থানান্তরিত করে তাঁর জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তথাপি নিবেদিতা আজীবন নিজেকে সব সময় 'Nivedita of R. K. order' বলেই মনে করতেন।

আমেরিকায় থাকবার সময়ে আমি মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীমায়ের [শ্রীসারদামণি] কাছ থেকে যেসব পত্র পেতাম তার মধ্যে মিস নোবলের কথা থাকত। মায়ের পত্রে তাঁর প্রশংসার কথাই থাকত। একটি চিঠিতে তিনি আমাকে তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন : 'নরেনের বিদেশিনী শিষ্যাদের মধ্যে নিবেদিতার মতো এমন শুদ্ধ ভক্তিময়ী নারী আমি খুব কমই দেখেছি।'

আমি যখন প্রথমবার লণ্ডনে যাই সেখানে আমি মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। তাঁর কাছেও আমি মিস নোবলের অনেক কথা শুনেছিলাম। দত্ত সাহেবকে মিস নোবল তাঁর 'ধর্মপিতা' বা God-father বলে মনে করতেন এবং তাঁরই প্রেরণায় মিস নোবল পরবর্তীকালে একটি সুন্দর বই রচনা করেছিলেন। সেই বইটির নাম 'The webs of Indian Life'. ভারতীয় সমাজজীবন ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে এত সুন্দর বই আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। নিবেদিতার এই বইটি পাঠ করলেই জানা যায় ভারতীয় জীবনধারা সম্পর্কে তাঁর পরিচয় কত গভীর ছিল।

নরেন একবার একটি চিঠিতে নিবেদিতা সম্পর্কে লিখেছিল :

বাগবাজারের এই 'ভগিনী নিবাস' উত্তরকালে 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

'ভাই কালী [স্বামী অভেদানন্দের গৃহস্থ আশ্রমের নাম] তুমি শুনে সুখী হবে যে, কিছুদিন পূর্বে বাগবাজারে সতেরো নম্বর বাড়িতে মিস নোবল-এর স্কুলটি স্থাপিত হয়েছে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ নিয়ে। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে এর উদ্বোধন কার্য সমাধা করলেন। এটা ভালই হলো। মেয়েদের জন্য এই বিদ্যালয়টির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কারণ ইহা সংঘজননীর আশীর্বাদ লাভ করেছে। বেলুড়মঠ থেকে আমি, রাখাল ও শরৎ এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। মিস নোবল যে অল্পদিনের মধ্যেই এই বালিকা বিদ্যালয়টি আমার মনের মতো করে গড়ে তুলতে পারবে সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এই কাজের জন্যই তো ওকে আমি এই দেশে নিয়ে এসেছি। একটি নূতন আদর্শে এদেশের মেয়েদের জীবন গড়ে উঠুক, একটা সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের চরিত্র বিকশিত হয়ে উঠুক, তার জন্যই মহানগরীর এক প্রান্তে আমাদের এই সামান্য আয়োজন। আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি মিস নোবলের চেষ্টায় এই আয়োজন সফল হবেই।'

নরেনের মহাপ্রস্থানের পর আমরা সবাই এই স্কুলটি সম্পর্কে খুব চিন্তিত হয়েছিলাম। কারণ মিস নোবলের উপর এর সকল দায়িত্ব থাকলেও, মাথার উপরে ছিলেন তাঁর আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু পরে বেলুড়মঠ থেকে শরৎ এক চিঠিতে আমাকে জানিয়েছিল যে, 'নিবেদিতার স্কুলটি ভালই চলছে এবং এটি যাতে স্থায়িত্ব লাভ করে সেজন্য মিস নোবলের চেষ্টা ও যত্নের ক্রটী নেই। তাঁরই চেষ্টায় জে. সি. বোস [বৈজ্ঞানিক স্যর জগদীশচন্দ্র বসু] প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এখন স্কুলটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের অনেকেই আজকাল মাঝে মাঝে বাগবাজারে স্কুলটি পরিদর্শন করতে আসেন। রবি ঠাকুরও আসেন, শুনেছি। ছাত্রী সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।'

আমার ধারণা মিস নোবল একজন খুব ভাল Organiser

ছিলেন ও তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল যার ফলে অমন সব প্রখ্যাত ব্যক্তির সহানুভূতি ও সহযোগিতা তিনি লাভ করেছিলেন। একজন বিদেশিনী মহিলার পক্ষে এটা বড়ো কম কৃতিত্বের কথা নয়। তাই মনে হয় বাগবাজারের এক কোণে সামান্য একটি স্কুলকে কেন্দ্র করে মিস নোবল তাঁর কর্মের পরিধি এমনভাবে বিস্তার করেছিলেন যার ফলে তিনি সমগ্র বাংলার চিত্তলোক জয় করেছিলেন। আমার মনে হয়, নরেনের মহাপ্রস্থানের পরে তার এই সুযোগ্য শিষ্যাটি না থাকলে তার ভাবধারাও সারা ভারতে অমনভাবে প্রচারিত হতো না। '

মিস নোবলের ছিল অসাধারণ গুরুনিষ্ঠা। তার পরিচয় তিনি কথায় নয়, কাজেও দিয়েছেন। তিনি যে যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্যা ছিলেন তাতে আমার কোন সংশয় নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় মিস নোবলের চিত্ত যে কতদূর অভিসিঞ্চিত ছিল তার পরিচয় আমি পেয়েছিলাম একটি চিঠিতে। আমেরিকা থেকে এক পত্রে আমি একবার তাঁকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম। সেই প্রশ্নটিতে মাতাঠাকুরাণীর কথা ছিল। আমার সেই প্রশ্নের উত্তরে মিস নোবল লিখেছিলেন : 'পূজনীয় মহারাজ, শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে আমার কি ধারণা তা আপনি জানতে চেয়েছেন। আমি কি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারি? আপনারা মায়ের সন্তান ও সেবক; আপনারা তাঁকে যেমন বুঝেছেন, আমি যদি তার শতাংশের একাংশও বুঝতে পারতাম তা হলে ধন্য হয়ে যেতাম। তাঁর সান্নিধ্যে বাস করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং তিনিও আমাকে 'খুকী' বলে স্নেহ করেন। আমার দৃষ্টিতে মনে হয়েছে, তিনিই নারীজাতির আদর্শ সম্বন্ধে শেষ কথা। একদিকে তাঁর মধ্যে আমি দেখেছি প্রাচীন ভারতের নারীর আদর্শ, আর অন্য-দিকে নতুন আদর্শেরও তিনি প্রথম দৃষ্টান্ত। তাঁর সরলতা হৃদয়-মন দিয়ে অনুভব করার জিনিস। এমন মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা ক্বচিৎ দেখা যায়। তিনি যেন মাধুর্যের প্রতিমা। জ্ঞানেও তিনি অসাধারণ।

আর কি কোমল প্রকৃতির তিনি—আমি যখনই তাঁর কাছে দু'দণ্ড বসেছি তখনই তাঁর কোমলতায় অভিভূত হয়েছি। ভারতবর্ষে আসা আমার সার্থক হয়েছে, কারণ আমি এমন একজন ভারতীয় নারীর চরণতলে বসবার সৌভাগ্য লাভ করেছি যাঁর চরিত্রোৎকর্ষ বাক্যের অতীত।'

আমি মিস্ নোবলের এই চিঠিখানি পাঠ করে যারপর নাই মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং তার ঈপ্সিত কাজের জন্য নরেন যাঁকে নির্বাচন করে কন্যা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি যে একজন যথার্থ অসাধারণ মহিলা, তা না বললেও চলে। যে দশ-বার বৎসরকাল তিনি এই দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন তার মধ্যে কোন ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। সত্য বটে তিনি একসময়ে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তথাপি রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতি তাঁর আনুগত্য কোনদিন এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। তিনি যখন মারা যান [১৯১১] তখন আমি এদেশে ছিলাম না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতা শহরে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে যেসব সভার আয়োজন হয়েছিল, আমার গুরুভ্রাতারা তার কিছু কিছু বিবরণ আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

সেই সব বিবরণ থেকে আমি জানতে পারি যে, রামকৃষ্ণ সংঘের বাইরেও মিস্ নোবলের জীবন, চিন্তা ও কর্মধারা বিরাটভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল। উনিশ শতকের বাংলায় যে নবজাগরণ এসেছিল, ঐ শতকের ক্রান্তিলগ্নে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে তা সার্থকভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল এবং তারপর এই শতাব্দীর সূচনায় সেই জাগরণ নানাদিক দিয়ে যেন জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। ঐ সময়ে একবার এই দেশে কিছুকালের জন্য এসে আমি তা প্রত্যক্ষ করে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, শুধু রাজনীতি নয়, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি—জাতীয় জীবনের সর্বস্তরেই যেন জাগরণের একটা বন্যা এসেছিল। তার প্রত্যেকটির সঙ্গে মিস নোবলের সংযোগ কি

গভীর ও আন্তরিক ছিল তা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি। 'সিস্টার নিবেদিতা' এই নামটি সেদিন বাংলাদেশের শিক্ষিত মহলে যেমন সুপরিচিত ছিল, তেমনি সর্বসাধারণের মুখেও আমি ঐ নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতে শুনিছি।

১৯২৫ সনে আমার আরব্ধ কর্ম শেষ করে আমেরিকা থেকে আমি ভারতে প্রত্যাবর্তন করি ও প্রথমে দার্জিলিঙ-এ একটি মঠ স্থাপন করি। ঐ সময়ে আমার মনে হলো এই দার্জিলিঙ-এই মিস্ নোবলের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল চৌদ্দ বছর আগে। কিন্তু তাঁর চিতাভস্মের উপর একটি স্মরণচিহ্ন নির্মাণ করার কথা কেউ চিন্তা করেনি—না রামকৃষ্ণ মিশন, না জনসাধারণ। ভারতের বেদীমূলে যিনি নিজেকে অমনভাবে নিবেদন করে তাঁর গুরুর দেওয়া নামটি সার্থক করেছিলেন, তাঁর স্মৃতির প্রতি এই অবহেলা আমাকে ব্যথিত করে। আমি তখন আমার নিজের অর্থে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠের পক্ষ থেকে একটি স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিই। প্রস্তরফলকে আমি তাঁর সম্পর্কে শুধু একটি কথাই উৎকীর্ণ করিয়ে দিয়েছিলান: 'Who gave her all to India'—এইটাই কি তাঁর সত্যকার পরিচয় নয়?

স্বামী বিবেকানন্দের পরেই, রামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন দ্বিতীয় প্রধান। পাশ্চাত্যজগতে, বিশেষ করে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে তাঁরই দান ছিল সমধিক। একাদিক্রমে পঁচিশ বছরকাল তিনি ঐ দেশে অবস্থান করে বেদান্ত প্রচার করে ভারতের আধ্যাত্মিক গৌরব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। স্বামীজির মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল লণ্ডনে ও আমেরিকায় এবং ১৯০৫ সালে এই দেশে; স্বামী অভেদানন্দ ঐ সময় কিছু দিনের জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন। নিবেদিতা সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ লিখিত এই বিবরণটি আজ পর্যন্ত কোথাও কোন পুস্তকে বা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি; এমন কি এই লেখাটির সন্ধানও কেউ জানতেন না। ১৯৬৬ সালে যখন স্বামী অভেদানন্দ শতবার্ষিকী হয়, ঐ সময়ে

উক্ত শতবার্ষিকী কমিটির অনুরোধে সুবিখ্যাত জীবনীকার শ্রীমণি বাগচি ইংরেজীতে স্বামী অভেদানন্দ সম্পর্কে একটি বিপুলায়তন জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নের কালে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের [স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ] কর্তৃপক্ষ শ্রীবাগচিকে যেসব উপাদান-উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে ছিল স্বামী অভেদানন্দের অপ্রকাশিত ডায়েরী—ইংরেজিতে লেখা। ঐ ডায়েরির মধ্যে তিনি নিবেদিতা সম্পর্কে যে সব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, শ্রীবাগচি তাই এই গ্রন্থের জন্য সংকলিত করে দিয়েছেন-।—সম্পাদক।

মানব-প্রেমিক বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বোপরি ভারত-প্রেমিক, আর তাঁর সেই ভারত-প্রেম ভারতের অতীতের গৌরব রোমন্থনের নামান্তর ছিল না, অর্থাৎ তাঁর ভারত-প্রেম নির্বীর্য ক্লীব ভীরু ভাব-বিলাস ছিল না। সমকালীন ভারতের দুর্দশা, তার পরাধীনতা, তার লাঞ্ছনা স্বামী বিবেকানন্দকে পাগল করে দিয়েছিল বেদনায়। তাঁর দুর্জয় পৌরুষ, অসামান্য আত্মিক শক্তি, অতুলনীয় ধী-শক্তি সব কিছু তিনি নিবেদন করেছিলেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তির জন্যে। রাজনৈতিক পরাধীনতার দুর্বিসহ অপমান ও হীনতাকে উপেক্ষা করে, কিংবা তাকে দূর করবার চেষ্টা না করে একান্তে নিভৃতে আধ্যাত্মিকতার চর্চা করবার মতো কাপুরুষ ছিলেন না বিবেকানন্দ। তাঁর সাধনার প্রাণবায়ু ছিল ভারতবর্ষের মুক্তি। সে-মুক্তি শুধু ধ্যান ধারণার দ্বারা ব্যক্তির উপলব্ধিমূলক মুক্তি নয়, সে মুক্তি জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি।

নিবেদিতার জীবনে যে তাঁর গুরুদেবের রাজনৈতিক সত্তার প্রবল ছাপ পড়বে, সেটি সহজেই অনুমেয়। কেলটিক রক্ত নিবেদিতার দেহে ছিল প্রবাহিত, ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল তাঁর জাতিগত সংস্কার। জাতীয় মুক্তিকে আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেখা যেমন সম্ভব ছিল না বিবেকানন্দের পক্ষে, তেমনি সম্ভব ছিল না নিবেদিতার পক্ষে। প্রখরবুদ্ধিশালিনী নিবেদিতা স্বামীজীর বক্তৃতা শুনলেন লণ্ডনে, প্রশ্নও তুললেন, নির্বিচারে মেনে নিলেন না তাঁর মত। যখন শুনলেন বিবেকানন্দের মুখে বুদ্ধদেবের সেই অমৃতবাণী, তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা যে, যত দিন জগতের প্রতিটি জীব মুক্ত না হয়, তত দিন তিনি কর্ম থেকে বিরত থাকবেন না, পরিনির্বাণ গ্রহণ

করবেন না, যখন বুঝলেন যে, এই সন্ন্যাসীও ভগবান বুদ্ধের সেই পথেরই অনুগামী ; যখন শুনলেন রামমোহনকে স্বামীজি 'নব্যভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি' বলে ঘোষণা করছেন ; যখন পেলেন বিবেকানন্দের চিঠি—'আমি চাই বলিষ্ঠ বাক্য, বলিষ্ঠতর কাজ। জাগো, জাগো, মহাপ্রাণ। জগৎ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। তোমার নিদ্রা যাইবার অবসর কোথায় ?'—তখন তিনি আত্মসমর্পণ করলেন এই গুরুর কাছে। বৈদান্তিক ধারণায় এমন এক অটল ভূমিতে এই গুরু তাঁর শিষ্যার মনকে প্রতিষ্ঠিত করলেন যেখান থেকে একান্ত বন্ধন-বিহীন মন নিয়ে জীবনকে দেখা সম্ভব। এমন কি, গুরুগিরির অহমিকা থেকেও নিবেদিতাকে মুক্তি দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের কল্যাণের জন্যে নিবেদিতাকে উৎসর্গ করে বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন—'যদি আমার নিজের কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক ; আর যদি ইহার মূলে সেই পরমা শক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক।'

সত্তার শিখর থেকে উচ্চারিত এমন মহোত্তম বাণী ক'বারই বা উচ্চারিত হয়েছে এই পৃথিবীতে, ক'জন শিষ্যের সৌভাগ্য হয়েছে গুরুর মুখ থেকে বিশ্ব-কল্যাণের জন্যে শিষ্যকে নৈবেদ্য দেবার এমন সত্যবাণী শোনবার ?

ভারতবর্ষকে নিবেদিতা প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। যা কিছু দেখেছিলেন সবই তিনি তাঁর ভালোবাসার আলোকে অপরূপ রূপে দেখেছিলেন। প্রতিটি সংস্কার, প্রতিটি আচার আধ্যাত্মিকতার জ্যোতির্ময় রূপ গ্রহণ করেছিল তাঁর গভীর প্রেম-দৃষ্টির সম্মুখে। নিবেদিতার মত এমন করে ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে খুব কম লোকই পেরেছেন। ভারতবর্ষের অপমানের জন্যে এমন করে জ্বলে পুড়ে মরা, এমন গভীর বেদনাবোধ, ভারতীয়দের আত্ম-অবিশ্বাস ঘোচাবার জন্যে এমন প্রাণ-ঢালা পরিশ্রম ক'জনাই বা করেছেন ?

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ যখন ভারতীয় শিল্পধারার নবযুগ প্রবর্তন করলেন, তখন বিশ্বের দরবারে সেই বার্তা পৌঁছে দেবার ভার নিলেন নিবেদিতা। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি উৎসাহ দিলেন তাঁর বিজ্ঞান-সাধনায়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধ সত্ত্বেও ভারতের মুক্তির জন্যে একান্ত-আত্মনিবেদনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা লাভ করলেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিলেন তিনি। ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটাবার জন্যে অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, পি. মিত্র, সতীশ মুখোপাধ্যায়—এই নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিবেদিতা গুপ্ত সমিতির পরিচালনার ভার নেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা তাঁকে ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলন থেকে এক নিমেষের জন্যেও সরিয়ে নিতে পারে নি। এই কাজ তাঁর গুরুর কাজ বলে তিনি ঘোষণা করলেন। মিশন তাঁকে ত্যাগ করলেন বটে, ভারতবর্ষ কিন্তু তার এই সেবিকাকে বুকে টেনে নিলো।

ভগিনী নিবেদিতা

স্বামী সারদানন্দ

পূজ্যপাদাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্য ত্যাগ ও চরিত্রবলে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রদর্শিত 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সর্বস্বত্যাগরূপ পন্থার অনুসরণ করতঃ পাশ্চাত্যের যে সকল মহাপ্রাণা রমণী দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত ভারতের কল্যাণে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাহাদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন, একথা বলিলেও এক হিসাবে অত্যুক্তি হয় না। ঐ ব্রতাবলম্বন করিয়া ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শীত ঋতুর অবসানে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের পরমধামে উপনীতা হয়েন। ঐ ত্রয়োদশ বর্ষ তিনি যে কিভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন—কি অপূর্ব একনিষ্ঠা, অনন্ত অধ্যবসায় ও তন্ময় ধ্যানে রত থাকিয়া তিনি সর্বদা লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন সে কথা সাধারণে অবগত নহে। নিবেদিতাকে হারাইয়াই সে কথা জানিবার জন্য এখন সকলের প্রাণে একটা প্রবল বাসনা উপস্থিত হইয়াছে।

ঐ বিষয়টি জানিতে হইলে কিন্তু আমাদিগকে নিবেদিতার বাহ্য-জীবন-যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। লোকনয়নের সম্মুখে অনুষ্ঠিত তাঁহার বড় বড় কাজগুলি মাত্র দেখিয়া বিচার করিলেই চলিবে না। দেখিতে হইবে—দৈনন্দিন জীবনে তিনি কিভাবে তাঁহার দরিদ্র অশিক্ষিত পাড়া-প্রতিবাসীর সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিভাবে তিনি তাহাদিগের সকল প্রকার সুখ দুঃখের সমভাগিনী হইবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, সাজ্ঘাতিক ব্যাধিগ্রস্তকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কিভাবে নিজ অমূল্য

জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তাহার সেবায় রত থাকিতেন, দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাত হইতে অপরকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিজের অবস্থা সচ্ছল না হইলেও কিভাবে মুক্তহস্তে দান করিতে অগ্রসর হইতেন, দুর্ভিক্ষের তাড়না হইতে গ্রামবাসীদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কিভাবে তিনি অনশন অনিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক কঠোরতা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া দিনের পর দিন পদব্রজে বন্যার জল ভাঙ্গিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করতঃ তাহাদিগের প্রকৃত অবস্থার সংবাদ সাধারণের অবগতির জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং ভারতের প্রাচীন গৌরব ও অক্ষুণ্ণ জ্ঞানসম্পদের সহিত বর্তমান যুগের বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সত্যসমূহের সম্মিলনে দেশের রমণীকুলের মধ্যে যথার্থ শিক্ষার সম্প্রসারেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি একমাত্র সম্ভবপর -এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি কিভাবেই বা এক নূতন স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন ও অভিনব শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত করিয়া আমাদিগের কুলবধূগণের হৃদয় মনে বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকার স্থাপনে সমর্থা হইয়াছিলেন!—আর দেখিতে ও পরিমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, নিত্যানুষ্ঠিত ঐ প্রকারের শত চেষ্টার পশ্চাতে বিরাজিত, তাঁহার হৃদয়ের সেই ভালবাসা, আয় ব্যয়, হ্রাস বৃদ্ধি রহিত ভালবাসা —যে অসীম ভালবাসায় তিনি ভারতের প্রত্যেক নর-নারীকে কী কথা, প্রত্যেক উপলখণ্ডকেও পবিত্র ও আপনার হইতে আপনার বলিয়া চিরকাল হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন!

বাস্তবিক, মহতের মহত্ত্বের পরিচয় আমরা চিরকালই ঐভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনন্দিন কার্যসহায়ে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। নতুবা দৈবাধীন ঘটনাচক্রের প্রবল প্রবাহে পড়িয়া বাধ্য হইয়া ভীরু কাপুরুষকেও অনেক সময় সংসারে বড় কাজ করিয়া ফেলিতে দেখা যায়। ভগিনী নিবেদিতার জীবনের সকল প্রকার ক্ষুদ্র চেষ্টা ও অনুষ্ঠানের পশ্চাতেই আমরা ঐরূপ যথার্থ মহত্ত্বের নিত্য পরিচয় পাইয়াছি বলিয়াই সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকেই আজি তাঁহার জীবন্ত শক্তিমতি মূর্তিহৃদয়ে স্থাপিত করিয়া গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নিত্যপূজা করিতেছে।

'নিবেদিতা!'—রূপ নামটি তাঁহাতে কি অদ্ভুত সার্থকতাসম্পন্নই হইয়াছিল! যথার্থই ভগবৎপাদপদ্মে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন। অভিমানের বেড়া দিয়া পৃথক্ করিয়া 'আপনার' বলিতে এতটুকুও রাখেন নাই। ঐ নামটিতেই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য অন্য কিছুরই আর আবশ্যক হয় না।

বোসপাড়ার একটি ছোট বাড়ীতে নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা একত্রে থাকিতেন, ঐ বাড়ীতেই মেয়েদের পাঠশালাও বসিত। সাধারণ হিসাবে বিদ্যালয় বলিলে যাহা বুঝায় এই বিদ্যালয়টি সেরূপ ধরনের নহে, স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মচারিণীগণের জন্য মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, ঐ সঙ্কল্পকে ভিত্তি করিয়াই নিবেদিতা এই বিদ্যালয়ের স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের কার্যেই নিবেদিতা তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং এই বিদ্যালয়ের কার্যেই তাঁহার জীবনদানও করিয়া গিয়াছেন। বোসপাড়ায় একটি ছোট গলি, তাহার ভিতর একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয় এবং নিবেদিতার ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালিনী একান্ত নিষ্ঠাব্রতাবলম্বিনী রমণী, যাঁহার পক্ষে পৃথিবীতে কোন কার্যে সফল হওয়াই অসম্ভব ছিল না, —নিবেদিতা তাহার সমস্ত জীবন ঐ ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।...

পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাবের প্রারম্ভে ভারতে রমণীগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য যখন প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল তখন সমাজ তাহার বিরোধী হইয়াছিল। তখন অনেকেরই ধারণা ছিল যে, ভিন্নপ্রদেশীয় রমণী হইতে ভারতরমণীর যে মৌলিক বিশেষত্ব আছে

তাহা পাশ্চাত্যের অনুকরণশীল শিক্ষায় ধ্বংস হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবল বন্যায় আমাদের তৎকালীন যুব-সমাজ একেবারে ভাসিয়া যাইলেও উহাদের ঐ মোহকরী প্রভাব যে ভারতবর্ষের অন্তঃপুরে সেরূপভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই তাহা ঐ বিরোধের ফলেই বলিতে হইবে। পতি, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবাসী, পরিচিতের নিয়ত কল্যাণধ্যানে দেহবোধ পর্যন্ত বিরহিতা, নিয়ত শ্রমপরায়ণা আমাদের পূর্ব-পিতামহীগণের জীবনযাপনের বিশুদ্ধ স্মৃতি, বিশুষ্ক বকুলমালার সৌরভের ন্যায় ভারতবর্ষের অন্তঃপুরেই রক্ষিত ছিল, নবশিক্ষার প্রবল ঝটিকায় তাহা একেবারে উড়িয়া যায় নাই। ভগিনী নিবেদিতা সুদূর প্রতীচ্য দেশ হইতে সেই সৌরভে আকৃষ্টা হইয়াছিলেন।

রমণী, জাতীর জননী। একটি দীপ হইতে আর একটি দীপ জ্বালিবার মত মায়ের জীবনের দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণসমূহই সন্তানের জীবনে ঐ সকলের উদয় করিয়া থাকে। নিবেদিতা তাঁহার পুস্তকে এক স্থানে লিখিয়াছেন, 'রমণীই সর্বদেশে নীতি ও সদাচারের আদর্শের রক্ষাকর্ত্রী। শিশুকাল হইতে জননী কর্তৃক পরোপকারাদি সৎকার্যের প্রশংসা শ্রবণে চিত্তে ঐ বিষয়ক অনুরাগ স্ফুরিত না হইলে যুবক নিঃসহায়ের শবদেহ দাহঘাটে লইয়া যাইবার জন্য কখনই ব্যগ্র হইবে না। স্ত্রী, স্বামীর সুখের জন্য প্রাণপণ না করিলে এবং তাঁহার চরিত্রগত গুণগুলি স্মরণ করিয়া সুখী না হইলে কয়জন পুরুষ সাধু ও সদ্ভাবে আপন জীবন পরিচালিত করিতে যত্নপরায়ণ হইবে? এতদ্ব্যতীত সর্বদেশেই দেখিতে পাওয়া যায় রমণীগণ প্রত্যেক উচ্চাদর্শ কার্যে পরিণত করিবার জন্য তাহাদিগের জীবন সর্বাগ্রে প্রদান করিয়া থাকে।'

রমণী আবার সংসারের স্থিতিবিধায়িনী। শোণিতধারায় প্রবাহিত কুলক্রমাগত যে সকল মহৎভাব আজি পর্যন্ত ভারত-রমণীর প্রকৃতির মধ্যে রক্ষিত রহিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ সেই সকল ভাবকেই শিক্ষা

ও সংস্কারের দ্বারা নবভাবে সমুজ্জল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামীজির সেই ইচ্ছাকে অনুবর্তন করিয়াই ভগিনী নিবেদিতা এই শিক্ষালয়ের কার্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অতএব যদিও উহার আয়তন বৃহৎ ছিল না তথাপি নিবেদিতা বুঝিয়াছিলেন, করাল জ্বালাময়ী অগ্ন্যুৎপাদনের প্রয়োজন হইলে রাশি রাশি ইন্ধন সংগ্রহে জীবনযাপনই একমাত্র আবশ্যকীয় নহে। সামান্য ইন্ধনে অগ্ন্যুৎপাদন করিয়া ধীরে ধীরে উহার পোষণ করিতে পারিলে কালে উহা আপনা হইতেই চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, এই বিদ্যালয় হইতেই ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী, গার্গীর পুনরভ্যুদয় হইবে।

এই শিক্ষালয়ে ছোট ছোট বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তা, বধূ, গৃহিণী ও বিধবাগণের সকলকেই যিনি যেরূপভাবে শিক্ষালাভ করিতে চাহেন তাঁহাকে সেইরূপভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। ভাষা, অঙ্ক, শিল্পকার্য, সেলাই এবং চিত্রবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট মেয়েদের উচ্চশ্রেণীর মেয়েরাই শিক্ষা দিত। উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে তিন চারিটি এরূপ বালবিধবাও ছিল, যাহারা এই বিদ্যালয়ের কার্যেই জীবন সমর্পণ করিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল। চিরকুমারী-ব্রতাবলম্বিনী শ্রীমতী সুধীরা উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী এবং সমস্ত বিদ্যালয়েরই একপ্রকার পরিচালিকা ছিলেন। তিনি কোনরূপ বেতন বা পারিতোষিক না লইয়া স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় উন্নতমনা ও ধর্মপরায়ণা রমণী অতি দুর্লভ। সন্তানের কল্যাণে মাতার যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা থাকে বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের কল্যাণের জন্য তাঁহার চেষ্টাও সেইরূপ ঐকান্তিক ছিল, এজন্য ছাত্রীরাও তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত ও সকল প্রকারে তাঁহার আদেশ পালনের চেষ্টা করিত। শিক্ষালয় পরিচালনে শ্রীমতী সুধীরাদেবীই নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপা ছিলেন।

শিক্ষালয়-বাড়ীটি তেমন স্বাস্থ্যকর ছিল না। উপরের ঘরগুলি ছোট ছোট, ছাতও নীচু, গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে সেই ঘরগুলি এত গরম হইত যে, কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকিলেই মাথা ধরিয়া যাইত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীর পক্ষে এইরূপ গরম সহ্য করা অনেকটা অভ্যস্ত, কিন্তু শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে গ্রীষ্মকালে এদেশে সেরূপ গৃহে বাস করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

নিবেদিতা বা ক্রিশ্চিয়ানার ঘরে গ্রীষ্মনিবারণের জন্য একখানি টানা পাখাও ছিল না। একখানি হাতপাখাই সর্বদা নিবেদিতার কাছে থাকিত। তাঁহার ছোট ঘরটি তিনি নিজের ইচ্ছামত সাজাইয়াছিলেন। সেই ঘরের ভিতর দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। বেশীর ভাগই লেখাপড়ার কাজ। কার্যকালে তাঁহার মন এত একাগ্র হইত যে সে সময়ে তাঁহার শীত-গ্রীষ্ম বোধ থাকিত না। আমরা দেখিয়াছি কাজ ছাড়িয়া যখন তিনি কখন কখন বাহিরে আসতেন তখন অসহ্য গরমে তাঁহার মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে তিনি এক একবার এঘর ওঘর ঘুরিয়া ছাত্রীরা কে কোথায় কি করিতেছে তাহা দেখিয়া আসিতেন। ঐ সময়ে একদিন কপালে হাত দিয়া মাঝে মাঝে চাপিয়া ধরিতেছেন দেখিয়া শিক্ষয়িত্রীদিগের কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'মাথার বড় কষ্ট!' তখনই আবার গিয়া কিন্তু কাগজ কলম লইয়া বসিলেন।

ঐ লেখাপড়া-কাজও তাঁহার বিদ্যালয়েরই জন্য। বিদ্যালয়ের অর্থানুকুল্যের জন্যই তাঁহার পুস্তক লিখিবার অধিক প্রয়োজন হইত। ঐরূপ পরিশ্রম করিয়াও মাঝে মাঝে যখন খরচের টানাটানি পড়িত, তখন নিজের সম্বন্ধে কোন্ খরচটা কমাইতে পারা যায় সেই দিকেই অগ্রে তাঁহার দৃষ্টি পড়িত এবং নিজের শরীর পোষণে যে যৎসামান্য ব্যয়, তাহাও যেন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিত। ফলে, শারীরিক

অনিয়মে তাঁহার শরীর দিন দিন রক্তহীন ও দুর্বল হইয়া পড়িত, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য স্থানপরিবর্তনে যাইতে হইত। মনের একাগ্রতার জন্য শরীর সম্বন্ধে তাঁহার লক্ষ্যই ছিল না, সে জন্য শরীর যে দিন দিন ভগ্ন হইতেছে তাহা যেন তিনি বুঝিতেই পারিতেন না।

বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্যার্থী হইয়া যদিও তিনি দ্বারে দ্বারে দণ্ডায়মান হন নাই, তথাপি বিদ্যালয়ের আর্থিক অনাটনের বিষয় আমাদের দেশবাসীগণের যে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল তাহা নহে। এই বিদ্যালয়ের একটি শাখা-বিদ্যালয় ছিল, সেটিতে কেবল ছোট মেয়েদেরই শিক্ষা দেওয়া হইত। আর্থিক অভাবের জন্য নিবেদিতা যখন কোনরূপে সেই পাঠশালাটিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন মাসিক ত্রিশটি টাকা যদি সাহায্য পান সে জন্য কয়েকবার 'বেঙ্গলী' কাগজে আবেদন প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও যখন কোন ফল হইল না তখন অগত্যা পাঠশালাটি তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'ভগিনী নিবেদিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: 'তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে'—ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা।…

বড় মেয়েদের শিক্ষা দিবার ভার প্রধানতঃ ভগ্নী ক্রিশ্চিয়ানা ও শ্রীমতী সুধীরার উপর ছিল, কিন্তু নিবেদিতা যখনই অবসর পাইতেন তখনই ঐ ছাত্রীদের শিক্ষার ভার লইতেন। গণিত ও চিত্রবিদ্যা এই দুইটিই তিনি বেশীর ভাগ শিক্ষা দিতেন। অবসরমত ইংরাজী ভাষাও শিখাইতেন। তাঁহার শিখাইবার প্রণালী অত্যন্ত সুন্দর ও নূতন ধরনের ছিল। তিনি গণিত ও চিত্রবিদ্যা যে প্রণালীতে শিখাইতেন, তাহাতে যাহাদের শিখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা কম, তাহারাও অতি সহজে উহা আয়ত্ত করিয়া লইত। ছোট ছোট মেয়েরা তেঁতুলের অথবা অন্য কোন ফলের বীজ লইয়া খেলা করিতে করিতে প্রথমে

গণনা শিখিত। 'জোড় কি বিজোড়' খেলাতেই প্রথমে ছোট ছোট মেয়েদের যোগ-বিয়োগ অভ্যাস হইত, তাহার পর তাহারা শ্লেটে অঙ্ক রাখিয়া অঙ্ক কসিতে শিখিত। শিক্ষালয়ের বড় মেয়েরা ছোট মেয়েদের শিক্ষা দিত। নিবেদিতা তাহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী-সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে উপদেশ দিতেন তাহার কিছু এখানে তাঁহার নিজের কথাতেই দিলাম ;—'মেয়েরা যদি কিছু না জানে তবে তাহাদের বলিবে 'আচ্ছা আমরা চেষ্টা করিব, তাহা হইলে নিশ্চয় শিখিতে পারিব'। মেয়েরা যদি কিছু বলিতে পারে আর কিছু ভুল করে, তবে তাহাদের বলিবে 'হ্যাঁ, হইল, কিন্তু আমরা আরও ভাল করিতে চেষ্টা করিব'। যদি কোন মেয়ে ঠিক করিয়া বলিতে পারে তবে তাহাকে বলিবে 'ঠিক, ঠিক'। এবং অন্য মেয়েদের বলিবে 'আমরাও পারিব, আবার আমরা চেষ্টা করিব'।' কথা বলিবার সময় তিনি কতকগুলি কথা বিশেষভাবে জোর দিয়া বলিতেন। 'নিশ্চয়' কথাটির উপর ঐরূপ জোর দিতেন। আবার যখন কাহারও কোন বিষয় ঠিক হইত তখন 'ঠিক, ঠিক।' বলিয়া বালিকার মত আনন্দে হাততালি দিতেন। মেয়েদের লেখায় অথবা অঙ্কে যদি ভুল থাকিত তবে তখনই তাহা ভাল করিয়া কাটিয়া দিতেন এবং সর্বদা বলিতেন 'ভুল কখনও রাখিবে না। ভুল বুঝিবামাত্র কাটিয়া দিবে।'

ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য ও চিত্র প্রভৃতি কলাবিদ্যার উপর তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ভারতীয় কলাবিদ্যাসকলের মূলে আধ্যাত্মিকতার বীজ যে নিহিত আছে ইহা তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন। বৈদেশিক অনুকরণে অঙ্কিত আজকালকার চিত্র অপেক্ষা মেয়েদের হাতের আঁকা পিঁড়ি-আল্‌পনা ইত্যাদি তাঁহার নিকট অধিক আদরের পদার্থ ছিল। একটি মেয়ের হাতের আঁকা আল্‌পনা তিনি তাঁহার শয়নগৃহে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন; ঐ আল্‌পনার মধ্যে একটি বড় শতদল পদ্ম ও চারিপাশে ছোট ছোট যুঁইফুলের মত ফুল লেখা ছিল। ঐ আল্‌পনা তাঁহার এত ভাল

লাগিয়াছিল যে, চিত্রকলাবিচারসক্ষম যে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহাকেই তিনি ঐ আল্পনা দেখাইতেন। একদিন মহানন্দে ছাত্রীদিগের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'কুমারস্বামী আজ এই আল্পনার অনেক প্রশংসা করিলেন।' কুমারস্বামী যে তাঁহার ছাত্রীর অঙ্কিত আল্পনার প্রশংসা করিয়াছেন এ আনন্দ তাঁহার আর রাখিবার যেন স্থান নাই, তাঁহার মুখ দেখিয়া তখন এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। পদ্মফুলের চিত্র, বিশেষতঃ সহস্রদল শ্বেতপদ্মের চিত্র তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন, এই ফুল ভারতবর্ষীয় চিত্রকর ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কেহ আর আঁকিতে জানে না। পূর্বোক্ত আল্পনার পদ্মের চারিপাশের ছোট ছোট ফুলগুলি দেখাইয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'কি সুন্দর সাদা ছোট ফুল! এই ছোট ফুলগুলি সকলেই ঐ বড় ফুলের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে, যেন বলিতেছে, আমরা তোমার কাছেই যাইতে চাই।' মেয়েদের পাথরে ও মাটিতে ছাঁচকাটা শিখাইবার নিবেদিতা অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ছাঁচ কাটিবার জন্য একরাশি মাটি ও নরুণ আনিয়া, সকল মেয়েদের সঙ্গে লইয়া 'আমরা সকলেই শিখিব' বলিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ছাঁচ কাটিতে বসিতেন। তাঁহার ঐরূপ উৎসাহে তখন অনেক মেয়ে ছাঁচ কাটিতে অভ্যাস করিতেছিল। তাহাদের কেহ প্রথম যে ছাঁচটি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দিত, সেটি যতই খারাপ হউক না কেন, তিনি অতি আদরের সহিত তাহা লইতেন এবং দেবতার প্রসাদ যেমন লোকে মাথায় ধারণ করে সেইরূপভাবে মাথায় ছুঁয়াইয়া নিজের ঘরে সাজাইয়া রাখিতেন। ছোট মেয়েরা তাঁহাকে ছোট ছোট পুতুল গড়িয়া আনিয়া দিত; সে পুতুলগুলি তিনি একটি বাক্সে করিয়া রাখিতেন! এইরূপে তাঁহার ঘরে মেয়েদের হাতে প্রস্তুত ঐরূপ দ্রব্য সকল স্তরে স্তরে সাজান থাকিত। এক এক দিন সব মেয়েদের একত্র করিয়া ঐ সকল দ্রব্য দেখাইয়া তাহাদের হাতের শিল্প কেমন ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে তাহা তিনি

দেখাইতেন ও বুঝাইয়া দিতেন। এক সময়ে মেয়েদের সপ্তাহের মধ্যে একদিন করিয়া সংস্কৃত শিখানো হইবে এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল। নিবেদিতা তাহাতে বলেন, 'যেদিন মেয়েদের হাতে তালপাতে লেখা সংস্কৃত শ্লোক আমার ঘরের দেয়ালে শোভা পাইবে সেদিন কি আনন্দের দিনই হইবে।'

সপ্তাহের মধ্যে একদিন অথবা দুইদিন তিনি ইতিহাস পাঠ দিতেন। সে সময় তিনি এতই তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইত তিনি কোথায় আছেন ও কাহাদের নিকট বলিতেছেন তাহাও তখন যেন তাঁহার মনে নাই। একদিন রাজপুতানার ইতিহাস বলিতে বলিতে তিনি স্বয়ং যখন চিতোর গিয়াছিলেন তাঁহার সেই সময়ের ভ্রমণকাহিনী এইরূপে বলিতে লাগিলেন—'আমি পাহাড়ে উঠিয়া পাথরের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পদ্মিনী দেবীর কথা স্মরণ করিলাম'—বলিতে বলিতে নিবেদিতা যথার্থই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাতজোড় করিয়া বসিলেন। নিবেদিতার তখনকার মুখের ভাব যিনি দেখিয়াছেন তিনি কখন আর তাহা ভুলিতে পারিবেন না। নিবেদিতা বলিতে লাগিলেন, 'অনল কুণ্ডের সম্মুখে পদ্মিনী দেবী হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি চোখ বুজিয়া পদ্মিনীর শেষ চিন্তা মনে আনিতে চেষ্টা করিলাম। আঃ কি সুন্দর। কি সুন্দর।'—বলিতে বলিতে ভাবাবেশে মুগ্ধা নিবেদিতা কিছুক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন।—তিনি যে স্কুল-ঘরে বালিকাদের সম্মুখে বসিয়া তাহাদের ইতিহাস পাঠ দিতেছেন তাহা আর তখন তাঁহার মনে নাই, পদ্মিনীর শেষ চিন্তায় তন্মুহূর্তে তাঁহার মন লয় হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার ঐরূপ তন্ময়ভাব আমরা কতবার দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের কথা উঠিলেই তিনি একেবারে ভাবমগ্না হইয়া যাইতেন। মেয়েদের বলিতেন, 'ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ!! ভারতবর্ষ!! মা। মা। মা। ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করিবে, ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষ ! মা ! মা ! মা !' বলিয়া নিজের জপ-মালা হাতে লইয়া নিজেই জপ করিতে লাগিলেন 'মা ! মা ! মা !' ভারতবর্ষ যে তাঁহার প্রাণের প্রাণস্বরূপ কত প্রিয় ছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কে জানে কে তাঁহার চোখে এমন সোনার কাজল পরাইয়া দিয়াছিল যে তাঁহার নিকট ভারতের সকল পদার্থই স্বর্ণময় হইয়া গিয়াছিল। কে জানে তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া মৃণ্ময়ী ভারতের ভিতর কি চিণ্ময়ী প্রতিমার অধিষ্ঠান দেখাইয়াছিলেন যাহাতে ভারতের ধূলিকনার ভিতরও তিনি আধ্যাত্মিকতারূপ অমৃতরসের সর্বদা আস্বাদ পাইতেন।—এবং সেই অমৃতপানে বিভোর হইয়া তিনি যাহা বলিতেন তাহা শুনিয়া কতলোক তাঁহাকে পাগল বলিত। কিন্তু ধন, মান, যশ লইয়াই যাহারা দিবারাত্র পাগল হইয়া রহিয়াছে তাহারা এমন পাগলের কথা বুঝিবে কিরূপে ?

বাঙলাভাষা ভাল করিয়া শিখিবেন ইহা তাঁহার বহুদিনের বাসনা ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া শিখিতে পারেন নাই বলিয়া উহা ভাল করিয়া আয়ত্ব করিতে তিনি কখন পারেন নাই। তথাপি এক একটি ছোট ছোট কথা যাহার নিকট শিখিবার সুবিধা পাইতেন তখনই শিখিয়া লইতেন। ঐরূপ সময়ে একটি ছোট মেয়েও তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর পদ প্রাপ্ত হইত, তাহার নিকটেও তাঁহার বিনীতা ছাত্রীর ন্যায় আচরণ দেখা যাইত। আবার একটি নূতন কথা শিখিতে পারিলে তিনি ক্ষুদ্র বালিকার মত আনন্দে অস্থির হইতেন। একদিন কোন মেয়ে শ্লেটে দাগ টানিতে টানিতে বলিয়াছিল 'লাইন টানিতেছি।' 'লাইন' এই শব্দটি শুনিবামাত্র নিবেদিতা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, 'আপনার ভাষায় বল।' কিন্তু 'লাইন'এর বাঙলা প্রতিশব্দটি যে কি তাহা ছোট মেয়েদের কেহই তখন ভাবিয়া পাইল না। সকলেই বলিতে লাগিল, 'সিস্টার, আমরা তো বরাবরই লাইন বলি।' ঐকথা শুনিয়া দুঃখে বিরক্তিতে নিবেদিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, নিবেদিতা

বলিলেন 'তোমারা আপনার ভাষাও ভুলিয়া গেলে?' ঐ সময়ে একটি ছোট মেয়ে বলিয়া উঠিল, 'লাইনের বাংলা রেখা।' তখন আর নিবেদিতার আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি যেন একটি হারানো জিনিস কুড়াইয়া পাইলেন এবং বার বার 'রেখা, রেখা, রেখা', উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

নিবেদিতা যখন ছবি আঁকিতে শিখাইতেন তখন সকল মেয়েকে সারি দিয়া বসাইতেন, ছোট বড় কাহাকেও বাদ দিতেন না। শিক্ষয়িত্রীরাও সে সময় ছাত্রীদের শ্রেণীভুক্তা হইতেন। সিস্টার ক্রিশ্চিয়ানাও ঐ সময়ে সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য কখন কখন ছাত্রীদলভুক্তা হইয়া বসিতেন। ক্রিশ্চিয়ানা ছোট মেয়েদের কাছে ঘেঁসিয়া বসিতেন এবং কখন কখন রঙ্গ করিয়া এমন ভাব দেখাইতেন যেন তাঁহার বড় ভয় হইতেছে, তাঁহার অঙ্কিত ছবি ভাল হইবে না! মেয়েরা তাহা দেখিয়া খুব হাসিত।

ছবি আঁকিবার কালে মেয়েরা প্রত্যেকে রং তুলি পেন্সিল ও একখানা করিয়া কাগজ পাইত, নিবেদিতার নিজের হাতেও তুলি আর কাগজ থাকিত, সকলে ঐরূপভাবে বসিলে প্রথমে তিনি প্রায়ই পেন্সিল দিয়া একটি বৃত্ত আঁকিতেন, এবং ঐ কাগজখানি হাতে লইয়া কি রকমভাবে হস্ত চালনা করিয়া বৃত্ত আঁকিতে হইবে প্রত্যেক মেয়ের কাছে দাঁড়াইয়া তাহা এক একবার দেখাইয়া দিতেন।

মেয়েরা প্রথমে পেন্সিলের উল্টা দিক দিয়া, কাগজে যাহাতে দাগ না পড়ে অথচ নিবেদিতা যেভাবে দেখাইলেন সেইভাবে যতদূর পারে হস্তচালনা করিয়া কাগজের উপর বারম্বার পেন্সিল ঘুরাইতে শিখিত, তাহার পর দ্রুত-হস্তে বৃত্ত অঙ্কিত করিত। এইরূপে বৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নানারূপ চিত্র তাহাদিগকে আঁকিতে শিখান হইত।

বিদ্যালয়টি যেন মেয়েদের একটি আনন্দ-নিকেতন ছিল। বিদ্যালয়ে যে সকল বড় মেয়েরা আসিত তাহাদের কেহই অবস্থাপন্ন

গৃহস্থের বধূ বা কন্যা ছিল না, এজন্য সংসারের কাজ শেষ করিয়া তাহাদের বিদ্যালয়ে আসিতে হইত। স্কুলে আসিবার উৎসাহে মেয়েরা সকাল হইতে প্রাণপণে সংসারের ঐ সকল কাজ শেষ করিত। মাঝে মাঝে ছাত্রীদের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী অথবা কলিকাতার অন্য কোন স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত, সে সময় সিষ্টারেরা ছাত্রীদিগকে যথাসম্ভব আতিথ্যদানও করিতেন। গ্রীষ্মাবকাশ প্রভৃতি দিবার সময়ে বিদায়গ্রহণকালে মেয়েদের খাবার খাওয়াইতেন। ছাত্রীর সংখ্যা বড় কম ছিল না, তাহার উপর নিজেও দরিদ্র, কাজেই অপর্যাপ্ত সামগ্রী যোগাড় করিতে কেমন করিয়া পারিবেন? সেজন্য পূর্ব হইতে ছাত্রীর সংখ্যা গণনা করিয়া ফলমিষ্টান্নাদি আনাইয়া প্রত্যেকের জন্য ছোট ছোট একটি করিয়া সুন্দর শালপাতার ঠোঙা গড়িয়া তাহার ভিতর ঐ খাবার সাজাইতেন। পরে ঐ ঠোঙাগুলি একটি ঝোড়ায় তুলিয়া ঝুড়ি হাতে একে একে সকলকে পরিবেশন করিতেন। আবার খাওয়া শেষ হইলে মেয়েরা ঠোঙ্গা ফেলিবে বলিয়া নিজেই ঝুড়ি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন!—এইরূপে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র অতিথিগণের সেবা সমাধা করিতেন।

পুরী ভুবনেশ্বরাদি তীর্থে মেয়েদের বেড়াইতে লইয়া যাইতে তাঁহার মাঝে মাঝে অত্যন্ত ইচ্ছা হইত; অনেক বার যাইবার প্রস্তাবও করিয়াছিলেন কিন্তু অর্থাভাববশতঃ উহা ঘটিয়া উঠে নাই। নিবেদিতা দেশ-ভ্রমণের এবং তীর্থ-ভ্রমণের অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজে ভারতবর্ষের সকল তীর্থই প্রায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে ঐ সকল স্থানের ভ্রমণ কাহিনী মেয়েদের নিকট গল্প করিতেন। তিনি সুদূর বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলেন, মেয়েদের নিকট যখন তাঁহার বদরিকাযাত্রার কাহিনী বর্ণনা করিতেন তখন মনে হইত যেন এইমাত্র তিনি ঐস্থান দেখিয়া ফিরিয়াছেন ও বলিতেছেন। ঐ সময় পথে অলকানন্দা নদীতীরে তিনি এক বৃদ্ধাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কথা মেয়েদের কাছে

এইভাবে বলিতেন—'তিনি (সেই বৃদ্ধা) স্নান করিয়া উঠিয়াছেন, তখনও ভিজা কাপড় পরিয়া আছেন। তিনি বৃদ্ধা হইয়াছেন, তাঁহার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি শীতকে গ্রাহ্য করেন না। অলকানন্দা নদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে (বলিতে বলিতে নিবেদিতা হাতযোড় করিলেন) সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি প্রণাম করিতেছেন। কি সুন্দর! কি সুন্দর তাঁহার মুখ! আমি আশ্চর্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।' বদরিকার পথে আর এক স্থানে একজন প্রাচীনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে নিবেদিতা এইবার বলিতে লাগিলেন—'তুষার গলিয়া গিয়াছে, পিছলে তাঁহার পা সরিয়া যাইতেছে। আমার ভয় হইল, তিনি পড়িয়া যাইবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিবেন? আমি তাঁহার বাহু ধরিতে পারি কি?—আমি তাঁহার নিকট ঐরূপে অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন—আঃ কি সুন্দর সে হাসি!—এবং আপনার যষ্টির উপর ভর দিয়া চলিয়া গেলেন।' 'তিনি কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিবেন?'—এই কথাগুলি নিবেদিতা এমন করিয়া বলিতেন যে বেদনাব মত আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিত!

নিবেদিতা যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যাইতেন তখন কত দীন হীন ভাবেই প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কারণ তিনি জানিতেন, মন্দিরে উঠিয়া দেবীদর্শন করিবার অধিকার তাঁহার নাই। কিন্তু হায়, মন্দিরে যাঁহারা দেবীর পূজা করিতেন তাঁহাদের মধ্যেও নিবেদিতার মত অধিকারী কয়জন ছিল, বলিতে পারি না। যাঁহার চরণধূলি স্পর্শে লোক পবিত্র হয়, দেখিয়াছি, আমাদের কাহারও কাহারও বাটীতে যাইয়াও তিনি ঐরূপে তাঁহার স্পর্শে পাছে কোন জিনিস দূষিত হয় ভাবিয়া সর্বদা সঙ্কুচিতা হইতেন। যে সর্বত্যাগিনী, গৃহ, সমাজ, সামাজিক সম্মান আত্মীয় স্বজনের দুশ্ছেদ্য স্নেহপাশ সকলই পরিহার করিয়া ভারতের কল্যাণে নিঃশেষে আপনাকে সমর্পণ

করিয়াছিলেন, হে ভারতবাসী, তুমি কি তাঁহাকে আপনার গৃহে, পরিবারে, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলে? তাহা যদি করিতে তবে এত শীঘ্র হয়ত আমরা তাঁহাকে হারাইতাম না।

বদরিকার তুষার-পিচ্ছিল-পথে প্রাচীনা রমণী যে নিবেদিতার সাহায্য করিবার জন্য সাগ্রহ প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া আপনার যষ্টির উপর ভর দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, নিবেদিতা তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধা বা দুঃখিতা না হইয়া বরং আনন্দিতাই হইয়াছিলেন। নিবেদিতা ঐ সম্বন্ধে যে ভাবে 'কি সুন্দর সে হাসি!' কথাগুলি বলিতেন—তাহাতেই উহা স্পষ্ট বুঝা যাইত। বুঝা যাইত, ক্ষুদ্র বালিকা তাহার জননীকে সাহায্য করিতে চাহিলে মা যেমন মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসেন কিন্তু সে হাসিতে উপেক্ষা প্রকাশ না পাইয়া বরং অক্ষম চেষ্টার প্রতি স্নেহ ও আত্মনির্ভরের ভাবই প্রকাশ পায়, প্রাচীনার ঐ হাসিতে নিবেদিতা সেই ভাবই দেখিতে পাইয়াছিলেন।

আত্মনির্ভরের ভাবটি নিবেদিতার বড় শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল। নিবেদিতা উহাকে ভারতবর্ষের বংশগত ভাব বা ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। 'তিনি ভারতবাসী'—নিবেদিতা এই কথাগুলি অতি সম্ভ্রমের সহিত উচ্চারণ করিতেন। শুনিয়াছি নিবেদিতার কাছে যে গোয়ালা দুধ দিত, সে একদিন তাঁহার নিকট ধর্মসম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাহিয়াছিল। নিবেদিতা তাহার কথা শুনিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইলেন, এবং আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া বার বার তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'তুমি ভারতবাসী, তুমি আমার নিকট কি উপদেশ চাও? তোমরা কি না জান? তুমি শ্রীকৃষ্ণের জাতি, তোমাকে আমি নমস্কার করি।'

মেয়েদের কখন কখন তিনি যাদুঘর দেখাইতে লইয়া যাইতেন। মিউজিয়ামের যে সকল গৃহে ভারতের প্রাচীনকালের স্থাপত্যের নিদর্শন সমূহ রক্ষিত আছে সেই সকল গৃহ ভাল করিয়া দেখাইতেন।

বৌদ্ধযুগের ভাস্করনির্মিত প্রস্তরময় মূর্তি ও স্তম্ভ প্রভৃতি যে গৃহে আছে একদিন সেই গৃহে মেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নিবেদিতা একখানি শিলালিপির নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া মেয়েদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'এই প্রস্তরের নাম 'কাম্য প্রস্তর', মহারাজ অশোক এই প্রস্তরের নিকট বসিয়া কামনা করিয়াছিলেন, এসো আমরাও সকলে এখানে বসিয়া কামনা করি।' বলিয়া সেই প্রস্তরমূলে মেয়েদের সকলকে লইয়া উপবেশন করিলেন এবং 'তোমরা সকলেই মনে মনে কামনা কর' বলিয়া নিজে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। পরে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা কি কামনা করিয়াছিলে?' মেয়েরা তাহাতে উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন 'ঠিক, কাম্য-মন্ত্র মনেই রাখিতে হয়, বলিতে নাই।'

ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কখনও কাহারো সহিত আলোচনা অথবা তর্ক বিতর্ক করিতেন না, কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনই একখানি জীবন্ত ধর্মশাস্ত্র বলা যাইতে পারে। তাঁহার হৃদয়ে যে প্রবল আধ্যাত্মিকতার পিপাসা ছিল সে পিপাসা কলসীর জলে পূর্ণ হইবার নহে। তিনি যে দেশে ও সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেখানে রমণীর স্বাধীনতা অব্যাহত, সমাজে তাঁহাদের উচ্চসম্মান, জীবনে সকল বিষয়েই ইচ্ছামত পথ নির্ণয় করিয়া লইবার অধিকার তাঁহাদের আছে, নিবেদিতাও নিজের জীবনলক্ষ্য নিজেই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা ছিল তাহাতে পাশ্চাত্য সমাজ তাঁহাকে যে রমণীকুলের বরেণ্যা ও শীর্ষস্থানীয়া বলিয়া গ্রহণ করিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি নিবেদিতা জীবনের সেই পুষ্পাস্তীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া এমন এক দুর্গম পথে চলিয়াছিলেন যে লোকে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।...

নিবেদিতা কোন কোন দিন মেয়েদের নিকট তাঁহার গুরুদেবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেন। কিন্তু তাঁহার নাম মাত্র উল্লেখে নিবেদিতার

অন্তর ভাবরসে এতই পরিপূর্ণ হইত যে অধিক কথা বলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। তাঁহার গুরুদেবের সম্বন্ধে এই কথাটি কিন্তু আমরা তাঁহাকে বারবার বলিতে শুনিয়াছি—'তাঁহার নাম বীরেশ্বর, তিনি বীরদিগের ঈশ্বর ছিলেন। পৃথিবীর বীরগণ তাঁহার পদানুসরণ করিয়া চলিবে। তোমরা সকলে ছোট ছোট সুখ-দুঃখ ছাড়িয়া বীর হও।' 'বীর' কথাটি তিনি সব সময়ই পূর্বোক্ত প্রকারে জোর দিয়া বলিতেন।

মেয়েদের পড়িবার ঘরে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি চিত্র ছিল। অপর দিকের দেওয়ালে একখানি পৃথিবীর মানচিত্র টাঙ্গানো থাকিত। নিবেদিতা একদিন ঐ মানচিত্রখানি আনিয়া পরমহংসদেবের ছবির নীচে টাঙ্গাইয়া দিয়া মেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন 'রামকৃষ্ণদেব জগৎগুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাঁহার পদতলে থাকাই উচিত।' কথাটি নিবেদিতার প্রাণের কথা। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা ঐরূপে জগৎসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে কখন কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন 'মুক্ত হবে কবে, আমি যাবে যবে; আমি মলে ঘুচয়ে জঞ্জাল'—অর্থাৎ আপনাকে ঈশ্বরে একেবারে লয় করিয়া না দিলে আধ্যাত্মিক জগতে কেহ কখন জন্মলাভ করিতে পারে না। হিন্দুর বেদ ঐ জন্যই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে—'দ্বিজ' নাম দিয়াছেন। 'দ্বিজ' অর্থাৎ যাঁহারা দুই বার জন্মিয়াছেন। নিবেদিতা নিশ্চয়ই ঐভাবে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, তিনি অপার মহোদধিতে আপনার বিন্দুত্ব একেবারে লয় করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা না হইলে নিবেদিতা যে ভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমন অপার্থিব আত্মত্যাগ তাঁহাতে কখনও সম্ভবপর হইতে পারিত না। আত্মত্যাগের কাহিনী আমরা লোকমুখে শুনিয়াছি, পুস্তকেও পড়িয়াছি, কিন্তু নিবেদিতার আত্মত্যাগ, যাহা চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছি, তাহা আর কোন স্থানে দেখিয়াছি অথবা দেখিব বলিয়া মনে হয় না।

নিজের নাম নিবেদিতা যখনই স্বাক্ষর করিতেন তখনই 'Nivedita of Ramkrishna-Vivekananda' বলিয়া স্বাক্ষর করিতেন। যদিও বঙ্গানুবাদে উহার 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মণ্ডলীভুক্তা নিবেদিতা'—এই অর্থ হয়, তথাপি ঐ কথাগুলি ঐ একই প্রকার অর্থে তিনি প্রয়োগ করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপ যুক্তনামের দ্বারা হয়ত তাঁহার মন গুরু ও ঈশ্বর অভেদ এই কথাই স্মরণ করিত।...

তিনি এমন ভাবময়ী ছিলেন যে অনেক সময় তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত সদ্ভাবসমষ্টিই যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐরূপে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি কখন লোক-শিক্ষয়িত্রী, কখন স্নেহবিগলিত জননী, কখন কর্তব্যৈকনিষ্ঠ মায়ামমতাবর্জিত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ কর্মী, কখন বিনীতা-ছাত্রী অথবা সেবিকা আবার কখনও ভগবৎভাবে বিভোরা রূপে প্রতীয়মানা হইতেন। বোসপাড়ার বাটিতে এইরূপে দুইটি ইয়ুরোপীয় মহিলা বৎসরের পর বৎসর বাস করিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা।...

বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ে শ্রীশ্রীমাতাদেবী [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী] কখন কখন আসিয়া বাস করেন। ভগ্নী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা দিনের মধ্যে একবারও অন্ততঃ তথায় গিয়া তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। নিতান্ত বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকে আনন্দে চাহিয়া থাকে, নিবেদিতাও ঐ সময়ে সেইরূপ ভাবে মাতাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিতার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, মাতাদেবীর নিকটে কিন্তু তাঁহার এইরূপ শিশুর মত ভাব ছিল। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহহাস্যে চাহিতেন তখন মায়ের আদরে বালিকার মত তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে আসনে বসিবেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, সেদিন তাঁহার যে আনন্দ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে, সে

আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ঐ সময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারম্বার প্রণাম করিতেন, এবং অতি যত্নে ধূলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত মাতাদেবীর ঐটুকু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তিনি তাঁহার জীবন সার্থকজ্ঞান করিতেছেন।

মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয় দেখিতে আসিবেন স্থির হইয়াছিল, ঐ কথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্যের ও আনন্দের যেন আর বিরাম নাই! বিদ্যালয়ের সমস্ত ঘরগুলি ঝাড়াইয়া ঝুড়াইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, পত্র পুষ্প আনাইয়া ঘরদ্বারে টাঙ্গাইয়া শোভাবর্ধন করিলেন, মাতাদেবী কোথায় বসিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাঁহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাহার পর মা যেদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন নিবেদিতা সেদিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন! সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কিনা দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, হাসিতেছেন, আবার কখনও বা আনন্দে অধীরা হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের এবং কখন বা দাসীর পর্যন্ত গলা জড়াইয়া আদর করিতেছেন!

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নয়জন নির্বাসিত ব্যক্তি যেদিন মুক্তিলাভ করিলেন সে দিনও নিবেদিতার এইরূপ আনন্দ দেখিয়াছিলাম। সে দিনও বিদ্যালয়ের দ্বারে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত ও কদলীবৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। সে দিনও আনন্দের দিন বলিয়া মেয়েদের অনধ্যায় হইয়াছিল।

অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নিবেদিতা দৃপ্তাসিংহীর মত উত্তেজিতা হইয়া উঠিতেন। সে সময় তিনি জগতে কাহাকেও দৃক্‌পাত করিতেন না। তাঁহার রোষাগ্নিদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে অতি গর্বিতকেও মস্তক অবনত করিতে হইত। অপর দিকে তাঁহার নম্রতাও আবার অনন্যদুর্লভ ছিল, সে নম্রতা মৌখিক বিনয় নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ আন্তরিক সৌজন্যতাপ্রসূত

ছিল। তিনি অতি দরিদ্রের সহিতও যেরূপ সসম্ভ্রমে ব্যবহার করিতেন সেরূপ ব্যবহার কেবল তাঁহাতেই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে একটি সদাজাগ্রত ভাব ছিল, সেইটিকে তাঁহার যোদ্ধৃভাবও বলা যাইতে পারে। একদিকে তিনি যাহা বুঝিতেন তাহার ভিতর যেমন তিলমাত্র জটিলতা, বা সংশয়ের সম্পর্ক রাখিতেন না, তেমনি আবার অন্যদিকে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা সফল করিবার জন্য জীবনের প্রতিক্ষণ, যোদ্ধা যেমন যুদ্ধের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকে, সেইরূপভাবে তিনি সমগ্র অন্তরের সহিত সদা জাগ্রত থাকিতেন। সেই জন্য তাঁহার কথায় ও কাজে বিন্দুমাত্র গরমিল দেখা যাইত না। মনুষ্যত্বের উপর শ্রদ্ধা নিবেদিতার স্বভাবের ধাতুগত ধর্ম ছিল। মানুষ যথার্থ মনুষ্যত্বে ভূষিত হউক ইহাই তিনি চাহিতেন। মানুষের ভিতরে যেখানে যে ভাবেই মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিয়াছেন, তেজস্বিনী নিবেদিতা সেইখানেই শ্রদ্ধা সহকারে আপনার মস্তক নত করিয়াছেন।

নিবেদিতার জীবন আলোচনা করিতে গেলে এত কথা বলিবার আসিয়া উপস্থিত হয় যে তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এবং লেখিকার সামর্থ্যেও কুলায় না। তাঁহার পরিচয় তিনি যে সকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তাহার ভিতর অনেকাংশে পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে যে ভালবাসা দিয়া তিনি ভারতকে আপনার করিয়াছিলেন সেই ভালবাসা দিয়াই বুঝিতে হইবে।

আজ নিবেদিতার কথা বলিতে গিয়া একদিকে যেমন সেই দৃঢ়ব্রতা সন্ন্যাসিনীর সত্য, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রেমপূত চরিত্র স্মরণ করিয়া বিমল আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অপর দিকে আবার আপনাদিগের অপৌরুষ ও দৈন্য স্মরণ করিয়া ক্ষোভে ও লজ্জায় অভিভূত হইতে হইতেছে। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে নিবেদিতাকে পরমাত্মীয়ারূপে ধরিতে পাইয়াছিল। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে নিবেদিতা যখন ইহ জগতে ছিলেন তখন তাঁহাকে আপনার বলিয়া বুঝিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যই ভালবেসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়।'

ভগিনী নিবেদিতার ভারতে বসবাসের সময় সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করে তিনি যেভাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন তার কাহিনী বিচিত্র ও চিরস্মরণীয়।

ভগিনী নিবেদিতার পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের টাইরন প্রদেশের অন্তর্গত ডানগ্যানন নামক ক্ষুদ্র শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ রেভারেণ্ড জন নোব্‌ল ছিলেন এক গীর্জার ধর্মযাজক। মার্গারেটের পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ডও ধর্মযাজকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। মেরী ইজাবেল হ্যামিলটনের সঙ্গে বিবাহের পর স্যামুয়েল ডানগ্যানন শহরে তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন। এখানেই ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর মার্গারেটের জন্ম হয়। মার্গারেট যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁর মা ইজাবেল দেবতার চরণে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে, তাঁর সন্তান যদি নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে দেবতার কার্যেই তাকে উৎসর্গ করবেন। এইভাবে জন্মের পূর্বেই তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিলেন।

মার্গারেটের শৈশব কেটেছিল তাঁর পিতামহীর কাছে। স্যামুয়েল রিচমণ্ড ডানগ্যানন শহর ত্যাগ করে ইংলণ্ডে গমন করেন। কিছুদিন ম্যাঞ্চেস্টারে বাস করে তিনি যখন ওল্ডহ্যামে তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন, তখন মার্গারেট পুনরায় পিতা-মাতার নিকট চলে আসেন। স্যামুয়েলের পরবর্তী কর্মক্ষেত্র হল ডেভনের গ্রেট টরেণ্টন পল্লীতে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, মার্গারেটের বয়স তখন নয়। তিনি ছিলেন পিতার প্রিয় পাত্রী। পিতার উপাসনাপদ্ধতি ও ভক্তিপূর্ণ ভাষণগুলি মার্গারেটকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। বাইবেলের বিচিত্র কাহিনীগুলি তাঁকে যেন বাস্তব জগতের বাইরে অন্য এক লোকের সন্ধান দিত। প্রকৃতপক্ষে এখন থেকেই ধর্মজীবনের প্রতি তাঁর ধীরে ধীরে অনুরাগ জন্মায়। একদিন স্যামুয়েলের এক ধর্মযাজক বন্ধু এলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি ভারত-প্রত্যাগত। বালিকা মার্গারেটের কোমল পবিত্র মুখ তাঁকে আকৃষ্ট করল। আশীর্বাদ করে তিনি বললেন, 'ভারতবর্ষ একদিন তোমাকে ডাক দেবে।' তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, বড় হয়ে মিশনরী প্রচারিকারূপে মার্গারেট ভারতবর্ষে যাবেন। ভারতবর্ষ সত্যই মার্গারেটকে ডাক দিয়েছিল। কিন্তু ধর্মপ্রচারিকারূপে নয়, উপাসিকা হয়ে, সেবিকা হয়ে তিনি এসেছিলেন ভারতবর্ষে। মার্গারেট কিন্তু তখন জানতেন না, ভারতবর্ষ কোথায়। তাই তাঁর মনে বিস্ময় জেগেছিল।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে টরেণ্টন পল্লীতেই মার্গারেটের পিতার দেহত্যাগ হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পত্নী মেরী নোব্‌লকে বলে গেলেন, ভবিষ্যতে মার্গারেটের জীবনে এক বৃহত্তর আহ্বান আসতে পারে, সেদিন যেন তিনি কন্যাকে সাহায্য করেন। পিতার মৃত্যু মার্গারেটের হৃদয়ে বিশেষ আঘাত দিয়েছিল। কৈশোরের আনন্দময় জীবনে বিষাদের ছায়া দেখা দিল।

স্যামুয়েল ছিলেন আদর্শের পূজারী। ধর্মযাজকবৃত্তি অবলম্বন করে তিনি কোনদিন অর্থোপার্জনের দিকে বিশেষ মন দেন নি। তার ফলে দারিদ্র্যের মধ্যেই পরিবারের দিন কাটত। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। বিদেশে একাকী শিশু পুত্রকন্যা নিয়ে বাস করা সম্ভব নয়। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর মেরী দুটি কন্যা মার্গারেট ও মে এবং পুত্র রিচমণ্ডকে নিয়ে আয়র্ল্যাণ্ডে ফিরে এলেন পিতার কাছে। মেরীর পিতা হ্যামিলটন ছিলেন রাজনীতির একজন বিশিষ্ট

নেতা। আইরিশ হোমরুল (স্বায়ত্ত-শাসন) আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। তাঁর সংস্পর্শে মার্গারেটের কিশোর চিত্তে ধীরে ধীরে দেশাত্মবোধ জেগে উঠল। আইরিশ জাতির স্বাধীনতা স্পৃহা অলক্ষ্যে তাঁর হৃদয়ে দৃঢ় হতে লাগল।

যথাসময়ে মার্গারেট ও তাঁর বোন মে শিক্ষালাভের জন্য হ্যালিফ্যাক্স কলেজে প্রেরিত হলেন।

হ্যালিফ্যাক্স বিদ্যালয় এক্ চার্চের অধীনে। বিদ্যালয় সংলগ্ন বোর্ডিং-এ মার্গারেট ও মে-র থাকবার ব্যবস্থা হল। এ এক নূতন জীবন। কারণ বাড়ি থেকে বোর্ডিং-এর পবিবেশ ভিন্ন। এখানে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সমস্ত সময় ঘড়ির কাঁটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লেখাপড়া, খেলাধূলা, উপাসনা—সকলেরই সময় নির্দিষ্ট। মার্গারেট ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তাঁর মেধা ছিল তীক্ষ্ণ। অধ্যয়নে তাঁর বিশেষ অনুরাগ দেখা যেত। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য পুস্তকপাঠেও আগ্রহ ছিল প্রচুর। সাহিত্য ব্যতীত পদার্থ ও উদ্ভিদবিদ্যার প্রতি তাঁর বেশ ঝোঁক ছিল। উত্তরকালে তাই এদেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি তাঁর গবেষণার কার্যে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পেরেছিলেন।

কোন বিষয়ে ফাঁকি দেওয়া, বা অস্পষ্টভাবে জানা মার্গারেটের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সব বিষয়ই ভাল করে জানতে হবে, এই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি সহপাঠিনীদের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মার্গারেটের বেশ পার্থক্য দেখা যেত। বাইবে থেকে সহসা দেখলে তাঁকে গর্বিত, জেদী, অসহিষ্ণু ও তার্কিক বলে মনে হলেও বুদ্ধির প্রাখর্য, চিন্তাশীলতা ও অপরের প্রতি সহৃদয়তা তাঁকে সাধারণের পর্যায়ভুক্ত হতে দেয়নি।

যথাসময়ে মার্গারেট বিদ্যালয়ের অন্তিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তিনি পূর্বেই স্থির করে রেখেছিলেন, তিনি হবেন শিক্ষয়িত্রী। তাই

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করে কেসউইক চলে যান। পরে এক বছর রেক্সহ্যাম শহরের একটি স্কুলে কাজ করেন।

শোনা যায়, রেক্সহ্যাম শহরে অবস্থান কালেই ওয়েলসবাসী এক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। পরস্পর বাগদত্ত হবার পূর্বেই বন্ধু ইহলোক থেকে বিদায় নেন। অতঃপর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্গারেট চেস্টারে কর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ছোট বোন মে তখন লিভারপুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেছেন। দুই বোনের উপার্জনে কোনরকমে সংসার চলে যাবে ভেবে মার্গারেট পরিবারের দায়িত্ব নিলেন। মেরী নোব্‌ল এতদিন আয়র্ল্যাণ্ডেই ছিলেন। এখন তিনি লিভারপুলে চলে এলেন। এখানেই মার্গারেটের একমাত্র ভাই রিচমণ্ড নোব্‌লের কলেজে পড়ার ব্যবস্থা হল।

শিক্ষা সম্বন্ধে মার্গারেট ছিলেন বরাবর কৌতূহলী। পেস্তালৎসি ও ফ্রবেল এই দুই মনীষী শিক্ষা জগতে নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এই নব পদ্ধতির মূল কথা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী বা শিশুর স্থান সর্বাগ্রে। মার্গারেটের বয়স তখন অল্প এবং শিক্ষাকার্যেও তিনি নূতন ব্রতী। কিন্তু আন্তরিকতা ও উৎসাহের ফলে তিনি ক্রমশঃই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলেন। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল। প্রথম লজম্যানদের সঙ্গে, পরে তাঁদের মারফৎ ডাচ মহিলা ডি-লীউ-এর সঙ্গে। তিনি 'গুড্‌ সানডে' ক্লাবের সদস্যা হলেন। ক্লাবে তিনি প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন ও স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করতেন। ধীরে ধীরে মার্গারেট গভীর চিন্তাশীলা অথচ সদা উৎসাহী এক মহীয়সী নারীতে পরিণত হলেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের উইম্বল্‌ডনে তিনি মিসেস ডি-লীউ পরিচালিত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তখন থেকেই তাঁদের স্থায়ী বাস হল উইম্বল্‌ডনে।

মার্গারেটের মধ্যে ছিল দৃঢ়তা ও কর্মশক্তি, আর উৎসাহ তো

ছিলই। নব শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর তাঁর ইচ্ছা হল, তিনি নিজেই একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে স্বাধীনভাবে কাজ করবেন। সুতরাং উইম্ব্‌ল্‌ডনেই একটি বিদ্যালয় খুললেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ। ক্রমে তিনি লণ্ডনের বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিতা হয়ে উঠলেন। লণ্ডনের 'সেসেমি ক্লাবের' সংগঠনকার্যে তিনি প্রথম থেকেই উদ্যোগী ছিলেন। পরে ঐ ক্লাবের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ক্লাবে নিয়মিত শিল্প ও সাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে নারী জাতির বিভিন্ন সমস্যা এবং রাজনীতি প্রভৃতি সকল আলোচনায় মার্গারেট ছিলেন অগ্রণী। বার্নার্ড শ, হাক্সলী প্রভৃতি নামজাদা লেখক ও বৈজ্ঞানিক 'সেসেমি ক্লাবে' মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা দিতেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ও আলোচনার ফলে মার্গারেটের চিন্তাশক্তি বেড়ে গেল। মার্গারেটের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচারশক্তি দেখে তাঁরাও বিস্মিত হতেন। এইভাবে মার্গারেট যখন তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা, রচনাশক্তি ও বাগ্মিতা প্রভৃতির দ্বারা লণ্ডন সমাজে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠ, তখন সহসা তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আগমনে। প্রতীক্ষিত জীবন-দেবতার আহ্বান তিনি শুনতে পেলেন।

বহির্জীবনের সাফল্য মার্গারেটের চিত্তকে পরিপূর্ণ করতে পারেনি। তাঁর অন্তরে এক আলোড়ন চলছিল। বাল্যকালে প্রচলিত ধর্মের প্রতি তাঁর একটা সহজ বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে প্রখর বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার ফলে সংশয় দেখা দেয়। ধর্মজীবনের উপর চার্চের নির্দেশ তাঁর মোটেই ভাল লাগত না। অনুষ্ঠানগুলি মনে হত প্রাণহীন। উদারতার অভাব। মধ্যে মধ্যে তিনি চার্চে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতেন। সংশয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য তিনি বিভিন্ন পুস্তক অধ্যয়ন, বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা, দার্শনিক মতবাদগুলির উপর চিন্তা, বিজ্ঞান-চর্চা প্রভৃতি নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ-সব ধর্ম সম্বন্ধে তাঁকে নিশ্চয়তা দেয়নি।

কেবলই মনে হত, জগতে এমন কোন ব্যক্তি কি নেই যিনি প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারেন ?

জীবনের এই পরম সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব স্বামী বিবেকানন্দের, যিনি তাঁকে সব সংশয় ও দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে এক অনন্তলোকের সন্ধান দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষ থেকে আগত এক 'হিন্দুযোগীকে' কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে মার্গারেট দেখতে যাওয়া স্থির করেন।...

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ মার্গারেটের জীবনের অসাধারণ ঘটনা। কারণ এই সাক্ষাতের ফলে তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়।...

সেদিন নভেম্বর মাসের [১৮৯৫] এক রবিবারের মনোরম অপরাহ্ন। ইংলণ্ডের ওয়েস্ট এণ্ড (West-End) নামক স্থানে একটি ড্রইংরুমে 'হিন্দুযোগী' স্বামী বিবেকানন্দকে দেখবার ও তাঁর কথা শুনবার জন্য মাত্র পনেরো-ষোলোজন অভ্যাগত উপস্থিত। তাঁরা অর্ধ-বৃত্তাকারে উপবিষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের দিকে মুখ করে বসে আছেন। তাঁর পেছনে অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্বলিত অগ্নি। একটি ঘরোয়া ক্লাস। মার্গারেট যথা সময়ে ঘরে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। এই প্রথম দর্শনের স্মৃতি মার্গারেটের মনে বিশেষভাবে অঙ্কিত ছিল। তাঁর মনে হত, এর সঙ্গে প্রাচ্য জীবনের যেন একটা সাদৃশ্য ছিল। ভারতে প্রায়ই দেখা যায়, কোন উদ্যানে অথবা সূর্যাস্তকালে কূপের সমীপে, কিংবা গ্রামের উপকণ্ঠে বৃক্ষতলে এক সাধু উপবিষ্ট এবং তাঁর চারপাশে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ। সেদিনকার পরিবেশ প্রাচ্যদেশের এইরূপ এক দৃশ্যেরই যেন রূপান্তর !

সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক পরিচ্ছদ, আকৃতি উজ্জ্বল ও বীরত্ব-ব্যঞ্জক, প্রবল ব্যক্তিত্বপূর্ণ আয়ত নয়ন আর প্রশান্ত মুখমণ্ডল।

ক্রমে অপরাহ্ন শেষ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। নানা

প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসী প্রায়ই সংস্কৃত শ্লোক সুর করে আবৃত্তি করছিলেন। আবার মাঝে মাঝে তিনি আপনার মনে 'শিব।' 'শিব।' বলে উঠছিলেন। মার্গারেটের কাছে সবই নূতন, তাই তিনি খুব বিস্ময়বোধ করছিলেন।

স্বামিজী সেদিন হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে আদর্শ বিনিময়ের সময় এসেছে। এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর পাশ্চাত্যে আগমন। স্বামিজী যে সব বিষয় আলোচনা করেন তার মধ্যে 'সকল ধর্মই একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সমভাবে সত্য' এই কথাটি সকলের কাছেই নূতন হলেও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল।

স্বামিজীর বাণী মার্গারেটকে আকৃষ্ট করলেও অন্যান্য সকলের মতো তিনিও প্রথমে ভেবেছিলেন তার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু সত্যই কি হিন্দুযোগী কোন নূতন বার্তা বহন করে আনেন নি? পরে মার্গারেটের মনে হয়েছিল, এই হিন্দুযোগী যা কিছু বলেছেন, তিনি পূর্বে হয়তো ঐরূপ কথা শুনে বা ভেবে থাকতে পারেন, কিন্তু এটা ঠিক এ পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তির দর্শন তিনি পাননি, যিনি মাত্র একঘণ্টার মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বলে মার্গারেটের মনে হয়েছে তাকে এমন সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারেন।

মার্গারেট স্বামিজীর আরও দুটি বক্তৃতা শোনেন এবং তার সারাংশ লিখে নেন। স্বামিজী ঐ বৎসর ২৭শে নভেম্বর আমেরিকা যাত্রা করেন। তিনি যে সব বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার উপর চিন্তা করে মার্গারেটের মনে হল, মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সুন্দর, ধর্মের নামে স্বামিজী তাকেই আহ্বান করেছেন। আর মার্গারেট এই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যই তো অপেক্ষা করছিলেন!

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাতের ফলে তাঁর জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন আসে, তা স্মরণ করে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে

তাঁর 'ভারতীয় জীবনের টানা পোড়েন' (The Web of Indian Life) নামক পুস্তক প্রকাশিত হবার পর তিনি লিখিয়াছিলেন :

'মনে কর, যদি সে সময় স্বামিজী লণ্ডনে না আসতেন ? জীবনটা নিরর্থক হয়ে যেত। কারণ আমি সর্বদাই জানতাম, আমি এক সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় আছি। সব সময় বলে এসেছি একটা আহ্বান আসবে, আর সত্যই সে আহ্বান এল।'

পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামিজী আবার লণ্ডনে আগমন করেন। এবারেও বিভিন্ন স্থানে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন হয়। ড্রইংরুম, ক্লাব এবং লোকের বাড়িতেও তিনি বক্তৃতা ও আলোচনাদি করতেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তরের ক্লাস হত। মার্গারেট বক্তৃতা ও ক্লাসে নিয়মিত যোগ দিতেন। প্রশ্নোত্তরের ক্লাসগুলি খুব জমে উঠত, কারণ ঐ সময় সকলেই স্বামিজীকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করবার সুযোগ পেতেন। ঐ ক্লাসগুলিতে সবচেয়ে মনোযোগী ছাত্রী ছিলেন মার্গারেট। তা বলে তিনি নীরব শ্রোতা ছিলেন না, বরং সব সময় তাঁর চেষ্টা ছিল, নানা রকম যুক্তি দিয়ে স্বামিজীর মতগুলিকে খণ্ডন করা। ভাল করে জানবার জন্যই তিনি স্বামিজীর সব কথায় সংশয় প্রকাশ করতেন। 'কিন্তু' ও 'কেন' তাঁর মুখে লেগেই থাকত। স্বামিজী কিন্তু কোনদিনও তাঁর যুক্তি বা তর্কে রাগ করতেন না। মার্গারেট কেবল অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও উৎসাহী তাই নয়। স্বামিজী বুঝেছিলেন, সত্যকে উপলব্ধি ও এক মহান্ আদর্শে নিজেকে উৎসর্গ করার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তাঁর হৃদয়ে।

ক্রমে মার্গারেটের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটতে লাগল। তিনি বুঝলেন, প্রকৃত অধ্যাত্ম বা ধর্মজীবন কাকে বলে। তাঁর অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল স্বামিজী প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণ করবার জন্য। স্বামিজীকে তিনি তখনই আচার্য (Master) বলে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতিও তিনি এক আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। একদিন শুক্রবারের ক্লাসে একচোট বাদ-প্রতিবাদের পর হঠাৎ স্বামিজী বলে

উঠলেন, ‘জগতে আজ কিসের অভাব জান? জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী, যারা সদর্পে পথে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, ‘ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল।’ কে কে যেতে প্রস্তুত?’ কথাগুলি বলতে বলতে স্বামিজী আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং শ্রোতৃবৃন্দের দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হল, তিনি যেন ইঙ্গিত করছেন কাউকে তাঁর সঙ্গে যোগদান করতে। স্বামিজীর সে বজ্রগম্ভীর আহ্বান মার্গারেটের হৃদয়ে তীব্র আঘাত করল। মার্গারেটের মনে হল তিনি উঠে দাঁড়াবেন। স্বামিজী আবার গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, ‘কিসের ভয়? যদি ঈশ্বর আছেন, এ সত্য হয়, তবে জগতে আর কিসের প্রয়োজন? আর যদি এ-কথা সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনেই বা ফল কী?’

ক্লাস শেষ হয়ে গেল। স্বামিজীর ঐ আহ্বান মার্গারেটের কানে বাজতে লাগল। স্বামিজীর আদর্শে জীবন উৎসর্গ করবার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, তাঁর মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। সাধারণ অপর পাঁচজনের মতো কেবল স্বার্থ-চিন্তা ও গতানুগতিক জীবন যাপন তাঁর পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব নয়। তাঁকে সর্বস্ব ত্যাগ করতেই হবে। হয়তো এই ত্যাগ করতে তাঁর হৃদয় ভেঙে যাবে, কিন্তু উপায় নেই। স্বামিজীর বজ্রগম্ভীর আহ্বান দিবারাত্র তাঁর হৃদয়ে ধ্বনিত হতে লাগল।

দিনের পর দিন মার্গারেট অস্থিরচিত্তে কাটাতে লাগলেন। স্বামিজীর আহ্বান তিনি উপেক্ষা করবেন না। কিন্তু মনের মধ্যে নানা সংশয় জাগে। স্বামিজীর আদর্শের স্বরূপ কী? যে আদর্শের জন্য তিনি সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত?

৭ই জুন স্বামিজী মার্গারেটকে লিখলেন ঃ

‘প্রিয় মিস নোব্‌ল,

আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যেতে পারে—তা হল মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার এবং জীবনের প্রতি কার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা-নির্ধারণ।

কুসংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ এই সংসার। যে উৎপীড়িত, সে পুরুষ হোক অথবা নারী হোক, তাকে আমি করুণা করি; আর যে উৎপীড়ক, সে আমার অধিকতর করুণার পাত্র।

এই একটা ধারণা আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সকল দুঃখের মূল অজ্ঞতা, আর কিছু নয়। জগৎকে কে আলো দেবে? আত্মোৎসর্গ ই ছিল জগতের নীতি, এবং হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সর্বাপেক্ষা সাহসী ও বরেণ্য, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' তাঁদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণায় পূর্ণ শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন। ...তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে! আর ধীরে ধীরে আরও অনেকে আসবে। আমরা চাই সাহসপূর্ণ বাণী, আর তার অপেক্ষা অধিক সাহসিক কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো। জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে! এস, আমরা আহ্বান করতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত না হন, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের দেবতা এই আহ্বানে সাড়া না দেন। জীবনে এর চেয়ে বড় আর কি আছে, এর চেয়ে আর কোন কাজ মহত্তর?...অনন্ত কালের জন্য আমার অফুরন্ত আশীর্বাদ।'

পত্র পড়ে মার্গারেট স্তব্ধ, অভিভূত। কী সংক্ষেপে অথচ উজ্জ্বলভাবে স্বামিজী তাঁর আদর্শকে ব্যক্ত করেছেন! তাঁর আহ্বান ধর্মের নামে, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের নামে, পৃথিবীর সকল নরনারীর কল্যাণকামনায়। সেই আহ্বানে মার্গারেটের সমগ্র সত্তা জেগে উঠল। তাঁর ভেতরের মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত হল।

এরপর একদিন স্বামিজী কথাপ্রসঙ্গে মার্গারেটকে আরও স্পষ্ট করে বললেন, 'স্বদেশের নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতকগুলি পরিকল্পনা আছে। আমার মনে হয়, সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পার।'

মার্গারেট এবার ভাল করে বুঝলেন যে, তাঁকে ভারতবর্ষের নারী জাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে হবে।

স্বামিজী স্বদেশে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তাঁর ভারতযাত্রা স্থির হল। মার্গারেট তার পূর্বেই স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালেন, তিনি স্বামিজীর কাজে যোগদান করতে দৃঢ়সংকল্প।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ কলম্বো পদার্পণ করেন। সেই মুহূর্ত হতে ভারতের সর্বত্র তিনি অভাবনীয় সংবর্ধনা ও অভিনন্দন লাভ করেন। কলম্বো থেকে আলমোড়ায় প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলি ইংরেজিতে 'Colombo to Almora' ও বাংলায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামক পুস্তকে প্রকাশিত। চরিত্র গঠন, দেশপ্রেম ও প্রকৃত ধর্মজীবন যাপনের সমস্ত প্রেরণা ঐ বক্তৃতাগুলিতে রয়েছে।

তাঁর জন্মস্থান মহানগরী কলকাতা থেকে একদিন অখ্যাত, অজ্ঞাত পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে তিনি ভারত পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এলেন যখন, তখন তিনি জগদ্বিখ্যাত, আচার্যশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ। শোভাবাজারের রাজবাটিতে তাঁকে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়। স্বামিজীর অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ তখন আলমবাজার মঠে। ভারতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত মঠকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চিন্তা তাঁর সমগ্র মনপ্রাণ অধিকার করেছিল। ঐ মঠ হবে ধর্ম-কর্ম, ও জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়স্বরূপ। মেয়েদের জন্য অনুরূপ একটি মঠ *, তা সম্ভব না হলে অন্ততঃ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথাও

*স্বামী বিবেকানন্দের মহৎ অভিপ্রায় পূর্ণ করে মেয়েদের মঠ [শ্রীসারদা মঠ] শ্রীসারদা দেবীর জন্ম শতবার্ষিকীতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে স্থাপিত হয়। জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে নারীজাতির সেবার উদ্দেশ্যে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি তখনই ভেবেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, মার্গারেট ঐ কাজে সাহায্য করতে পারবেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে প্রথম রামকৃষ্ণমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ জনসাধারণের সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান। স্বামিজী প্রত্যেক পত্রে মার্গারেটকে মিশনের কার্যাবলী সম্বন্ধে লিখতেন। যে সব ছেলেরা সংসার ত্যাগ করে মঠে যোগদান করেছে তারা কেমন করে দুর্ভিক্ষ, সেবা ও প্রচার কার্যদ্বারা মানবসেবায় ব্রতী হয়েছে তার বিবরণ পাঠাতেন।

মার্গারেট তখন লণ্ডনে স্বামী অভেদানন্দের বেদান্ত-প্রচার কার্যে সাহায্য করছেন। উইম্বল্‌ডনে তিনি স্বয়ং একটি বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। মধ্যে মধ্যে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের নিয়ে সম্মিলন এবং ঐ সম্মিলনে পাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থা করতেন। রামকৃষ্ণমিশনের কার্যবিবরণী পড়া হত। এইভাবে ইংলণ্ডেই তিনি ভারতবর্ষের জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। ক্রমে পরিবারের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে তিনি ভারতবর্ষে যাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। কিন্তু স্বামিজী নানারকম চিন্তা করে তাঁকে প্রথমে ভারতে আগমনের অনুমতি দেননি। ভারতবর্ষের জলবায়ু উষ্ণ, পাশ্চাত্ত্য ধরনে জীবন যাত্রার অসুবিধা ইত্যাদি ভেবে স্বামিজী লিখেছিলেন, 'তুমি এখানে না এসে ইংলণ্ড থেকেই আমাদের জন্য বেশী কাজ করতে পারবে।' মার্গারেটের কিন্তু সে কথা মনোমত হয়নি। ভারতে এসে ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন, এবিষয়ে তিনি তখন দৃঢ় সংকল্প। মার্গারেটের চরিত্রে ছিল সাহস ও আত্মপ্রত্যয়। কোন বাধা-বিপত্তি তিনি গ্রাহ্য করতেন না। আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ও সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট বরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর গভীর আগ্রহ দেখে অবশেষে স্বামিজী তাঁকে ভারতে আসবার অনুমতি প্রদান করে লিখলেন, 'তোমাকে অকপটভাবে লিখছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কার্যে তোমার অশেষ সাফল্যলাভ হবে।

ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষ অপেক্ষা নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী নারীর জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বদা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে।'

ঐ পত্রে ভারতবর্ষে কাজ করতে গেলে মার্গারেটকে যে সব প্রতিকূল অবস্থা ও বাধার সম্মুখীন হতে হবে তার উল্লেখ করে পরিশেষে স্বামিজী লেখেন, 'কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা কর, এবং কর্মান্তে যদি বিফল হও, কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমি আমরণ তোমাকে সাহায্য করব—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আব নাই কর, বেদান্ত-ধর্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাক।'

মার্গারেট অতঃপর ভারতযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। মেরী নোব্‌ল কন্যার এই নির্বাচনে সর্বান্তঃকরণে সম্মতি প্রদান করেন। তাঁর ভারত-গমন উপলক্ষ্যে লণ্ডনে এক সম্মিলন আহূত হল। পরিচিত বন্ধুগণ সকলেই বিদায় সংবর্ধনা জানালেন, 'মার্গারেটের যাত্রা-পথ যেন শুভ হয়।'

মার্গারেট যেদিন অতি প্রত্যূষে উইম্ব্‌ল্‌ডন পরিত্যাগ করলেন, সেদিন চারিদিক ঘন কুয়াসায় আচ্ছন্ন। প্রচণ্ড শীত পড়েছে, তথাপি তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং বহু বন্ধুবর্গ স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বিদায়-বেদনায় সকলেরই চোখে জল। ইংলণ্ড পিছনে পড়ে রইল। জাহাজ ধীরে ধীরে সমুদ্রের তরঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জাহাজের নাম 'মম্বাসা'।-আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্বদেশ-সমাজ সব পরিত্যাগ করে মার্গারেট যাত্রা করলেন এক অজানা, অপরিচিত দেশের উদ্দেশ্যে।

মাদ্রাজ হয়ে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি জাহাজ কলকাতার বন্দরে এসে তার শেষ গন্তব্যস্থলে পৌঁছল। স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেটকে অভ্যর্থনা করবার জন্য জেটিতে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে দেখে মার্গারেট অনেক আশ্বস্ত বোধ করলেন। এই অপরিচিত দেশে তখন একমাত্র স্বামিজীই তাঁর পরিচিত।

কলকাতায় চৌরঙ্গী অঞ্চলে এক হোটেলে মার্গারেট প্রথমে অবস্থান করেন। স্বামিজী তাঁর বাংলা শেখার ব্যবস্থা করলেন। কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখা হ'ল—মিউজিয়াম, ফোর্ট, বটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি। তখনকার চৌরঙ্গীর সঙ্গে বর্তমান চৌরঙ্গীর বহু পার্থক্য। তখন ঐ অঞ্চল জন-বিরল, পরিষ্কার, সুসজ্জিত ইংরেজ-পল্লী। চৌরঙ্গী দেখে প্রকৃত কলকাতা ও তার অধিবাসীদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিল না। মার্গারেট এসেছেন এ দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে। তাঁর উৎসাহ ইংরেজ-পল্লীতে নয়, 'নেটিভ' পাড়ায়।* তাই তিনি একলাই ঘোড়ার গাড়ি করে ঐগুলি আবিষ্কার এবং ভারতবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন।

ঐ বছরেই ৮ই ফেব্রুয়ারী আর দুইজন পাশ্চাত্ত্য মহিলা মিসেস স্যারা বুল ও মিস জোসেফীন ম্যাকলাউড আসেন ভারত-ভ্রমণের উদ্দেশ্য। মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বর্তমান বেলুড়মঠের জমি কেনার পর গঙ্গাতীরে অবস্থিত পুরানো বাড়িটির কিছু কিছু সংস্কার করা হয় এবং মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে মার্গারেট কিছুদিন ঐ বাড়িতে বাস করেন।

মিসেস স্যারা বুল ছিলেন নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক ওলি বুলের স্ত্রী। আমেরিকায় বস্টন শহরে এঁর বাড়িতে স্বামিজী

* বিদেশী শাসকগণ এদেশের লোকদের 'নেটিভ' (অর্থাৎ দেশীয়) বলে সম্বোধন করতেন। তাঁদের ঐ সম্বোধনের মধ্যে এ দেশীয় লোকদের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পেত।

আতিথ্য গ্রহণ করেন। স্বামিজীর বেদান্ত-প্রচার কার্যে তিনি স্বামিজীকে বহু সাহায্য করেন। পরে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান গবেষণার কাজেও নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। স্বামিজী তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ধীরা মাতা' এবং 'মা' বলে তাঁকে সম্বোধন করতেন।

মিস জোসেফীন ম্যাকলাউড ছিলেন স্বামিজীর পরম সুহৃদ। স্বামিজী তাঁর নাম রেখেছিলেন 'জয়া' এবং পত্রে বহু সময় 'জো' বলে সম্বোধন করতেন। ভারতে আগমনের পর মিস ম্যাকলাউড স্বামিজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বামিজী, কি ভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' স্বামিজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, 'ভারতবর্ষকে ভালবাস '

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে যে জীর্ণ-ক্ষুদ্র বাড়িটিতে ধীরা মাতা, জয়া ও মার্গারেট প্রায় দুইমাস অবস্থান করেন, তার পরিবেশ ছিল যথার্থই স্বর্গীয়। অপরতীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও বৃক্ষশীর্ষগুলি দেখা যেত। স্বামিজী প্রতিদিন সকালে পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দিতেন। সেই মহাপুরুষের আগমনে বাড়িখানি যেন তীর্থে পরিণত হত। প্রাতরাশের পর বৃক্ষতলে বসে বহুক্ষণ চলত স্বামিজীর কথা। তন্ময় হয়ে তিনি ভারতবর্ষের কথা বলে যেতেন। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী, বেদান্ত মতবাদ, ইতিহাস, উপকথা, সাহিত্য, কাব্য, জাতীয়ভাব, দৈনন্দিন জীবনের আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সুললিত কণ্ঠে তিনি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে যেতেন। মার্গারেট ও তাঁর সঙ্গিনীরা স্থান, কাল বিস্মৃত হয়ে তন্ময় হয়ে শুনতেন। তাঁদের চোখের সামনে ভেসে উঠত ভারতমাতার প্রাচীন মহিমময় মূর্তি।

মার্গারেট অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এক মহৎ উদ্দেশ্যে তাঁর ভারতে আগমন। ভারতের নারীজাতির শিক্ষাকার্যে আত্মনিয়োগ করবেন। কিন্তু স্বামিজী মোটেই সে কথা তোলেন না। মার্গারেট

কাজের কথা বলতে গেলে উৎসাহ দেন না। মার্গারেট জানতেন না যে, স্বামিজী অপেক্ষা করছেন উপযুক্ত সময়ের জন্য। ভারতবর্ষের কাজে নিযুক্ত হবার পূর্বে প্রয়োজন ভারতবর্ষকে জানা—আরও প্রয়োজন ভারতবর্ষকে ভালবাসা। যে নারীজাতির উন্নতিকল্পে মার্গারেট জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, সেই নারীগণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়া দরকার। তিনি বিদেশিনী—ভারতকে না জেনে ও না ভালবেসে যদি কাজ করেন তবে তা একেবারেই বিদেশীভাবে হবে। তাই স্বামিজী ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে শিক্ষা দিয়ে মার্গারেটকে কাজের উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। কেবল প্রাচীন ভারতকে ভালবাসলে হবে না। বর্তমান ভারতকেও ভালবাসতে হবে। কারণ প্রাচীন থেকেই বর্তমান ভারতের জন্ম; আর বর্তমান ভারত থেকেই আবির্ভূত হবে মহিমময় ভবিষ্যৎ ভারত। কিন্তু বর্তমান ভারতকে ভালবাসা কি সহজ? ভারতের চারিদিকে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অপরিচ্ছন্নতা ও নানা সমস্যা। তাছাড়া পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের জীবনযাত্রা এত পৃথক যে পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত ভারতবাসীর পক্ষেই ভারতবর্ষকে ভালবাসা ছিল কঠিন। কাজেই কোন বিদেশীর পক্ষে যে অসম্ভব সে-কথা বলাই বাহুল্য। স্বামিজী কিন্তু অসাধ্য-সাধন করেছিলেন।

ইতিমধ্যে জনসাধারণের কাছে মার্গারেটকে পরিচিত করে দেবার উদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে বক্তৃতার আয়োজন হয়। স্বামিজী স্বয়ং ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। মার্গারেটের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, 'ইংলণ্ড আমাদের আর একটি উপহার * দিয়েছে—মিস মার্গারেট নোব্‌ল। এঁর কাছে আমাদের অনেক আশা।' ঐ সভায় বক্তৃতা দিয়ে মার্গারেট সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব'।

*শ্রীমতী এ্যানী বেশান্ত ইংলণ্ড থেকে এসে ভারতের কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। স্বামিজী তাঁর বক্তৃতায় এঁর কথা উল্লেখ করেছিলেন।

১৭ই মার্চ মার্গারেট রামকৃষ্ণ সংঘ জননী শ্রীসারদা দেবীর দর্শন-লাভ করেন। শ্রীসারদা দেবী ভক্তগণের কাছে শ্রীশ্রীমা বলে পরিচিত ছিলেন।...

মার্গারেটের সঙ্গে মিসেস বুল ও মিস জোসেফীন ম্যাকলাউডও শ্রীশ্রীমার দর্শনলাভ করতে যান। সেদিন সেণ্ট প্যাট্রিকের * জন্মদিন। মার্গারেট তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন, 'day of days' অর্থাৎ 'সেরা দিন'। বাস্তবিক শ্রীমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের এই দিনটি তাঁর কাছে বিশেষ প্রেরণাদায়ক ছিল।

শ্রীমা তাঁদের সকলকেই 'আমার মেয়ে' বলে সস্নেহে অভ্যর্থনা করেন; কাছে বসিয়ে তাদের জলযোগ করান। তাদের অনুরোধে নিজেও কিছু গ্রহণ করেন।...

ঐ বছরেই (১৮৯৮) ২৫শে মার্চ মার্গারেটের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। ঐ দিনটি ছিল The Day of Annunciation—যেদিন দেবদূত এসে ঈশা-জননী মেরীকে তাঁর গর্ভে ভগবান জন্মগ্রহণ করবেন এই কথা জ্ঞাপন করেন। খ্রীষ্টানদের কাছে দিনটি খুব বড়। স্বামিজী মার্গারেট, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডকে সঙ্গে করে মঠে (নীলাম্বরবাবুর বাগান-বাড়িতে) নিয়ে যান। ঠাকুরঘরে পূজার আয়োজন ছিল। স্বামিজী প্রথমে মার্গারেটকে দিয়ে সংক্ষেপে শিবপূজা করিয়ে পরে তাঁকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করেন। সবশেষে ভগবান বুদ্ধদেবের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে শুভ অনুষ্ঠান শেষ হল।

স্বামিজী বললেন, 'যাও, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে পাঁচ শতবার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর'।

দীক্ষাকালে স্বামিজী মার্গারেটের নাম দিলেন 'নিবেদিতা'। মার্গারেটের নবজন্ম হল। তিনি চিরকালের জন্য ভগবচ্চরণে নিবেদিতা হলেন।...নিবেদিতা লিখেছেন, 'সেই প্রভাতটি জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত'।

*খ্রীষ্টান ধর্মের একজন বড় সাধক।

নিবেদিতা সম্পর্কিত স্বামীজীর কয়েকটি কবিতা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

স্বামীজী নিবেদিতার বিষয়ে ও উদ্দেশে প্রত্যক্ষভাবে দুটি কবিতা রচনা করেন।* একটির নাম Benediction অর্থাৎ আশীর্বাদ, দ্বিতীয়টি Peace অর্থাৎ শান্তি। 'নিবেদিতা' নামটি নিবেদিতার বিষয়ে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ততম বক্তব্য, বলা উচিত বহু বক্তব্যের হৃদয়-মধ্যস্থ কৌস্তুভমণি; আর ঐ কবিতা দুটিতে সেই মহামাণিক্যেরই উদ্‌ভাসিত দ্যুতি। প্রথম কবিতায়—ভারতের নিবেদিতা, দ্বিতীয় কবিতায়—নিত্য সত্যের নিবেদিতা। প্রথম কবিতায় স্বামীজী এক বিদেশিনী নারীকে সমগ্র ভারত সাধনাকে আত্মসাৎ করে ভাবী ভারতের সেবিকা, গুরু ও বান্ধবী হবার জন্য আহ্বান করেছিলেন; সেরকম গুরুদায়িত্ব আর কখনো কোনো বিদেশীকে বহন করতে হয়েছে কিনা সন্দেহ। নিবেদিতা তা করতে কতখানি পেরেছিলেন —তার চরম স্বীকারোক্তি ভারতের মহাকবির কণ্ঠে শোনা গেছে, যখন তিনি নিবেদিতাকে 'লোকমাতা' বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু নিবেদিতাকে ভারতের জন্য উৎসর্গ করার কালে বিবেকানন্দ জানতেন যে, পরিপূর্ণ প্রেম ও পরিপূর্ণ সেবা কখনই সম্ভব নয়, যদি না অন্তরে সেই পরম অধ্যাত্ম সত্যের আলোক চিরদীপ্যমান হয়ে থাকে। তাই তিনি চেয়েছেন, বাইরেব কর্মতরঙ্গের মধ্যে যখন নিবেদিতা থাকবেন, তখন তিনি যেন শক্তির অন্তরে যে শক্তি, আলোকের মর্মে যে

* এই রচনার উদ্দেশ্য শিরোনামায় নির্দেশিত বিষয়ে তথ্যসন্নিবেশ করা। সেইজন্য কতকগুলি কবিতার পটভূমিকা দেওয়া হয়েছে, বিচার বা বিশ্লেষণ করা হয়নি। নিবেদিতার অপ্রকাশিত কয়েকটি চিঠি এই লেখায় ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলির মূল্য যথেষ্ট, একথা বলা যায়।

আলোক,—তার সন্ধান পান। Peace কবিতায় বিবেকানন্দের সেই দ্বিতীয় অর্পণ নিবেদিতাকে।

প্রথমে Benediction কবিতাটি অনুবাদে উদ্ধৃত হচ্ছে। কবিতাটির রচনাকাল অজ্ঞাত।

মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়,
দখিণের সমীরণে যে মাধুরী বয়,
বীর্যময় পুণ্যকান্তি যে অনল জ্বলে
অবন্ধন-শিখা মেলি আর্য-বেদীতলে;
এ সব তোমারই হোক, আরও ইহা ছাড়া
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা।

ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, গুরু—তুমি একাধারে।

[নারায়ণী দেবী অনূদিত]

কবিতাটির রচনাকাল অজ্ঞাত হলেও* অনুমানের চেষ্টা করা যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারীতে নিবেদিতা স্বামীজীকে এক পত্রে লিখেছেন—'আপনার জন্মদিনের কবিতা [স্বামীজীর জন্ম-তারিখ ১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৩] এসে পৌঁছল গতরাত্রে'। এই কবিতাটি কোন্ কবিতা? এই চিঠিতে অতঃপর নিবেদিতা যা লিখেছেন, তার থেকে বোঝা যায়, স্বামীজী এ কবিতায় নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করে তাঁর ভবিষ্যতের বিষয়ে অত্যুচ্চ কিছু কথা বলেছেন।

*'বাণী ও রচনা'র সপ্তম খণ্ডে কবিতাটি রচনার তারিখ দেওয়া আছে ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০০। এই তারিখ কিভাবে পাওয়া গেল জানি না। যদি মূল রচনা থেকে নেওয়া হয় ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে ১৯০০র ১৩ জানুয়ারীর চিঠিতে নিবেদিতা স্বামীজীর রচিত কোন্ কবিতাটির কথা বলেছেন?

হয়ত আলোচ্য Benediction কবিতাটিই স্বামীজী পাঠিয়েছিলেন। তা যদি হয়, সেক্ষেত্রে কবিতাটির রচনাকাল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে। নিবেদিতার চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি ঃ

'আমার প্রিয় পিতা, আপনার জন্মদিনের কবিতা এসে পৌঁছল গতরাত্রে! কী এমন বলতে পারি কবিতাটির বিষয়ে যা শেষ পর্যন্ত তুচ্ছ শোনাবে না। শুধু বলি, আপনার সুন্দর ইচ্ছা যদি সফল হয়, তা আমার হৃদয়কে ভেঙে দেবে। কারণ আমি এখন রামপ্রসাদের ভাবে আছি ঃ 'চিনি হতে চাই না মন—চিনি খেতে ভালবাসি'। এ কথা ভাবা যদিচ উদ্ভট তবু বলি—আমি এমন কোনো পথে ভগবানকেও পেতে চাই না, যদি না তার দ্বারা আমার পিতা অলঙ্ঘনীয়ভাবে উর্ধ্বে বিরাজ করেন। অধ্যাত্মসিদ্ধির ক্ষণে গুরু হারিয়ে যাবেন, এমন কথা ভাববার দরকার হয় না জানি, তবু সেই মহামুহূর্তেও এমন কোনো দিব্য আনন্দের কথা কল্পনা করতে পারি না, যার প্রাপ্তি গুরুর ক্ষেত্রে অধিকতর নয়।

অসম্ভব কথা বলার কিংবা অচিন্ত্যনীয় চিন্তা করার চেষ্টা করেছে একজন, তবু আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি কি প্রকাশ করতে চাইছি।

আগে ভাবতাম, আমি ভারতের নারীদের জন্য কাজ করতে চাই, এই ধরনের নানা সুমহান নৈব্যক্তিক ভাবরাজীতে পূর্ণ থাকত মস্তিষ্ক, কিন্তু ক্রমেই নিশ্চিতভাবে সেই উচ্চশিখর থেকে নেমে এসেছি, আজ আমি যদি কিছু করতে চাই, তার একমাত্র কারণ—আমার পিতার ইচ্ছা তাই। এমন কি আমাদের ঈশ্বরজ্ঞানের ইচ্ছাও দেওয়া-নেওয়ার ভাবমুক্ত নয়। সেবার জন্যই সেবার চিরকামনা অবশ্যই শ্রেয়, কিন্তু হে প্রিয় আচার্যদেব, সে আমাদের এই দুঃখী ক্ষুদ্র জীবনের জন্য নয়!

আর একটি জিনিস সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত, অন্তত আমার নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, সময় উপস্থিত হলে আপনি হাজার হাজার সন্তান লাভ করবেন, যারা বৃহত্তর, শ্রেষ্ঠতর, যারা আমার থেকে অনন্ত গুণ বেশী করে আপনাকে ভালবাসবে ও সেবা করবে—আর তার দেরিও নেই।

এখন স্বামীজী আপনাকে স্বীকার করতে হবে, আপনার কিছু ভুল হয়েছিল ; 'আমেরিকা—ইতি !' *—উঁহু ! জ্যাকসনে একটি মানুষের কাছে আপনার নাম ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের কাছে লাল আলোর মত ছিল। সে ব্যক্তি আজ আপনার এবং আমার মিত্র, —কারণ আপনার কন্যার রসবোধ আছে !!†

* এই সময় স্বামীজী দ্বিতীয় আমেরিকা ভ্রমণে এসেছিলেন। স্বাস্থ্যের কারণে, এবং মানসিক ঔদাসীন্যের জন্যও বটে, স্বামীজী বলেছিলেন—তাঁর আমেরিকার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

† নিবেদিতা ভারতীয় কাজের জন্য আমেরিকায় অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে কাজটিকে অত্যন্ত দুরূহ দেখেন। আমেরিকা তখন বিবেকানন্দের বন্ধু ও শত্রুতে পূর্ণ। বিবেকানন্দ প্রচণ্ডভাবে মিশনারীদের ভারতবিষয়ক কুৎসার বিরোধিতা করেছিলেন, যার ফলে তাদের প্রাচ্য-উদ্ধার ব্রতের চাঁদায় পর্যন্ত ঘাটতি পড়েছিল। সুতরাং মিশনারীরাও সর্বপ্রকারে বিবেকানন্দের নামকে কলঙ্কিত করবার চেষ্টা করেন। তাঁদের সমবেত চেষ্টা যে অনেকাংশে সফল হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। স্বামীজীর নামে প্রচার করা স্থানবিশেষে নিবেদিতার পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। এই সব বিরোধীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষে জানতেন না, বা তাঁর বক্তৃতা শোনেন নি। স্বামীজীকে লেখা পত্রে অমনই এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন নিবেদিতা, যিনি মূলে রীতিমত সভ্য ও রসিক মানুষ। এঁর বিষয়ে নিবেদিতা ১৩. ১. ১৯০০ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

'মিঃ ও'ডনেলের স্বামীজী-বিষয়ক মনোভাব : ও নাম আমার সামনে উচ্চারণ পর্যন্ত করবে না। এই ব্যক্তি মিশিগানের সকল 'সান্‌ডে স্কুলে'র সুপারিন্টেনডেন্ট এবং কি নয়! আর—সবিস্ময়ে দেখলাম, তিনি একজন

॥ ২ ॥

Peace কবিতাটি লেখা হয় আমেরিকায়, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯। স্বামীজী ঐ সময়ে তাঁর দ্বিতীয় আমেরিকা ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং নিবেদিতাও সেখানে ছিলেন ভারতীয় কাজের জন্য অর্থসংগ্রহের অভিপ্রায়ে। সেইকালে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কবিতাটি লিখিত হয়। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা সে বিষয়ে লিখেছেন :

> '২০শে সেপ্টেম্বর নিবেদিতা 'রিজলি ম্যানর' [মিঃ লেগেটের বাসগৃহ] পৌঁছিলেন। মিঃ লেগেট ছিলেন ধনী ব্যক্তি। স্বামীজীর প্রতি তাঁহার ও মিসেস লেগেটের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি ছিল।…স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও কয়েকদিন কাটাইয়া গেলেন।… মিসেস সারা বুল আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার কন্যা ওলিয়া। মিসেস লেগেটের ভগ্নী মিস ম্যাকলাউড পূর্ব হইতেই অবস্থান করিতেছিলেন।…
>
> নিবেদিতার আমেরিকায় অবস্থানের উদ্দেশ্য অর্থসংগ্রহ। কাজে লাগিবার পূর্বে স্বামীজার সঙ্গ ও বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে। তিনি পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, প্রথম হইতেই আদর্শে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রয়োজন।…লেগেটের বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ গৃহে বাস করিলেও তাঁহার জীবন যে একটি

পাকাচুল, মিষ্টি মানুষ, চোখে ঝিলিক, সব সময়ে লোকের কৌতুকবোধে নাড়া দেন। আমাকে তিনি সৎ-স্বভাব 'চার্চ উওম্যান' বলেই ধরলেন, এবং সেখান থেকে চলে আসার আগে আমরা সকলে মিলে রেক্টরের কাছে গিয়ে কোনো এক রবিবার স্বামীজীকে বেদী থেকে ভাষণ দেবার জন্য অনুরোধের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম!!! তুমি জানো, গীর্জা-আইনে অসন্ন্যাসী বেদী (Pulpit) থেকে প্রচারের অধিকার পেতে পারে (যে আইন অনুসারে রোমান ও এপিক চার্চের কাছে স্বামীজী অসন্ন্যাসী, তত্ত্বগতভাবে)!!!"

বিশেষ আদর্শবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহা স্থির রাখিবার জন্য চালচলন, বেশভূষায় পরিবর্তন প্রয়োজন।…রিজলি ম্যানরে আগমনের পর নিবেদিতা সংকল্প স্থির করিলেন। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী; যে-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উদ্‌যাপনই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। পরদিন [২১শে সেপ্টেম্বর] তিনি তদুপযোগী পরিচ্ছদ গ্রহণের অভিপ্রায় স্বামীজীর নিকট ব্যক্ত করেন। আদর্শের প্রতি তাঁহার দৃঢ়তা দর্শনে স্বামীজী প্রীত হন। ঐদিন বৈকালবেলা ভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্তন করিবা মাত্র স্বামীজী তাঁহাকে একটি কবিতা উপহার দেন। কবিতাটির নাম 'শান্তি' (Peace)'।*

স্বামীজী এইকালে কি ধরনের অ্যাধাত্মিক ভাবাবেগের মধ্যে ছিলেন—তার বিস্তৃততর পরিচয় যদি পাঠকগণ বুঝতে চান, তাহলে তাঁদের স্বামীজী কর্তৃক নিবেদিতাকে লেখা ১৮৯৯—১৯০০-এর চিঠিগুলি দেখে নিতে হবে। সেই সঙ্গে ঐকালেই স্বামীজীর ভাবানুভূতির সম্বন্ধে নিবেদিতার পত্রও পঠিতব্য।

কবিতাটি অনুবাদে নিম্নোক্ত প্রকার:

॥ শান্তি ॥

মহাবলে ধেয়ে আয় শক্তি—
কিন্তু তা শক্তি নয়,
তা অন্ধকারে অন্তর্লীন আলোক,
তা ছায়া—তীব্র জ্যোতি মাঝে।

আনন্দ তা—অনির্বচনীয়,
গভীর বেদনা—অননুভূত,
অমর জীবন তা অযাপিত,
নিত্য মরণ—অশোচিত।

* কবিতাটির প্রতিলিপি দেওয়া আছে "The life of the Swami Vivekananda By His Eastern and Western Disciple"-এর মধ্যে।

তা দুঃখ নয়, তা সুখ নয়
দুয়ের মর্মে যা আছে, তাই।
তা নিশা নয়, তা উষা নয়,
উভয়ের সন্ধির সেতু।

সঙ্গীতের সম, পবিত্র ছন্দের যতি,
মুখর ভাষণের অন্তরের নৈঃশব্দ্য,
বাসনার উচ্ছ্বাসের দুই তরঙ্গের মধ্যে
হৃদয়ের ক্ষান্তি, ধৃতি।

নয়নে ধরা দেয়নি, এমন সৌন্দর্য,
পাত্র নেই তবু নিঃসঙ্গ প্রেম,
অগীত অশ্রুত সুর,
আর জ্ঞান, যা জ্ঞানের অতীত।

জন্ম তরঙ্গের মধ্যে স্থির মৃত্যু,
ঝঞ্ঝার শিরে নিশ্চল নিরোধ,
সৃষ্টিগর্ভ মহানেতি,
আর মহানেতি যা সৃষ্টি পরিণাম।

নয়নাশ্রু ঝরে পড়ে সেইখানে,
হাসিতে আবার ফোটে নব প্রাণে,
জীবনের পরম লক্ষ্য সেই—
'শান্তি'—তার একমাত্র ধাম।

॥ ৩ ॥

স্বামীজীর ইংরাজ শিষ্য জে. জে. গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামীজী Requiescat in Peace নামে যে কবিতাটি লেখেন, তার প্রাথমিক রূপ কিন্তু নিবেদিতাকৃত। সে হিসাবে কবিতাটিকে স্বামীজী ও নিবেদিতার যৌথ সৃষ্টি বলা যায়, যদিও নিবেদিতা রচিত প্রাথমিক রূপটি সামান্যই, এবং ত্রুটিযুক্ত বলে স্বয়ং নিবেদিতাই জানিয়েছেন।

ভারতবর্ষের জন্য, ঠিকভাবে বলতে গেলে বিবেকানন্দের জন্য, গুডউইন আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে তিনি জীবনের নানা অভিজ্ঞতাব মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। মিসেস ওলি বুল গুডউইন তাঁকে বলেছিলেন যে, 'তার প্রথম বয়স কেটেছিল সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকর্মেব চেষ্টায় পৃথিবীর নানা দরজায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে—তার ফল, হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। নিউইয়র্কে স্বামীজীর স্টেনোগ্রাফাররূপে কাজ করাব অভিজ্ঞতার পরে,—স্বামীজীর সঙ্গে তিনি মাসের পর মাস দিবারাত্র কাটিয়েছিলেন,—জীবনের সর্বোচ্চ উপলব্ধির সৌন্দর্য, আত্মা ও ঈশ্বরের জ্ঞানেব সম্মুখীন তিনি হলেন।'

নিউইয়র্কের নিপুণ স্টেনোগ্রাফার বিবেকানন্দকে জানার পরে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে (তাও সব সময় পর্যাপ্ত হয় নি) ভারত ও বিশ্বকে দিয়েছিলেন 'বিবেকানন্দের রচনাবলী'। কেননা স্বামীজীর 'রচনাবলী'র অধিকাংশই গুডউইন-অনুলিখিত বক্তৃতাবলী, আর বিনিময়ে পেয়েছিলেন জীবনের পবম প্রাপ্তি—বিবেকানন্দ গুডউইনের কাছে ছিলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট।

স্বামীজী গুডউইনকে অপরিসীম ভালবাসতেন। গুডউইন তাঁব কাছে পুত্রবৎ নন, পুত্রাধিক। গুডউইনের জন্য স্বামীজীর অসীম ভালবাসার জন্য অন্য বিদেশী শিষ্যেরা অনেক সময় আনন্দময় ঈর্ষা বোধ করতেন। গুডউইনের মৃত্যুসংবাদে আর্তনাদ করে স্বামীজী বলেছিলেন, 'বুঝলাম, পুত্রশোক কী ভয়ঙ্কর'।

গুডউইন স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় স্বামীজীর বক্তৃতা-সফরের সময়ে তিনি স্বামীজীর সঙ্গে থাকেন। তারপরে সম্ভবত যখন দারুণ অর্থকৃচ্ছ্র দেখা দেয়, তখন বাধ্য হয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সাময়িকভাবে 'মাদ্রাজ মেল' কাগজে যোগদান করেন এবং উতাকামণ্ডে থাকাকালে ১৮৯৮এর ২রা জুন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এই মৃত্যু তাঁর বন্ধু ও পরিচিত মানুষদের কাছে গভীরতম বেদনার কারণ হয়েছিল, যাঁরা তাঁর আনুগত্য ও সেবার মধ্যে 'খাঁটি ইংরাজ চরিত্র' দেখেছিলেন, যিনি 'স্বদেশে বিদেশে যেখানেই হোক, মহান ও ঈশ্বরীয় প্রকাশকে বরণ করে নেবার মত শক্তিসম্পন্ন'। 'তাঁর সাহসী ও প্রেমময় জীবন', —ওলিবুল লিখেছিলেন,— 'আমাদের অভিজ্ঞতা ও আনন্দের ভাণ্ডারে মহৈশ্বর্যতুল্য'।

গুডউইন যখন মারা যান, স্বামীজী আলমোড়ায় ছিলেন। নিবেদিতা প্রভৃতিও সেখানেই ছিলেন। তবে গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ আসার সময় স্বামীজী সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে কিছুদূরে কোনো একটি স্থানে গিয়েছিলেন। সুতরাং সংবাদ আসামাত্র স্বামীজী তা পান নি। কিন্তু স্বামীজী ভিন্ন অন্যান্যরাও গুডউইনকে এতই ভালবাসতেন যে মৃত্যু সংবাদের দারুণ প্রতিক্রিয়া হয় তাঁদের মনে। এ বিষয়ে মিসেস হ্যামণ্ডকে ৫ জুন, ১৮৯৮-তে লেখা নিবেদিতার অপ্রকাশিত পত্র থেকে অংশ উদ্ধৃত করছি :

> 'গতকাল দুপুরের দিকে একটি টেলিগ্রাম এসে আমাদের বেদনায় আচ্ছন্ন করে দিল—গুডউইনের মৃত্যু হয়েছে। মিসেস ওলিবুল ও মিস ম্যাকলাউড তাঁকে আমাদের চেয়ে বেশী ভালভাবে জানতেন। কিন্তু তাঁর শেষ দেখা আমার সঙ্গেই—কী যে ভাল ব্যবহারই সেদিন তিনি করেছিলেন মাদ্রাজে—ভালোত্ব একেবারে তাঁর স্বভাবধর্ম। যেসব হিন্দুরা এখানে তাঁকে জানতেন, তাঁরা যথার্থ দুঃখে অধীর—দেখলেই বোঝা যায়। সারাক্ষণ

আমাদের কাজ করে, এমন একটি ছোকরা খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তিন-চার ঘণ্টা ধরে—কথা বলবার সামর্থ্যও যেন তার হারিয়ে গিয়েছিল। একটি সাধু সারা বিকাল বসে রইলেন, আর তাঁর বিষয়ে মধুর স্নিগ্ধ সব কাহিনী বলতে লাগলেন। বদ্রী শা এই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি; তিনি এই সাধুর কাছে খুব সকালে এসে বলেছিলেন, তাঁর মন যেন বলছে যে, তাঁর ভাই গোবিন্দলাল নিশ্চয় মারা গেছে। টেলিগ্রাম যখন এল তখন স্বামী সদানন্দ সেটি চেপে যেতে চেয়েছিলেন, যেহেতু সেটি রাজার [স্বামীজীর] নামে পাঠানো—এবং রাজা অন্যত্র আছেন—কিন্তু সদানন্দ 'চোখের কয়েক ফোঁটা জল' গড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে পারেন নি, তাতে বদ্রী শা ব্যাপারটা কি জানবার জন্য জেদ করলেন। তারপর সব শুনে বললেন, 'একই ব্যাপার, গোবিন্দলাল না হয়ে গুডউইন—তফাৎ কি!' গুডউইনকে সকলে এখানে এমনই ভালবাসে। রাজা এখনো বাইরে, আজ সকালেই ফিরবেন, —আঘাতটা দারুণ বাজবে। একমাত্র সান্ত্বনা গুডউইন মারা গেছেন মাদ্রাজে নয়—উতকামণ্ডে—পৃথিবীর সুন্দরতম স্থানের একটিতে। গুডউইন শহীদ হয়েছেন—স্বামীজীর কাজের জন্য, আর এখানকার আবহাওয়ার জন্য। মনে হচ্ছে, টাইফয়েডে নয়, প্লেগেই যেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। * তাঁর সেবায় কোনো ত্রুটি ছিল না, ভক্তিতে ছিল না ফাঁক। কানায় কানায় পূর্ণ, সংহত সেবা ও ভক্তি। ভারতে নবযুগের ঋষিদের মধ্যে প্রথম স্থান নিলেন একজন ইংরাজ। এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনের উদ্দেশে আমাদের একমাত্র উপযুক্ত অর্ঘ্য হতে পারে ধূপ-দীপ, পুষ্প ও মাল্য এবং সুন্দর সঙ্গীত।

* ভারতের নানাস্থানে তখন প্লেগ-মহামারী চলছে। স্বামীজী প্লেগ শুশ্রূষার পরিকল্পনাও করেছেন। গুডউইন অবশ্য টাইফয়েডেই মারা যান।

ভারতে আগত পাশ্চাত্য শিষ্যের সংখ্যা একটি কম্‌ল—সাতের বদলে এখন ছয়।

সোমবার সকাল। স্বামীজী গতকাল সন্ধ্যার শেষে এলেন, অনেকটা মুহ্যমান অবস্থায়, কেননা তিনি সেই বৃদ্ধ সাধু পওহারী বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন, যিনি কেউটের দংশনকেও বলেছিলেন—'প্রিয়তমের বার্তা'। এজন্য স্বামীজীকে গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ জানানো হয় নি। জানানো হল আজ সকালে, যখন তিনি আমাদের কাছে এলেন। মিস ম্যাকলাউড সংবাদ দিলেন। খুব শান্তভাবে সংবাদটি নিলেন। তারপর থেকে খবরের কাগজ পড়ে এবং ক্রমাগত কথা বলে গেলেন। তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে তোমার চিঠির বিষয় শুনলেন, কবিতাটি দেখলেন।—নেল, নেল, প্রিয় আমার,—ভারত সত্যই পুণ্যভূমি।'

গুডউইনের প্রতি স্বামীজীর ভালবাসার পরিমাণ নিবেদিতা জানতেন বলেই গুডউইনের অভাবিত মৃত্যুকে স্বামীজী যখন শান্তভাবে নিতে পেরেছিলেন, তখন সেটি পরম বিস্ময়কর বস্তু বলে তাঁর মনে হয়েছিল, এবং সে বস্তু পুণ্যভূমি ভারতের মহাপুরুষদের পক্ষেই দেখানো সম্ভব বলে সোচ্ছ্বাসে জানিয়েছিলেন প্রিয় বন্ধু নেলকে। নিবেদিতার প্রাপ্ত পত্রসমূহে এর বেশী পাই না, কিন্তু পরবর্তী ঘটনার

* নিবেদিতা এখানে কাদের কথা বলেছে ঠিকভাবে বলা শক্ত। স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যা বা ভক্তদের মধ্যে ঐ সময়ের ভিতরে ভারতে এসেছেন: সেভিয়ার-দম্পতি, গুডউইন, মিসেস ওলিবুল, মিস ম্যাকলাউড, মিস মুলার, মিসেস প্যাটারসন [আমেরিকার কন্সাল পত্নী] এবং স্বয়ং নিবেদিতা। মোট সংখ্যা হয় আট। এঁদের মধ্যে হিসাবে বাদ যেতে পারেন হয় মিস মুলার, বা মিসেস প্যাটারসন। সম্ভবত মিস্ মুলারই বাদ যাবেন। ক্রিস্টিনের কথা এখানে ওঠে না, কারণ ক্রিস্টিন ভারতে এসেছিলেন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের গোড়ায়।

বিবরণ ডায়েরীতে তিনি রক্ষা করেছিলেন। বাইরে শান্ত বিবেকানন্দের বুকে কোন্ বেদনার ঝড় উঠেছিল, তা ডায়েরীর পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda' নামক গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, গুডউইনের মৃত্যুব বিষয় না জেনেও গুডউইন যখন মারা যাচ্ছেন সেই সময়ে নিবেদিতা প্রভৃতির মন কিভাবে অজ্ঞাত বিষাদ ও যাতনায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।—

> '৩০শে মে থেকে ২রা জুন [১৮৯৮]। পরবর্তী সোমবার যাঁরা তাঁকে [স্বামীজীকে] আতিথ্য দিয়েছিলেন [সেভিয়ার দম্পতি], তাঁদের সঙ্গে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন এক সপ্তাহের জন্য। আমরা আলমোড়ায় রয়ে গেলাম—ব্যাপৃত রইলাম পড়াশোনায়, অঙ্কনে এবং উদ্ভিদচর্চায়। সেই সপ্তাহের এক সন্ধ্যায় আহারাদির পরে আমরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম, তখন বিচিত্রভাবে আমাদের মন আকৃষ্ট হল 'In Memoriam'-এর * প্রতি এবং আমাদের মধ্যে একজন পড়ে শোনোলেন :
>
> আমার এই শ্রবণের শক্তি যতদিন থাকবে,
> ততদিন বেজেই যাবে ধীরে, মন্থরে, ঘণ্টাধ্বনি—
> প্রিয়তম আত্মার বিদায়ের বার্তা নিয়ে,
> এ পৃথিবীতে নয়ন মেলেছে এমন মধুরতম আত্মা সে।
> সেই ঘণ্টাধ্বনি আমি শুনছি, শুনছি, শুনছি—
> মৃতের উদ্দেশে নিত্য নমস্কার নিয়ে তা বাজছে,
> বলছে—শুভ হোক! শুভ হোক! শুভ হোক!
> বলছে—বিদায়! বিদায়! বিদায়—চিরতরে!

*In Memoriam লর্ড টেনিসনের বিখ্যাত শোকগীতি,—তাঁর প্রিয় বন্ধু আর্থার হেনরী হালামের মৃত্যুতে রচিত।

সেই বিশেষ ক্ষণেই, সুদূর দক্ষিণে, আমাদের গোষ্ঠীরই একজন প্রয়াণ করছিল এই ক্ষুদ্র, দৃশ্যমান সংসারমন্দির থেকে সূক্ষ্মতর জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত, দীপ্ততর কোনো প্রকাশলোকের মধ্যে, যেখানে হয়ত পরম সান্নিধ্য স্পষ্টতর, ঘনিষ্ঠতর। কিন্তু সেকথা আমরা জানতে পারিনি তখনো। আরও একটি কালিমাচ্ছন্ন দিন গেল—কেন, বুঝিনি তখনো। তারপরে, যখন শুক্রবার সকালে বসে কাজকর্ম করছি, টেলিগ্রাম এল, একদিন দেরি করে, তাতে লেখা : 'গুডউইন গতরাত্রে উতাকামণ্ডে দেহত্যাগ করেছেন'। ঐ অঞ্চলে পরে যা টাইফয়েড-মহামারী হয়ে দাঁড়াবে, আমাদের হতভাগ্য বন্ধু, দেখা গেল তারই প্রথম শিকারের অন্যতম। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি স্বামীজীর কথা বলেছিলেন :— স্বামীজীর যেন পাশে এসে দাঁড়ান—চেয়েছিলেন শেষক্ষণেও।

রবিবার সন্ধ্যায় স্বামীজী ফিরলেন।…তিনি সংবাদটি জানেন না, কিন্তু পূর্ব থেকেই গভীর বিষাদে তিনি মগ্ন। নীরবতা ভঙ্গ করে তখনি সেই মহাপুরুষের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, যিনি কেউটের দংশনকেও 'প্রিয়তমের বার্তা' বলেছিলেন, যাঁকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই সর্বাধিক ভালবাসতেন। স্বামীজী বললেন, 'আমি এইমাত্র একটা চিঠি পেয়েছি, পওহারী বাবা তাঁর সকল উৎসর্গকে পূর্ণ করেছেন দেহোৎসর্গ করে, যজ্ঞাগ্নিতে দেহ বিসর্জন করে পূর্ণাহুতি দিয়েছেন।' শ্রোতাদের একজন শিউরে বললেন : 'সেকি—কাজটি কি খুবই মন্দ হয় নি?'

'কী করে বলব তা?' গভীর ভাবোত্তেজনার সঙ্গে স্বামীজী বললেন, 'তিনি এতবড় যে আমার বিচারের অধিকার নেই; তিনি জানতেন তিনি কি করছেন।'

এরপর খুব অল্প কথাবার্তাই হল, সন্ন্যাসীর দল চলে গেলেন, অন্য সংবাদটি তখনও ভাঙা গেল না।

পরদিন খুব সকালে তিনি এলেন, গভীর ভাবাবেগে আচ্ছন্ন। পরে জানালেন রাত চারটে থেকে জেগে আছেন। একজন [মিস্ ম্যাকলাউড] তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে মিঃ গুডউইনের মৃত্যু সংবাদ জানান। বজ্রাঘাত তিনি নীরবে সইলেন। কয়েকদিন পরে যেখানে তিনি ঐ সংবাদ শুনেছিলেন, সেখানে থাকতে চাইলেন না, সর্বাধিক বিশ্বস্ত শিষ্যের আকৃতি সর্বদা মনে জাগছে—এই দুর্বলতার জন্য নিজের উপর দোষারোপ করলেন। প্রতিবাদ করে উঠলেন—কারোর স্মৃতির দাস হওয়া পুরুষোচিত নয়, ক্রমবিকাশের ঊর্ধ্বতর স্তরে উঠে মানুষ যদি মৎস্য বা কুক্কুরের লক্ষণগুলি বজায় রাখে তাহলে যেমন ঘটে, এও তাই। এ মায়া মানুষকে জয় করতে হবে, মৃতেরা যে পূর্বের মত আমাদের সান্নিধ্যেই আছেন, একথা বুঝতে হবে। তাদের অনুপস্থিতি বা বিচ্ছেদের ধারণাটাই মায়া। তারপর আবার ফেটে পড়লেন; সগুণ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে বিশ্বসংসার চালিত হচ্ছে, এই নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে তীব্র তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'সেক্ষেত্রে গুডউইনকে মেরে ফেলার জন্য এমন একজন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁকে নিকেশ করে ফেলা কি মানুষের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় না? গুডউইন—আহা।—যদি বেঁচে থাকত কত কি করতে পারত।'…

কিন্তু শোকসংবাদ পাবার পরে স্বামীজী তাঁর বিয়োগদুঃখ সম্বন্ধে শান্তই ছিলেন। শান্তভাবে বসে তিনি কথা বলেছিলেন। যে-শক্তি ত্যাগ-বৈরাগ্যে পৌঁছায়, তারই কথায় পূর্ণ ছিলেন সেই সাকলে—সেই দিব্য আকৃতি যা মানুষের আত্মাকে খরপ্রবাহে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ব্যক্তিত্বসীমার অনেকদূরে, অথচ আবার এমন এক স্থানে তাকে স্থাপন করে, যেখানে সে ঐ ব্যক্তিত্বেরই মধুবন্ধন ছেদনে অস্থির ব্যাকুল হয়ে ওঠে।…

কিন্তু এই দিনগুলিতে স্বামীজী কোথাও সরে যেতে, একাকী

থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। যে-জায়গায় গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ শুনেছিলেন, সে জায়গাটি তাঁর পক্ষে অসহ্য ঠেকছিল; আর সে বিষয়ে চিঠি পাওয়া বা লেখা নিত্য ক্ষতের যাতনা বাড়িয়ে তুলছিল। একদিন তিনি বললেন, 'বাইরে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তিময় মনে হলেও তিনি অন্তরে জ্ঞানস্বরূপ, আর তিনি নিজে বাহ্যত যদিও জ্ঞানময় মনে হন, আসলে ভক্তিতে পূর্ণ; তাই তিনি নারীর মত দুর্বল হয়ে পড়েন।'

এই মানসিক পটভূমিকায় গুডউইন বিষয়ে আলোচ্য কবিতাটি লিখিত হয়। কবিতাটি নিবেদিতাই শুরু করেন, ত্রিপদী ছন্দে তা লেখা আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু স্বামীজীর হাতে পড়ে সেটি আমূল বদলে যায়। এই পরিবর্তনে নিবেদিতা পাছে ক্ষুণ্ন হন, স্বামীজী 'কেবল ছন্দ ও মাত্রা মিশাইয়া কথা গাঁথা অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণভাবে অনুভব করা কতবড় জিনিস' তাই বর্ণনা করেছিলেন বিস্তারিতভাবে। কবিতাটি গুডউইনের মায়ের কাছে পাঠানো হয়।

কবিতাটি এই :—

॥ শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম ॥

চল আত্মা, শীঘ্রগতি, তারকাখচিত তব পথে,
ধাও, হে আনন্দময়, যেথা নাহি বাঁধে মনোরথে;
দেশকাল দৃষ্টিপথ যেথা নাহি করে আবরণ,
চিরশান্তি আশীর্বাদ যেথা করে তোমারে বরণ!
সার্থক তোমার সেবা, পরিপূর্ণ তব আত্মদান,
অপার্থিব প্রেমপূর্ণ হৃদয়েতে হোক তব স্থান;
মধুময় তব স্মৃতি দেশকাল দিয়াছে মিলায়ে,
বেদীতলে পুষ্পসম রেখে গেলে সৌরভ বিছায়ে!

ছুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছে সে আনন্দ সন্ধান,
জন্ম মৃত্যু রূপে যিনি, তাঁর সাথে হলে একপ্রাণ,
তুমি যে সহায় ছিলে, স্বার্থত্যাগী চির এ ধরায়,
আগে চল, সংসার সংগ্রামে আনো প্রীতির সহায়।

[কিরণচন্দ্র দত্ত অনূদিত]

এই কবিতার সঙ্গে স্বামীজী গুডউইন-জননীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন পত্রে :

'তাঁর কাছে আমার যে ঋণ, তা কখনো শোধ করা যাবে না। আমার কোনো চিন্তার দ্বারা যদি কেউ লাভবান হয়ে থাকেন, তিনি জেনে রাখুন, তার প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত মিঃ গুডউইনের অক্লান্ত এবং সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য পরিশ্রমের ফলেই প্রকাশিত হতে পেরেছে। তাঁকে হারিয়ে আমি ইস্পাতের মত খাঁটি বন্ধু হারিয়েছি, অপরাজেয় ভক্তিতে পূর্ণ শিষ্য হারিয়েছি, এমন একজন কর্মী হারিয়েছি ক্লান্তি কাকে বলে যিনি কখনও জানতেন না। আর পৃথিবী হারিয়েছে সেই সব বিরল মানুষদের একজনকে যিনি সর্বদাই অপরের জন্য দেহধারণ করে থাকেন। পৃথিবী তাঁকে হারিয়ে সম্পদ হারিয়েছে।'

কবিতা ও চিঠি পেয়ে শোকসন্তপ্ত গুডউইন-জননী তাঁর 'পরলোকগত পুত্রের উপর স্বামীজী কি জাতীয় উচ্চ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন' সে বিষয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে লিখে পাঠান।

গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামীজী কি দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন বোঝা যাবে, তাঁর অন্য আরও উক্তিতে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার ডান হাত খসে গেছে, ক্ষতির সীমা রইল না।', পুনশ্চ, 'আমার বক্তৃতার পালা শেষ।'

॥ ৪ ॥

নিবেদিতার লেখার মধ্যে স্বামীজীর আরও কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার পটভূমিকা পাওয়া যায়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের গোড়ার দিকে কোনো এক সময়ে শ্রীনগরে অবস্থানকালে স্বামীজী পুনঃপ্রবর্তিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জন্য To the Awakened India কবিতাটি, ঐ বৎসরের ৪ঠা জুলাই 'To the forth of July', এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বরের কোনো এক সময়ে Kali the Mother কবিতা রচনা করেন। এই সমস্ত কবিতার পটভূমিকার বিষয়ে সংবাদ নিবেদিতার লেখায় পাই। নিবেদিতার পত্র থেকে ১৮৯৯ সালে য়ুরোপে যাত্রাকালে জাহাজে 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' নামক বাংলা কবিতাটি রচনার বিষয়ে উল্লেখও পাই।

এই রচনাগুলির সঙ্গে নিবেদিতার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় এই প্রসঙ্গে সেগুলির পটভূমিকা দিলাম না।

জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা   গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

১৯০২ খৃঃ সেপ্টেম্বরে নিবেদিতা প্রথমে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়া ১৯০৩ খৃঃ জানুয়ারীতে কলিকাতায় ফিরিলেন। ...তিনি শুধু বায়ু-পরিবর্তনের জন্য ভারতভ্রমণে বাহির হন নাই। এক দিব্য প্রেরণা দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঝড়ের মত বেগে তিনি এই বিস্তীর্ণ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া গেলেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে অনেক দেশবিখ্যাত নেতাদের সহিত পরিচিত হইলেন। অনেক সভা-সমিতিতে উত্তেজনাপূর্ণ জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। পরাধীনতার জ্বালা বুঝাইয়া দিলেন, স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বেদান্তের মোক্ষ প্রচার করিলেন না, সংসার মায়া ও মিথ্যা একথাও বলিলেন না। তুরীয়ানন্দ লাভ তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল না।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ভিন্ন, পোশাক ভিন্ন, আচার-রীতি-নীতি ভিন্ন, খাদ্য ভিন্ন। প্রত্যেক প্রদেশের অতীত ইতিহাস ভিন্ন, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য আছে। সমাজবিজ্ঞানে পারদর্শিনী নিবেদিতা এই ঐক্যকে ভাষা দিয়া রূপ দিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। এই ঐক্যের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ভারতের জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ইহাই লিখিয়া গিয়াছেন।

নিবেদিতা লিখিয়াছেন, ভারতের একটি প্রদেশ আর একটি প্রদেশের মত নয়। ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষে ঐক্যের একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেয়। কেন না এই ঐক্য যান্ত্রিক—mechanical—নয়, পরন্তু জৈবিক—organic।...

ওকাকুরা এ সময়ে নিবেদিতার সঙ্গেই আছেন। খালি পায়ে,

পঠে ব্যাগ ঝুলাইয়া, কপিলাবস্তু, বোধগয়া তীর্থদর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। তিনি সকলকে দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া বেড়াইতেছেন—'যদিও বিবেকানন্দের মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি তিনি তাঁহার আত্মিক কন্যা তোমাদিগকে পরিচালনার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা শোন। তাঁহার চারিদিকে আসিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হও', তিনি আরও বলিলেন—'হে ভারতবাসী ওঠ জাগো, দেখ ত্রিশ বৎসরেরও অল্প সময়ের মধ্যে আমরা [জাপানীরা] কি করিয়াছি! তোমরাও কেন পারিবে না!'

নিবেদিতাও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ঘোষণা করিলেন, 'আমার কাজ এই জাতকে জাগ্রত করা।'

সেপ্টেম্বর মাসেই নিবেদিতা বোম্বাই মেলে চড়িয়া রওয়ানা হইলেন। বোম্বাই, পুণা, নাগপুর, কপিলাবস্তু, বোধগয়া দর্শন করিলেন, বক্তৃতাও দিলেন। নাগপুরেই প্রথম তিনি দেখিলেন নির্বাসনদণ্ড দ্বারা ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কত পরিবারকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। একে তিনি বিপ্লবী; সুতরাং তাঁহার মনে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়াই দেখা দিল। উত্তর দিকে তিনি লাহোর পর্যন্ত গেলেন; পশ্চিমে হায়দারাবাদ গেলেন।

এইবার তিনি বরোদায় যাইবেন। বরোদায় রমেশচন্দ্র দত্ত ভগিনী নিবেদিতাকে বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বড় বড় রাজ-কর্মচারীর সঙ্গে অরবিন্দও স্টেশনে গিয়াছিলেন। নিবেদিতার সহিত অরবিন্দের স্টেশনেই প্রথম সাক্ষাৎ। স্টেশন হইতে গাড়ী নিবেদিতাকে লইয়া শহরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে রাজ-অমাত্যেরা আছেন, অরবিন্দও আছেন। পথে নিবেদিতা কলেজের, মিনার গম্বুজওয়ালা বাড়ী দেখিয়া বলিলেন—'What an ugly pile!' ভারতীয় স্টাইলে গৃহস্থের ছোট্ট বাড়ী দেখিয়া বলিলেন—'Oh!

how beautiful!' একজন রাজ-অমাত্য অরবিন্দের কানে কানে বলিলেন,—'I say, she is mad!' (পাগল না কি?)—বারীন ঘোষ লিখিয়াছেন 'রাজ-অমাত্যদের আর্ট সম্বন্ধে ক-অক্ষর গোমাংস।' সুতরাং নিবেদিতার দৃষ্টি তাহারা পাইবেন কোথা হইতে। কিন্তু নিবেদিতার এই উক্তির মধ্য দিয়া অরবিন্দ নিশ্চয়ই তাঁহার [নিবেদিতার] মনের পরিচয় প্রথম পাইয়াছিলেন।

অরবিন্দের সহিত নিবেদিতার সাক্ষাতের পূর্বে তাঁহার [অরবিন্দের] তৎকালীন ক্রিয়াকলাপের কিছুটা পরিচয় দেওয়া দরকার। গুজরাটে সন্ত্রাসবাদীদের (terrorists) একটি গুপ্তচক্র আছে। ঠাকুর সাহেব তাহার প্রেসিডেন্ট। তিনি তখন দেশে নাই; বৈপ্লবিক কাজের সলা-পরামর্শের জন্য জাপানে গিয়াছেন। তাঁহার পদে অরবিন্দ গুপ্তসমিতির প্রেসিডেন্ট হইয়া কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে গাইকোয়াড়ের বাঙালী দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে অরবিন্দ সরলা দেবীর নিকট চিঠি দিয়া বাংলা দেশে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন। অরবিন্দের নির্দেশে যতীন ব্যানার্জী সার্কুলার রোডে প্রথম গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তারপর অরবিন্দ নিজেও এই গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গোপনে কলিকাতায় আসিয়াছেন, এবং মেদিনীপুর গিয়া হেমচন্দ্র কানুনগোকে এক হাতে গীতা ও এক হাতে তলোয়ার দিয়া গুপ্তসমিতির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। মেদিনীপুরের কাঁকরপূর্ণ মাঠের গর্তে ঢুকিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়া চাঁদমারী শিক্ষা দিয়াছেন। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন:

'আমার মেদিনীপুরের বাড়ীতে তাঁর [অরবিন্দের] অযাচিত শুভাগমনটাই আমার কাছে একটা মস্ত জিনিস।...সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমার দীক্ষা আরম্ভ হলো। আমি তলোয়ার ও গীতা হাতে নিলাম।...ভারতের অধীনতা মোচনের জন্য সব করব। অরবিন্দ কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন।

'মাঠের মাঝে একস্থানে কাঁকর খুঁড়ে নেয়াতে একটা প্রশস্ত গর্ত হয়েছিল। তার মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ করলে বাইরে থেকে বড় একটা শোনা যেত না।...অরবিন্দ ও বারীন্দ্রের বন্দুক ধরবার কায়দা ও তাক দেখে তখন মনে হয়েছিল—তাঁদের এ প্রথম হাতেখড়ি।'*

এই পটভূমিকার উপর যখন অরবিন্দ দাঁড়াইয়া আছেন, ঠিক তখনই নিবেদিতার সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, এবং নিরালায় কথাবার্তা হয়।

লণ্ডনে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাতের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই নিবেদিতা [মার্গারেট নোবল] ক্রপট্‌কিনের (Kropotkin) সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বিপ্লবপন্থী হইয়াছিলেন। ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদার তখন নিবেদিতার সহিত খুব পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'She was a nihilist of the worst type'। এই সময় নিবেদিতা আইরিশ হোমরুল আন্দোলনে যোগ দিয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের সময় লণ্ডনে যে কয়টি বিপ্লবের কেন্দ্র ছিল, নিবেদিতা ঐ বিপ্লবের কেন্দ্রগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অরবিন্দ ও নিবেদিতা এই দুই মহাবিপ্লবী যেদিন পরস্পর মিলিত হইলেন, বাংলার ইতিহাসে সেদিন এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনে দুইটি তারিখ স্মরণীয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর—যে দিন লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আর ১৯০২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর—যে দিন বরোদাতে অরবিন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের গুরুত্ব নিবেদিতার ব্যক্তিগত জীবনে অধিক। আর অরবিন্দের সহিত সাক্ষাতের গুরুত্ব নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনে সমধিক। অরবিন্দ আদর্শে বিপ্লবী [থিওরেটিক্যাল], আর নিবেদিতা

---

*বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা, পৃঃ ১৮, ১৯-২২।

হাতে-কলমে কাজে বিপ্লবী [প্রাক্‌টিক্যাল]। অরবিন্দের বয়স এখন ত্রিশ বৎসর। নিবেদিতা অরবিন্দ অপেক্ষা বয়সে পাঁচ বৎসর বড়।

উভয়ের কথাবার্তা আরম্ভ হইল। প্রথমে উভয়ের দার্শনিক মতবাদের প্রসঙ্গ উঠিল। বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতা শঙ্করানুগামী, অদ্বৈতবাদী ও মায়াবাদী; পরন্তু অরবিন্দ লীলাবাদী। নিবেদিতা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখিতেছেন মায়ার মধ্যে, আর অরবিন্দ দেখিতেছেন ব্রহ্মের স্বরূপের প্রকাশ ও লীলার মধ্যে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে নিবেদিতার নিকট এই জগৎ মিথ্যা। আর অরবিন্দের নিকট এই জগৎ সত্য।

প্রথমে নিবেদিতাই বলিলেন, 'কলিকাতা আপনাকে চায়। আপনার উপযুক্ত স্থান বাংলা দেশ।' অরবিন্দ বলিলেন, 'না, আমি অন্তরালে, অর্থাৎ পশ্চাতে থাকিব। আমার কাজ মানুষ তৈরী করা।' নিবেদিতা অরবিন্দের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'আপনি আমার উপর নির্ভর করিতে পারেন। আমাকে আপনার বন্ধু বলিয়া জানিবেন।' প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। উভয়ে একত্রে কাজ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সে কাজটি হইল ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত করা।

অরবিন্দ যে ইতিপূর্বে বাংলাদেশে আসিয়া গুপ্তসমিতির প্রথম পর্বের উদ্বোধন করিয়াছেন, সে কথা নিশ্চয়ই তিনি নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন। কেননা, কলিকাতায় ফিরিয়া নিবেদিতা অরবিন্দ-প্রবর্তিত গুপ্তসমিতির প্রথম পর্বে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছিলেন, 'বরোদায় অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর হইতেই নিবেদিতা আমাদের কলিকাতার গুপ্তসমিতির দলে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।'

বরোদা হইতে নিবেদিতা কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতা আসিয়াই তিনি মাদ্রাসে যাইবার জন্য সাগ্রহে নিমন্ত্রিত

হইলেন। মাদ্রাসে বিবেকানন্দের অনেক বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ একত্রে মিলিয়া নিবেদিতাকে সম্বর্ধনা জানাইলেন, শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করিলেন, বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিস্ময়ের কারণ, অতি অল্পকালের মধ্যেই নিবেদিতার খ্যাতি ও প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার নির্ভীকতা ও সাহসের জন্য অনেকেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সকলে মিলিয়া ব্যগ্রভাবে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কেননা তিনি স্বামীজীর শেষ কয় মাস তাঁহার [স্বামীজীর] নিকটেই ছিলেন।

নিবেদিতা বহু শহরে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।…তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু সর্বত্রই এক—অর্থাৎ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। এক অখণ্ড জাতীয়তা-বোধের মধ্য দিয়া ভারতবাসীকে জাগ্রত করাই তাঁহার গুরুনির্দিষ্ট মিশন বা কাজ। দাক্ষিণাত্যের সৌন্দর্য ও মন্দিরাদির কারুকার্য নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মাদ্রাসে কাটাইলেন। নিবেদিতার বক্তৃতাগুলি মাদ্রাসের 'হিন্দু' পত্রিকায় ছাপা হইতে লাগিল এবং ইহা বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা আতঙ্কের সহিত ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। কেননা, তাঁহাদের মতে বিবেকানন্দের এই অতি উগ্র স্বদেশপ্রেম নিতান্তই তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাপার। উহা মঠের উপর চাপাইলে মঠ সেই ভার সহ্য করিতে পারিবে না, ভাঙিয়া পড়িবে। সুতরাং নিবেদিতার এই উগ্র মারমুখী চরমপন্থী বক্তৃতা থামাইতে হইবে। নতুবা মঠ বাঁচিবে না। মাদ্রাসের বক্তৃতাতেই এই। বরোদায় অরবিন্দের সাক্ষাৎকার তখনও সন্ন্যাসীরা জানিতে পারেন নাই।

মাদ্রাস হইতে নিবেদিতা খৃষ্টমাসের সময় উড়িষ্যায় খণ্ডগিরিতে আসিয়া স্বামিজীর কয়েকটি সন্ন্যাসী শিষ্যের সহিত রাত্রি যাপন করিলেন। St. Luke [বাইবেল] হইতে প্রভু যীশুখৃষ্টের কবর হইতে উত্থানের গল্প পাঠ করিলেন। খণ্ডগিরির পর্বত, গুহা ও

চতুর্দিকের অরণ্যের মধ্যে তাঁহারাও যেন কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ইহা কি স্বামী বিবেকানন্দেরই পদধ্বনি ?...

স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর নিবেদিতার মাত্র ছয় মাসের জীবন-ইতিহাস এইখানে সমাপ্ত হইল।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর খণ্ডগিরিতে খৃষ্টমাস উদ্‌যাপন করিয়া নিবেদিতা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর প্রথম ভাগে কলিকাতা ফিরিলেন। নিবেদিতা যখন খণ্ডগিরিতে ছিলেন, সেই সময় আহ্‌মেদাবাদে কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি হইয়াছিলেন।

নিবেদিতা যখন মাদ্রাসে বক্তৃতা দিতেছিলেন তখন মাদ্রাসের 'হিন্দু' পত্রিকা তাঁহার বক্তৃতাগুলি খুব জমকালো ভাবে প্রতিদিন ছাপাইতেছিল। নিবেদিতা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাজ জাতিকে জাগ্রত করা। এই বক্তৃতাগুলির মধ্য দিয়া তিনি সেই কাজই করিতেছিলেন। এই উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে তাঁহার নামও ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ইহাতে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বেলুড় মঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কথাবার্তার সময় মঠের আরও কয়েকটি সন্ন্যাসীও উপস্থিত ছিলেন। নিবেদিতাকে বলা হইল, 'হয় তুমি রাজনীতি ছাড়, না হয় আমাদিগকে ছাড়। এই দুইয়ের একটি পথ তোমাকে বাছিয়া লইতে হইবে।' স্বামী ব্রহ্মানন্দই এই কথাগুলি বলিলেন। অপর একটি উদ্‌যোগী সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তোমার মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয় ?'

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন একাধারে একজন কঠোর তপোনিষ্ঠ যোগী ছিলেন সেই সঙ্গে উগ্র স্বদেশপ্রেমিকও ছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সংসারত্যাগের উপর এই মঠের

সবে প্রতিষ্ঠা। এই শিশু-মঠের উপর স্বামীজীর উগ্র স্বদেশপ্রেম চাপাইয়া দিলে মঠটি ভাঙিয়া যাইবে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট নিবেদিতার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাগুলি উপলক্ষ্য করিয়া যদি তাঁহাকে আক্রমণ করে তবে তো এই মঠের ধ্বংস অনিবার্য।

নিবেদিতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের সমস্ত কথাই স্তব্ধ হইয়া শুনিলেন। তারপর মুখে মৃদুতা ও দৃঢ়তা লইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন, 'আমি রাজনীতি ছাড়িতে পারিব না। আমি উহার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছি। আমি বরং প্রাণ ত্যাগ করিব, তবু উহা ছাড়িব না'

এই অল্প কয়টি কথার মধ্য দিয়া নিবেদিতা-চরিত্রের যে রূপ ফুটিয়া উঠিল, কোন চিত্রকর বা কোন ভাস্কর ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতার সহিত নিবেদিতা-চরিত্রকে অঙ্কিত করিতে পারিত না। নিবেদিতাকে দেখিলাম যেন একখানি কোষমুক্ত তরবারি।

কোন সম্প্রদায়বিশেষের নির্দেশ অনুসারে জীবনের পথে চলিতে হইবে, ইহা চিন্তা করাও নিবেদিতার পক্ষে অসহ্য।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং মঠের সন্ন্যাসীরা নিবেদিতাকে চিনিতে পারেন নাই। বিবেকানন্দ পারিয়াছিলেন।

নিবেদিতার কথা শুনিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, 'তবে তুমি এক কাজ কর। এক খোলা চিঠি লিখিয়া কলিকাতার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ছাপাইয়া দাও এবং ঐ পত্রে স্পষ্ট করিয়া লেখ যে, তুমি স্বেচ্ছায় মঠ ত্যাগ করিয়া যাইতেছ।'

নিবেদিতাকে মঠ ছাড়িতে বাধ্য করা হইল। ইহাতে দোষের কছুই নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে বলা হইল—'লেখ যে, তুমি স্বেচ্ছায় মঠ াড়িয়া যাইতেছ। অর্থাৎ আমরা তোমাকে তাড়াইয়া দিতেছি না।' ইহাতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও মঠের তৎকালীন সন্ন্যাসীদের চরিত্রে যে দুর্বলতা প্রকাশ পাইল তা সত্যই দুঃখের বিষয়। কেননা, এই দুর্বলতাটুকু নিশ্চয় নিবেদিতার চক্ষু ও মনকে এড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

নিবেদিতাকে যেরূপ বলা হইল, তিনি তাহাই করিলেন। নিবেদিতার বন্ধু মিঃ র‍্যাট্‌ক্লিফ তখন 'দি স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সুতরাং 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নিবেদিতার খোলা চিঠি অনায়াসেই ছাপা হইয়া বাহির হইল।

এখন বাকী রহিল শুধু টাকাপয়সার হিসাব। নিবেদিতা মঠের জন্যই হউক অথবা তাঁহার স্কুলের জন্যই হইক কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা নিবেদিতার নিকট ঐ চাঁদার টাকা অতি সত্বর চাহিয়া বসিলেন। নিবেদিতা সাময়িক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অতি সামান্য কিছু রাখিয়া বাকী সমস্ত টাকাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিলেন। যে টাকা ফিরাইয়া দিলেন, তাহার পরিমাণ চারিশত স্টার্লিং পাউণ্ড। নিবেদিতা সন্ন্যাসিনী। তিনি ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং বিনা দ্বিধায় তিনি টাকা ফিরাইয়া দিলেন। যদিও এই টাকা ফিরাইয়া দিতে তিনি আইনতঃ কতটা বাধ্য ছিলেন তাহা এখন বলা কঠিন। কেননা, মঠের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আশ্রিতা, এ কথা তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ঘোষণা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। টাকা-পয়সা ফিরাইয়া মঠের সংশ্রব হইতে মুক্ত হইয়া তিনি স্বাধীনভাবে নিষ্ঠার সহিত তাঁহার ঈপ্সিত রাজনৈতিক কার্যে মনোনিবিশ করিলেন।

নিবেদিতার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার এইখানেই পরিসমাপ্তি হইল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে না হইয়া পারে না। নিবেদিতা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী প্রথমে ভারতে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁহাকে ভারতের সেবার জন্য এদেশে আসিতে আহ্বান করিয়া চিঠি দিয়াছিলেন, 'তুমি ভারতের জন্য কাজ কর বা না কর, তুমি বেদান্ত গ্রহণ কর বা না কর, আমি মৃত্যু পর্যন্ত তোমার পেছনে

থাকিব। হাতীর দাঁত যেমন একবার বাহির হইলে আর তাহা ভিতরে প্রবেশ করে না, মরদের কথাও ঠিক তেমনই।' নিবেদিতা স্বামীজীর এই কথা কয়টি চিরদিন মনে রাখিয়াছিলেন।...

কাজেই মঠের সংশ্রব ত্যাগ করিলেও নিবেদিতা নিজেকে স্বামীজী হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারেন নাই। কেননা তাহা হইলে গ্রন্থ লিখিবার সময় 'I will stand by you unto death.' এই কথাটির উপর এত জোর দিয়া প্রকাশ করিতেন না।

এদিকে নিবেদিতা বরোদায় অরবিন্দের সহিত একত্রে কাজ করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া চলিয়া আসার পর অরবিন্দ বারীন্দ্রকে গুপ্তসমিতির কাজে যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহায্য করিবার জন্য কলিকাতা পাঠাইলেন। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন:

'যতীন-দা কয়েকজন মাতব্বর ধরে টাকারই ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তরুণদের হৃদয় জয় করতে পারেন নি। আমাকে বাংলা-দেশে গিয়ে সেইটি করতে হবে। পোষা হাতী দিয়ে যেমন করে হাতী ধরে, গন্‌গনে আগুনে গড়া আমার তরুণ প্রাণের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তেমনি তরুণ ধরবার ব্যবস্থার জন্য গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আমাকে দেশে পাঠান হল।'*

বারীন্দ্র আরও লিখিয়াছেন:

'বরোদা থেকে বিপ্লবের দীক্ষা নিয়ে আমি এসেছিলুম কলকাতায়, সে হচ্ছে ১৯০২ সালের বোধ হয় মাঝামাঝি বা শেষাশেষি। তার ছয় মাস আগে ঠিক ঐ গায়কোবাড়ের বরোদা থেকেই সেই একই গুপ্তসমিতির কাছে দীক্ষা নিয়ে যতীন-দা জাঁকিয়ে বসেছেন।'†

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের কথা লিখিতেছি। এই বছর অরবিন্দের গুপ্তসমিতির প্রথম পর্ব কলিকাতায় পুরাদমে চলিতেছে। যতীন্দ্র ও

*আত্মকথা, পৃঃ ১৮৪-১৮৫।

†বোমার কাহিনী, স্বদেশ, কার্তিক, ১৩৩৮।

বারীন্দ্রকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে ও শেষে পরপর গুপ্তসমিতির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া অরবিন্দই কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন এবং অরবিন্দ নিজেও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসমিতির কাজে দুইবার কলিকাতা আসিয়াছেন, মেদিনীপুরেও গিয়াছেন। এখন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নিবেদিতা এই গুপ্তসমিতিকে তাঁহার লাইব্রেরীর সমস্ত বই দিলেন এবং এই সমিতির যুবকদের পরামর্শদাতারূপে ইহাতে যোগদান করিলেন। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন :

'সিষ্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লব-কেন্দ্রটিকে তাঁর লাইব্রেরীর জাতীয়তা বিষয়ের প্রায় এক, দেড় শ' বই দিয়েছিলেন। কথা ছিল রাজনীতির স্কুল করে ইতিহাস, জীবনী ও ডিগবি, রমেশ দত্ত, নৌবজীআদির অর্থনীতির বই প্রভৃতি পড়িয়ে, এখানে প্রথমে কতকগুলি পলিটিকাল মিশনারী গড়া হবে এবং তারপব নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে তাদের পাঠিয়ে সমগ্র দেশ বিপ্লবের ছোটবড় মৌচাকে ছেয়ে দেওয়া হবে। আমি হলুম প্রথম ছাত্র এই বাজনৈতিক ক্লাসের। তাবপর জুটল এসে দেবব্রত, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন দত্ত, ইন্দ্র নন্দী—এই ধরনের অনেক মানুষ। আমি এসে সখারাম গণেশ দেউস্কর মশাইকে এই বিপ্লব-কেন্দ্রটির সহিত পরিচয় করিয়ে দিলুম। দেশে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেবার এমন একটা দল আছে শুনে এই শিবাজীভক্ত মহারাষ্ট্র-সন্তান তো আনন্দে অধীর। তিনি তখনই এসে যতীন-দার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে গেলেন এবং স্কুলের অর্থনীতির ক্লাসটির শিক্ষার ভার নিলেন।'*

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বেলুড় মঠের সহিত নিবেদিতার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল এবং তিনি কলিকাতায় অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতির প্রথম পর্বের সহিত, তাঁহার লাইব্রেরীর বইগুলি দিয়া পলিটিক্যাল মিশনারী গড়িবার মতলব আঁটিয়া, অরবিন্দের বৈপ্লবিক

* বোমার কাহিনী, স্বদেশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮।

কর্মে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিবেদিতার জীবন-ইতিহাসের পাতা উল্টাইতে গিয়া আমরা এই চরিত্রচিত্র চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

বারীন্দ্রকুমার অরবিন্দের কাছে দীক্ষা নিয়া কলিকাতায় নিবেদিতার কাছে আসিলেন। বারীন্দ্রের বয়স তখন ২৩ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। নিবেদিতা বারীন্দ্রকে বলিলেন, 'তোমার উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু তুমি কি তোমার দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে?' বারীন্দ্র বলিলেন, 'আপনি যদি 'জোয়ান অফ্ আর্ক্' হন, তবে আমরা আপনাকে নিশ্চয়ই অনুসরণ করিব। আপনার পশ্চাতে আমাদিগকে চলিতে আদেশ দিন।'

নিবেদিতা বাধাবিঘ্নের কথা উল্লেখ করেন, বলিলেন—'ইতালীতে যেমন Cavour এবং Mazzini ছিলেন, ভারতবর্ষেও সেইরূপ নেতা আছেন। ইঁহারা শুধু কোন এক বিশেষ দেশের নেতা নহেন। পরন্তু সমস্ত মানবজাতির নেতা। কিন্তু ইটালী যে উপায় অবলম্বনে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, ভারত তাহা পারিবে না। কেননা, ভারতের অবস্থা ইটালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।'…

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে দু'হাজার সভা করিয়া বাঙালী বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ জানাইয়াছে। ১৯০৫-এর প্রথমার্ধেও এইরূপ প্রতিবাদ চলিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ২০শে জুলাই বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া বিস্তৃতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলেন। বাঙালী জাতি চমকিয়া উঠিল। ইহার মাত্র ষোল দিন পর—১৯০৫, ৭ই আগস্ট—টাউন হলে বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিবার জন্য 'বয়কট' সভা হইল। লক্ষাধিক লোকের সমাগমে একটি সভা ভাঙিয়া তিনটি সভায় বিভক্ত হইল। ইতিহাসে লিখিবার মত ইহা একটি স্মরণীয় সভা। স্বদেশী আন্দোলন ১৯০৫, ৭ই আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত ধূমায়িত অবস্থায় ছিল। এই ৭ই আগস্ট

ইহা প্রজ্বলিত অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইল। এই প্রজ্বলিত অবস্থার পটভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতাকে আমরা রণ-রঙ্গিণী মূর্তিতে দেখিতে পাইব।

এই সময়ের কিছু পূর্ব হইতেই শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে গিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীমা বলিলেন যে, নিবেদিতাকে তিনি স্বপ্নে গেরুয়া-পরা আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই উভয় প্রস্তাবই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিবেদিতা বলিলেন যে, তাঁহার নূতন করিয়া গেরুয়া পরা হইবে না। কারণ স্বামীজীর নিকটে তিনি সন্ন্যাস পাইয়াছেন। তাহাই মানিয়া চলা তাঁহার কাছে উচ্চ ব্রত। স্বামীজী তাঁহাকে 'শিব, শিব, শিব' বলিয়া অক্লান্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে শিখাইয়াছেন। তিনি সেইরূপেই চলিবেন। উভয়ে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহাদের ভিতরে ঐ বিষয়ে আর আলোচনা হয় নাই।

এই ঘটনাটি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শেষের দিকে হইবে। এক নিবেদিতা ভিন্ন অপর কেহ শ্রীশ্রীমার কথায় অসম্মত হইতে পারিত না। নিবেদিতার গুরুভক্তি ও চরিত্রের দৃঢ়তা দুই-ই এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিতে প্রকাশ পাইল। তবে উভয়ে যে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, তাহা অনুমান হয় স্বামীজীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় উভয়েই ভাবাবেগে কিছুটা বিচলিত হইয়াছিলেন। নিবেদিতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনমনীয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন তাঁহাকে রাজনীতি ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, তখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি। এবং শ্রীশ্রীমা যখন তাঁহাকে গেরুয়া পরিয়া পুনরায় দীক্ষা নিতে বলিলেন, তখনও তাঁহাকে দেখিলাম। এই দেখার মধ্যেই নিবেদিতার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইল।...

লর্ড কার্জন [১৮৯৮, ৩০শে ডিসেম্বর—১৯০৫, ৭ই নভেম্বর] খুব জবরদস্ত বড়লাট ছিলেন। তিনি আমাদের দেশে সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শেষ কন্‌ভোকেশন বক্তৃতায় তিনি প্রাচ্য দেশবাসাদের উক্তিকে স্বভাবতঃই এবং সর্বদাই অতিরঞ্জিত এবং অত্যুক্তি-দোষে দুষ্ট বলিলেন। ইহা প্রাচ্য দেশবাসীদিগকে মিথ্যাবাদী বলার কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিল। পাশ্চাত্য দেশবাসী-দের সহিত তুলনা করিয়াই লর্ড কার্জন এইরূপ কথা বলিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রাচ্য-প্রীতিতে ভরপুর। এশিয়ার সভ্যতা বিশ্লেষণ করিয়া মিঃ ওকাকুরার 'আইডিয়ালস্ অফ্ দি ঈষ্ট', [১৯০৩] গ্রন্থের ভূমিকায় নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে সমগ্র এশিয়াখণ্ডের প্রত্যেক প্রদেশে একই জীবন স্পন্দিত হইতেছে। প্রাচীন মানবসভ্যতার প্রসূতি এশিয়া চিরদিন এক এবং অখণ্ড।

নিবেদিতা আরও লিখিয়াছেন যে (এবং সেইটি বড় কথা) ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়ার উদ্ভবকেন্দ্র, অর্থাৎ ভারতবর্ষই এশিয়ার সভ্যতার জন্মভূমি। ভারতবর্ষ হইতেই এই সভ্যতা জন্মলাভ করিয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা হইতে ইহা যেমন পৃথক তেমনই উন্নত।

ভগিনী নিবেদিতার এই সিদ্ধান্ত স্বদেশী যুগের রাজনীতি ক্ষেত্রে, এমন কি চিত্রশিল্পে পর্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছিল।

লর্ড কার্জনের দাম্ভিকতাপূর্ণ বক্তৃতা নিবেদিতার মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল তা সহজেই অনুমেয়। লর্ড কার্জনের বক্তৃতা নিবেদিতার নিকট অসহ্য বোধ হইল। তিনি সভা ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্যর গুরুদাস ব্যানার্জীকে জোর করিয়া ধরিয়া 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তে গেলেন। সেখানে লর্ড কার্জন লিখিত 'The Problems of the East' গ্রন্থ বাহির করিয়া দেখাইলেন যে লর্ড কার্জন নিজেই মিথ্যাবাদী। পরের দিন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ইহা তিনি

'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ছাপাইয়া দিয়া দেশের সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিলেন যে লর্ড কার্জন নিজেই কত বড় মিথ্যাবাদী। কর্তব্যকর্মে এই ক্ষিপ্রকারিতা ও নির্ভীক দুঃসাহসিকতা নিবেদিতা-চরিত্রেই সম্ভব। ইহা বঙ্গভঙ্গ-আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ছয়মাস পূর্বের ঘটনা।

ব্যাপারটা এইখানে থামিল না। রবীন্দ্রনাথ লর্ড কার্জনের চোখের সামনে দেখাইয়া দিলেন যে, বুয়র যুদ্ধে [১৮৯৫-১৯০২] ইংরেজ জাতি—বুয়রদের বিরুদ্ধে কিরূপ বেপরোয়াভাবে সকল প্রকার মিথ্যা কাহিনী প্রচার করিয়াছে।

সুরেন্দ্র ব্যানার্জীও তাঁহার আত্মজীবনীতে লর্ড কার্জন নিজে যে মিথ্যাবাদী তাহা প্রমাণ করিয়া এক চোট নিয়া তবে ছাড়িলেন।

এ সম্পর্কে সব চেয়ে বড় ঘটনা টাউন হলের প্রতিবাদ-সভা। এই সভায় ডঃ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি। তিনি বলিলেন প্রাচ্য দেশবাসীর ভাষণে যদি কিছু জমকাল ভাব থাকে, তবে লর্ড কার্জনের বক্তৃতাতে তো গ্রীকদেশীয় কমনীয়তা (Attic grace) কিছু দেখিতেছি না। লর্ড কার্জন পাঁচ বৎসরের সংক্ষিপ্ত ক্ষমতা হাতে পাইয়া Chancellor-এর গাউন পরিধান করিয়া অতিশয় নির্লজ্জ দাম্ভিকতার সহিত Convocation সভায় প্রাচ্যদেশের সত্যের আদর্শকে মিথ্যা আক্রমণ করিয়াছেন। যে প্রাচ্যদেশ শুধু বুদ্ধদেব ও মহম্মদকেই জন্ম দেয় নাই, পরন্তু যীশুখৃষ্টকেও জন্ম দিয়াছে। তাঁহারা আমাদিগকে পররাজ্যলোলুপতা শিক্ষা দেন নাই, পরন্তু কি করিয়া মানুষের মত বাঁচিতে হয় এবং মানুষের মত মরিতে হয় তাহা শিক্ষা দিয়াছেন।

লর্ড কার্জন ভাল করেন নাই। ইহা তাঁহার বিরুদ্ধে তৎকালে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ভগিনী নিবেদিতাই এই আন্দোলনের প্রবর্তক। এবং এইখানেই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব   ঊষা দেবী সরস্বতী

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জ্বলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

সুগভীর সাগরের আঁধারে হিমাচলের ন্যায় পুঞ্জীকৃত কজ্জ্বল ভরে পৃথিবীর ন্যায় বিশালায়ত পত্রে কল্পতরুশাখার লেখনী দ্বারা স্বয়ং সরস্বতী যাঁর গুণ বর্ণনা করতে পারেন না সেই ত্যাগীশ্রেষ্ঠ শংকর প্রতিম পুরুষোত্তম স্বামী বিবেকানন্দের পাদপদ্মে প্রণাম জানাই। কোটি কোটি প্রণাম।

ভারতবর্ষের বহুবিচিত্র সাধনধারার অপূর্ব সমন্বয় যেমন যুগাচার্য পরমহংসদেব—তেমনি তাঁর রিক্‌থভাগীরূপে স্বামী বিবেকানন্দ অলৌকিক তপস্যা ও অমানুষিক সংযম কঠোরতায় এমন এক মহাশক্তি লাভ করেছিলেন যাতে তিনি প্রাচ্যকে আপন অতীত প্রত্যক্ষ করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতকে অমৃতের বাণী শুনাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ স্বামিজীকে মর্ত্যকায়াতে দেখতে পাবো না কেউ। তিনি ধ্যানগম্য আমাদের। সেই মহাপুরুষকে দেখেছেন এমন লোকও আজ বিরল হয়ে আস্‌ছে ধীরে ধীরে।

আজ ভারতের গ্রামে-গ্রামে, তীর্থে-তীর্থে, নগরে-নগরে স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বজা উড়ছে। মানস-নেত্রে ভেসে উঠছে সেই অপূর্ব রূপ—'দাঁড়িয়ে আছেন এক সন্ন্যাসী, পাদপল্লব থেকে মুণ্ডিত মস্তক অবধি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেহ, করোদ্ধৃত চিরসঙ্গী যষ্টি, ঈষৎ পার্শ্বীকৃত উন্নতমুখ, উদার আঁখি সুদূর দিগন্তে বিলগ্ন—এরূপ কি শুধুই বিবেকানন্দের!'

'তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ-যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।'

মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন: 'পুরুষসিংহ, জগতের মহত্তম মহাকাব্যের নায়ক হইবার উপযুক্ত, তাঁহার চক্ষে জ্বলদর্চি, কণ্ঠে পাঞ্চজন্য'। আমেরিকাবাসী সে রূপ দেখে বলেছে: 'সাইক্লোনিক হিন্দু মঙ্ক'। আমরা ভারতবাসী বলি: 'মূর্ত মহেশ্বরমুজ্জ্বলভাস্কর'। অপরূপ বীরমূর্তি! 'ঐ সমুন্নত উষ্ণীষ, দীপ্তায়ত নয়ন, সুদৃঢ় চিবুক, বিশাল আনন, ঐ বিস্তৃত বক্ষ—বক্ষোপরি স্থাপিত যুগল বাহু—অমেয়দর্প ও মহিমার একি তুংগমূর্তি! বিশাল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে পিষ্ট করে দুই বাহুর বেষ্টনী, মুখ ঈষৎ শুচিকৃত, পদ্মনয়ন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, অধরোষ্ঠসন্নদ্ধ অথচ মেঘমন্দ্রিত হতে উন্মুখ।'

'Sinners? It is sin to call a man so; it is a standing libel on human nature. Come up, o lions, and shake off the delusion that you are sheep.'

'মহা spiritual tidal wave আস্‌ছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত।' যে পবিত্র যজ্ঞের বোধন করে গেলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, যাকে প্রজ্বলিত করে রাখলেন রামকৃষ্ণগতপ্রাণা জননী সারদামণি দেবী, আর সে পবিত্র হোমাগ্নির আহুতির জন্য অগ্রসর হয়ে এলেন সুদূর পাশ্চাত্যদেশ থেকে আইরিশ কন্যা মার্গারেট নোবল।

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'……

ধূপ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও রেখে যায় তার মধুর সুরভি, যে সুরভি বিমোহিত করে সমগ্র জগতকে। এ' সুরভি বাতাস বয়ে আনে না। এ' সুরভি পঞ্চভূতে তৈরী। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে এর

মিতালী—নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করে ধূপ রূপায়িত হয় সুরভিতে। ঠিক এমনিভাবে ভারতবর্ষের মাটিতে নিজেকে আহুতি দিয়ে মার্গারেট হয়েছিলেন 'নিবেদিতা'।

'বাংলার দিগ্বিজয়ী বীরপুত্র বিবেকানন্দের
পুণ্য অভিযান-জিতা সেবা-লক্ষ্মী,—মহাভারতের
আত্মার আত্মীয় তুমি। পশ্চিমের রাজসাদ্রি-চূড়ে
জন্মিয়াও তুমি তাই ছুটে এলে এই এত দূরে
হিন্দুভারতের পূতসিন্ধু মাঝে আত্মসমর্পণ
করিতে, গঙ্গোত্রী-গুহা-নিঃসারিত গঙ্গার মতন
মহীয়সী ভগ্নী নিবেদিতা,
……প্রীতিশ্রদ্ধাঞ্জলি লহ সুচরিতা।'

স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে একবার বলেছিলেন,

The mother's heart, the hero's will,
The sweetness of the southerns breeze,
The sacred charm and strength that dwell
On Aryan altars flaming free.
All these be yours, and many more
No ancient soul could dream before.
Be thou to India's future son
The Mother, Maid and Friend in one.

'মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়,
দখিনের সমীরণে যে মাধুরী বয়,
বীর্যময় পুণ্যকান্তি যে অনল জ্বলে
অবন্ধন শিখা মেলি আর বেদীতলে :
এসব তোমারই হ'ক আরো ইহা ছাড়া
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা।

অনাগত ভারতের যে-মহামানব,
সেবিকা বান্ধবী মাতা—তুমি তার সব।'

সত্যি সত্যি বিবেকানন্দের এ বাণী সার্থক হয়েছিলো। আয়র্ল্যাণ্ড-দুহিতা মার্গারেট ভারতবর্ষে এসে ভারতীয়দের সেবিকা, বান্ধবী ও মা-ই হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে বলেছিলেন: 'লোক-মাতা', ঋষি অরবিন্দ বলেছিলেন 'শিখাময়ী'। নিবেদিতা নিজেকে বলতেন:. 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'। শিশু বয়স থেকেই সত্যানুসন্ধানের অভীপ্সার অঙ্কুর দেখা দিয়েছিলো মার্গারেটের জীবনে। তাঁর ছেলেবেলার পরিবেশ ছিল অধ্যাত্ম-জীবন গড়ে ওঠারই অনুকূলে। ঠাকুরদা ধর্মযাজক ও বিপ্লবী। পিতাও হয়ে উঠলেন তাই। ২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭। শরতের এক সোনাঝরা প্রভাতে মায়ের বুকে এলো তাঁর প্রথম সন্তান। যন্ত্রণায় কাতর হয়েও মা আকুল কণ্ঠে দেবতাকে নিবেদন করলেন: 'ঠাকুর, আমার সন্তানকে তোমার পায়ে সঁপে দিলাম'। ঠাকুরমার নামে নাম মিলিয়ে মেয়ের নাম রাখা হলো মার্গারেট এলিজাবেথ। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে মার্গারেটের পিতা স্যামুয়েল পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন।

স্ত্রীকে শেষ সম্ভাষণ করতে গিয়ে তিনি বললেন: 'ভগবান যেদিন ওকে [মার্গারেটকে] ডাক দেবেন, সেদিন বাধা দিওনা যেন ......ও পাখা মেলবে দূরের আকাশে আমি জানি...ও এসেছে একটা বড়-কিছু করবার জন্য...', যেন প্রিয়তমা কন্যার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি দেখতে দেখতে হাসিমুখে স্যামুয়েল ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর এলো সাংসারিক বিপর্যয়। বিদ্যালয়ের জীবন শেষ করে ক্রমে শিক্ষয়িত্রীর জীবন গ্রহণ করলেন মার্গারেট নোবল। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার বৎসর। কেস্ উইকের বোর্ডিং স্কুল। কিন্তু একুশ বছর বয়সে আবার কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন—রেক্সহ্যামের সেকেণ্ডারী স্কুলে

শিক্ষিকার পদ। শুধু শিক্ষিকা নয়। মার্গারেট ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলেন রেক্সহ্যামের দরদী সমাজ-সেবিকা এবং বিভিন্ন কাগজে সামাজিক নিবন্ধরচয়িত্রীও।

কর্মক্ষেত্রের আবার পরিবর্তন। শিক্ষিকাই বটে, তবে এবার চেষ্টারে। আবার দু'বছর পরে লণ্ডনে। প্রথমে মিসেস ডি-লীউর নূতন ধরনের স্কুলে উইম্বল্‌ডনে। তারপরে উইম্বল্‌ডনের অপর অঞ্চলে নিজস্ব রাস্কিন স্কুলে। শিক্ষিকার কাজ ছাড়াও সমাজ ও সাহিত্য-সেবায় মগ্ন রইলেন মার্গারেট। সেণ্ট জেমস্ গেজেটের সম্পাদক আর ম্যাক্‌নীল ও মার্গারেটের চেষ্টায় গড়ে উঠলো বিখ্যাত সাহিত্য সমিতি 'সিসেম ক্লাব'। এখানেই গড়ে ওঠে ক্রমে তাঁর নীড়বাঁধা ও ভালবাসার স্বপ্ন। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ মার্গারেটের সুখের স্বপ্ন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল নিয়তির নিষ্ঠুর নিঃশব্দ আঘাতে।

ভগ্নহৃদয়ে গেলেন তিনি হ্যালিফ্যাক্সে বান্ধবী মিস কলিন্সের কাছে। তাঁর বুকে মাথা রেখে সব লজ্জা ভুলে মার্গারেট তাঁর নষ্ট নীড়ের জন্য শিশুর মতো আকুল হয়ে কাঁদলেন। তারপরে সপ্তাহ শেষে বান্ধবীর সান্ত্বনায় শান্তি ফিরে পেয়ে চলে এলেন তিনি পুনরায় লণ্ডনে। বান্ধবী বলেছিলেন: 'এই গভীর আঘাতে অন্তরে জ্যোতির উৎস খুলে যাবে, চিত্ত প্রশান্ত হলেই সে-দিব্যজ্যোতির অনির্বচনীয় প্রসাদ সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে তুমি'। এমনি সময়ে ঠিক স্বর্ণ মুহূর্তেই প্রথম সাক্ষাৎ স্বামী বিবেকানন্দের সংগে। দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, প্রসন্ন গাম্ভীর্যের একটা হিল্লোল তাঁকে ঘিরে—মার্গারেট মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন।

কত চমৎকার কথা বললেন তিনি। নিজের অনিচ্ছাতেও মার্গারেটের মন ভেসে চলে কোন অসীমে। তিনি অনুভব করেন একটা সুগভীর নিবিড় শান্তি, সংশয় বুদ্ধির অবিরাম দ্বন্দ্বের মাঝে মুহূর্তের বিরতি যেন। আর সেইসংগে মার্গারেটের হৃদয়ে একটা

প্রবল আলোড়ন জাগলো। মার্গারেটের জীবনের ধারা যেন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। অন্ধকারে যেন ফুটে উঠলো আলো।

'সাগরপারের জ্ঞাতি, শুভক্ষণে শ্রবণে তোমার
পশিল উদাত্তবাণী ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার।
আনন্দে বিস্ময়ে হলো বিকশিত চিত্তশতদল
বিবেক অরুণরাগে, ভোগ সুখ সম্ভোগ সকল
ধূলিসম ত্যাগ করি অকাতরে ছেড়ে পিতৃভূমি
আসিলে প্রাচীর বুকে, সুপবিত্র ত্যাগমূর্তি তুমি।
আত্মভোলা উপচিকীর্ষার
জীবন্ত প্রতিমাখানি—স্নেহ, দয়া, মমতা আধার।'

এই প্রথমদর্শন এবং তাঁর জীবনে তাঁর বিপ্লবী প্রভাবের কথা স্মরণ করে ১৯০৪ সালে মার্গারেট কোলকাতা থেকে লিখেছিলেন: 'মনে কর সে-সময় উনি যদি লণ্ডনে না আসতেন! এ' জীবনটাই তা'হলে একটা কন্ধকাটা স্বপ্ন হয়ে থাকত। কিন্তু আমি জানতাম কারও ডাক শুনতে পাবই। তার জন্য একটা নিরন্তর প্রতীক্ষা আমার ছিল, ডাক এল সত্যি। যদি অভিজ্ঞতা বেশী থাকত, হয়তো সংশয় হতো, জীবনে শুভলগ্ন এলেও মেনে নেওয়া হয়তো শক্ত হত। আমার ভাগ্য ভাল, আমি কিছুই জানতাম না। তাই দোটানার যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেয়ে গেছি।······ভিতরে আমার আগুন জ্বলতো, কিন্তু প্রকাশের ভাষা ছিল না।' এমন কতদিন হয়েছে, কলম হাতে নিয়ে বসেছি অন্তরের দাহকে রূপ দেব বলে—কিন্তু কথা জোটেনি। আর আজ আমার কথা বলে শেষ করতে পারি না। দুনিয়ায় আমি যেমন আমার ঠিক জায়গাটি খুঁজে পেয়েছি, দুনিয়াও তেমনি আমারই অপেক্ষায় তৈরী হয়ে বসেছিল যেন। এবার তীর এসে লেগেছে ধনুর ছিলায়।···কিন্তু যদি স্বামিজী না আসতেন আমার জীবনে? যদি হিমালয়-শিখরে ধ্যানে ডুবে থাকতেন? অন্ততঃ আমার কথা বলতে পারি···আমি তো এখানে আসতে

পারতাম না।' তাঁর জীবনে প্রদীপ্ত সূর্যের মতো যাঁর উদয় হয়েছিলো, সেই আচার্যের কাছে মার্গারেট চিরদিন তাঁর ঋণ স্বীকার করে এসেছেন।

ভারতের শাশ্বতবাণী তাঁর সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠলো। স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান জাগালো প্রাণে এক অপূর্ব আত্মত্যাগের উদ্দীপনা। কোন পরশমণির স্পর্শে মার্গারেটের জীবনে এলো এক অলৌকিক পরিবর্তন। মন যেন তাঁর বলে উঠলো,

'আমি কি এমতি রবো?
আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি,—
আমি কি ও পদ পাবো?'

যোগেশ্বরী ভৈরবী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলেছিলেন: 'তুমি অবতার।' 'চৈতন্যের আবির্ভাব নিতাইয়ের খোলে।' স্বামী বিবেকানন্দ সারা বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভৈরবীর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করিছিলেন। আর নিবেদিতা বিবেকানন্দের স্বরূপ জগতের সামনে অতি সুনিপুণ তুলিকাপাতে নিখুঁতভাবে রূপায়িত করে গিয়েছেন। নিবেদিতার চবিত্র চিত্রাঙ্কনে যে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা পাই আর কারোর কাছে তা পাই না। এখানেই নিবেদিতার বিশেষত্ব। এই বিদেশিনী বিদুষী আইরিশ-কন্যা বিবেকানন্দের যে রূপ আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তেমনটি আর কেউ পারেন নি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নারীশিষ্যা সম্ভবতঃ সামান্যই ছিল। যদিও তাঁর অনুরাগী ভক্তদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেটকে, নারী-শিষ্যারূপে গ্রহণ করে তাঁকে তাঁর পূর্বসংস্কার ভুলিয়ে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। একজন আইরিশ অসামান্য বিদুষী নারীর পক্ষে ভারতবর্ষে এসে একেবারে হিন্দু হয়ে যাওয়া সহজ কথা নহে। তখন ভারতবর্ষ অশিক্ষায়, অজ্ঞতায়, কুসংস্কারে জড়িত। বিশেষ করে

ভারতীয় নারীসমাজ স্বমর্যাদা থেকে দূরে সরে এসেছে। মার্গারেটের জীবনে নতুন সুর ধ্বনিত হলো। তিনি মহাপুরুষের সংগে ভারতে আসতে চাইলেন। স্বামিজী তাঁকে বোঝালেন ভারতের বিধিব্যবস্থার ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে। এই আদর্শ গ্রহণ করতে হলে অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট বরণ করতে হবে। তাঁকে অকারণে অনেক সময় লাঞ্ছিতও হতে হবে অজ্ঞ ভারতবাসীর কাছ থেকে।

মার্গারেটের চিত্তবীণায় ধ্বনিত হচ্ছে তখন সেই মহতী শাশ্বতী বেদবাণী—'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ'।

ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিতা নারী এলেন ভারতবর্ষে।

'এদেশের নারীশক্তি যবে
অজ্ঞতার অন্ধকারে মুখ ঢেকে কাঁদিত নীরবে,
তোমারি দরদী চিত্ত সমদুঃখে সমবেদনায়
উঠিল অধীর হয়ে……।'

কিন্তু শুধু ভারতবর্ষের সৌন্দর্য ও ধর্মের উৎকর্ষই কি তাঁকে এমন সুতীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিলো? না, শুধু তাই নয়। এ' সকলই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। কারণ এর আড়ালে ছিলেন তাঁর চির-আরাধ্য শক্তিমান গুরু বিবেকানন্দ। নিবেদিতা বিবেকানন্দের চোখ দিয়ে ও বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষকে—হিন্দুর সমষ্টিগত আদর্শকে দেখেছেন। বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী হিন্দুধর্ম, সভ্যতা, সমাজ ও পরিবার বিশেষতঃ বিবেকানন্দের অপূর্ব দেশপ্রেমের মর্মার্থ নিবেদিতা যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি করে অপর কোন শিষ্য তা' হৃদয়ংগম করতে পারেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিবেকানন্দকে গড়ে তুলেছিলেন, বিবেকানন্দও তেমনি নিবেদিতাকে তাঁর বিরাট চিন্তার ও কার্যের সহায়িকারূপে গড়ে তুলেছিলেন। ওঁদের দু'জনেরই দু'জনকে প্রয়োজন। আচার্যের প্রয়োজন শিষ্যাকে আপন আদর্শের উপযোগী করে গড়া, শিষ্যার প্রয়োজন তার বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভাকে এক লক্ষ্যে একাগ্র করে তোলা।

নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার আগেই বিবেকানন্দ তাঁকে তাঁর স্বদেশের কল্যাণময় কার্যের উপযোগী বলে বুঝতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলেছিলেন :

'I have plans for the women of my country in which you, I think, could be of great help to me.'

'I will stand by you unto death, whether you work for India or not, whether you give up Vedanta or remain in it. The tusks of the elephant come out but they never go back. Even so are the words of a man.'

—The Master as I saw Him.

স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র-চিন্তা স্বদেশপ্রেম নারীজাতির উন্নতির জন্য তাঁর আদর্শই শুধু নিবেদিতা পর্যবেক্ষণ করেন নি—তিনি স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিটি কথা ও প্রতিটি ভংগী নিরীক্ষণ করেছেন। তাঁর প্রতিটি আহ্বান কান পেতে শোনেন তিনি। তাঁর বুক দুলে ওঠে। অজস্র কথা ভিড় করে আসে মনের বেলাভূমিতে। বিবেকানন্দকে নিবেদিতা যে চোখ দিয়ে দেখেছিলেন ও যে রূপ উচ্চভাবে ও অনবদ্য ভাষায় তিনি সে ভাব প্রকাশ করেছেন তা' অতুলনীয়। নিবেদিতার ভেতর দিয়ে আমরা যে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখতে পাই তা' সম্পূর্ণ স্বামিজীর রূপ! সেভাবে না দেখলে আমাদের তাঁকে দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

ভারতবর্ষে আপনার সত্তাকে বিলিয়ে দিলেন নিবেদিতা। গ্রহণ করলেন তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে শত দুঃখ, শত গ্লানি আর শত বেদনা। 'ভারতবর্ষ' 'ভারতবর্ষ' মন্ত্র জপে কাটলো তাঁর দিনগুলো। ভারতীয় আদর্শে সঞ্জীবিত জীবনের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন তিনি। যে মহান্ ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করবেন তাপসী নিবেদিতা, তার জন্য প্রয়োজন প্রস্তুতি। গুরু উদাত্ত কণ্ঠে বললেন : 'ভারতের জন্য,

বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনী প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি হতে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্‌টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে।' স্বামী বিবেকানন্দ চান মুক্ত বিহংগীর মতো আকাশে পাখা মেলবেন নিবেদিতা। তিনি বললেন: 'তোমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে জ্বলন্ত উদ্দীপনা তোমার মাঝে থাকা প্রয়োজন তা' নেই। তাকে জাগাও, তাকে জ্বালাও! শিব! শিব!'

নিবেদিতার নিজের চেয়ে গুরু তাকে বেশী চিন্‌তেন। কোন্‌ ধাতুতে নিবেদিতার চিত্ত গড়া সে তাঁর জানা ছিল। সেজন্যই তো তিনি ধরা-বাঁধা উপাসনার দায় থেকে নিবেদিতাকে রেহাই দিতে চেয়েছিলেন। নিয়ে গেলেন তাঁকে তীর্থে। অতি বিচিত্র পুণ্যভূমি এ' ভারতবর্ষ! সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা, অসংখ্য নদ-নদী-বিধৌতা ভারতভূমি। ভারতমাতার চরণতলে অসীম-অতল মহাসাগর অধীর আবেগে যুগ-যুগান্ত ধরে প্রবাহিত হচ্ছে, আর ধ্যান-গম্ভীর শুভ্রতুষারাবৃত হিমগিরি যোগাসনে গভীর তপস্যায় আত্ম-সমাহিত। একাধারে সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলামনোহর মহাদেব যেন সতীদেহ-স্বরূপা ভারতবর্ষকে নিজের কোলে করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কি অপরূপ রূপ! এই অনন্তের অপূর্ব মহিমা উপলব্ধি করে নিবেদিতার হৃদয় ভরে উঠলো। তিনি প্রণাম নিবেদন করলেন:

'অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ বিভূতিভূষঙ্গ জটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥'

হিমালয়ের বিরাটত্বের স্পর্শে নিবেদিতা ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ দেখতে পেলেন। সেই গম্ভীর পরিবেশে তিনি শ্রীগুরুর মুখে শুনলেন

ভারতবর্ষের কত শত পুণ্য কাহিনী। নিবেদিতার সারা হৃদয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠলো অনির্বচনীয়ের মধুর সুর।

তিনি বুঝতে পারলেন স্বামিজী কেন তাঁকে এখানে এনেছেন—

'কর্মের কলরব ক্লান্ত,
কর তব অন্তর শান্ত।'

এই অন্তর্মুখীতাই হলো ভারতবর্ষের পরমসম্পদ। জীবনের কর্মমুখরিত দিনগুলোর ভেতরে এই অন্তর্মুখীতাই আনবে পরম আনন্দ আর চরম শান্তি।

নিবেদিতা অনুভব করলেন স্বামিজীর মনের ভাব—চিত্ত সমাহিত করলে তবেই কর্মে অধিকার জন্মে। নিবেদিতার মনপ্রাণ যেন এক অব্যক্ত আনন্দের অনুভূতিতে থর থর করে কাঁপতে থাকে। প্রকৃতির লীলানিকেতন সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ করে নিবেদিতা ফিরে এলেন —সংগে করে নিয়ে এলেন চিত্তসমাহিত করবার সম্পদ। কাজে নামবার আগে তিনি স্টেশন থেকে একলাই চলে এলেন বাগবাজারে সারদেশ্বরীর বাড়ীতে। মায়ের কাছে একটু আশ্রয় চান নিবেদিতা। 'ফল আর ছায়া দুই-ই দিতে পারে এমন বড় গাছের তলাতেই আশ্রয় নিতে হয়। ভাগ্যে যদি ফল না-ই জোটে, আমাদের ছায়া পাবাব আনন্দ কেড়ে নেবে কে?'

স্বামী বিবেকানন্দ এ'কথা মিষ্টার ষ্টার্ডিকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন। সারদা দেবীর পায়ের তলায় তপস্যা আর সাধনায় অন্তর্মুখ হয়ে নিবেদিতার দিন কাটতে লাগলো। শ্রীমায়ের সংগে নিবেদিতা একতনু একপ্রাণ হয়ে যেতেন। তাঁর প্রতিটি ভাবে ও ভংগিমায় মায়ের কাছে আত্মনিবেদনের আকুতি ফুটে উঠতো। একদিন সন্ধ্যাবেলা শ্রীমা আসন থেকে উঠতে যাচ্ছেন, নিবেদিতা এসে প্রণাম করলেন। দৃঢ়সংকল্পের আভা নিবেদিতার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। শ্রীমা অনেকক্ষণ ধরে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন: 'এবার তোমার কাজে নামবার সময়

হয়েছে…।' বোসপাড়া লেনের ষোল নম্বর বাড়ী। ভেতরটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে।

অজ্ঞাত, অখ্যাত স্থানে নিবেদিতা নির্বাচন করলেন আপন কর্মক্ষেত্র। অনাড়ম্বরের মাঝেই আছে প্রাণের স্পর্শ। অজ্ঞতা, মূর্খতা, দীনতা ও হীনতার মধ্যেই প্রকাশিত আছে সেই 'শান্তম্ শিবম্ সুন্দরম্।' অনাদৃত মানুষের মাঝেই খুঁজে নেবেন তিনি তাঁর চির-আরাধ্য দেবতাকে। কবির সুরে প্রতিধ্বনি তুলে আমরাও বলি—

'রুগ্ন বিপন্নের বন্ধু, করে নিলে পরকে আপন,
পরার্থে সঁপিলে নিজ চিত্ত দেহ, জীবন যৌবন।
দুঃসময়ে দুর্ভিক্ষে মারীতে
নগ্নপদে পথ চলি পীড়িতের ব্যথা নিবারিতে
যোগালে ঔষধ পথ্য,—নিত্য আত্মভাবনা রহিতা,
মানব মঙ্গলব্রতা হে মঙ্গলময়ী নিবেদিতা।'

স্বামিজী সাধারণের সংগে নিবেদিতার মেলামেশার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেন নি, বরং সাধারণের সহানুভূতি যাতে তার ওপর উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সে-ব্যবস্থাই করলেন তিনি। অনেকের সংগে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। মাসখানেক পরে তিনি বললেন: 'এখন তুমি সবার সংগে দেখা সাক্ষাৎ ছেড়ে অবরোধবাসিনী হও'। ভদ্রঘরের হিন্দু বিধবার মতো জীবন কাটানোর পরিবর্তে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নবীন মঠবাসীদের জন্য যে সমস্ত নিয়ম আছে, আপাতত স্বামিজী নিবেদিতার জন্য সেগুলোই নির্দিষ্ট করে দিলেন। উপদেশ তিনি অল্পই দিতেন। এমনি করে নিবেদিতার বাইরের জীবনটাকে তিনি পরিচালিত করবেন, আর বাকীটুকুর জন্য নিজের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে তাঁকে। বললেন: 'নিরাসক্ত দৃষ্টিতে নিজেকে দেখতে চেষ্টা কর, মনের সব রকম চাঞ্চল্য দূর কর, মুখের ভাব হোক নির্বিকার'।

স্বামিজী-নির্দিষ্ট এসব অনুশাসনে অভ্যস্থ হবার জন্যে নিবেদিতা সুদীর্ঘ সময় তাঁর নির্জন ঘরটিতে উপাসনা ধ্যান-ধারণাদিতে কাটাতেন। দেবতার সান্নিধ্য অনুভব করে তাঁর বুক গভীর আনন্দে ভরে ওঠে, আবার কখনও-বা কত সময় উদ্বেগ ও নৈরাশ্যে মন ছেয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন সময় এলো, যখন ধ্যানীচিত্তের বিরোধী সব চিন্তাকে নির্জিত করতে পারলেন নিবেদিতাঃ 'নিজেকে নিয়ে নির্জনে মৌনী থাকা যায় যদি, আত্মার অপৌরুষের মহিমার উপলব্ধি গভীর হয়। ব্যক্তিগত যত কিছু সঙ্কীর্ণতা আর বক্রতা, সবই যেন আপনা-আপনি সরল হয়ে মিলিয়ে যায়'।

ভারতীয় জনগণের সংস্পর্শে এসে নিবেদিতার অন্তরে জাগতো গভীর উচ্ছ্বাস। ভারতের মানুষ যেন তাঁরই আপনজন, এমন সুতীব্রভাবে তিনি এই অনুভূতি উপলব্ধি করতেন যে তাঁর যেন চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা হতোঃ 'ওগো পথিক, আমিও তোমাদের সবার আত্মীয়; যে-ধূলায় তোমরা ধূসর, আমারও দেহ দগ্ধ করছে সেই ধূলার তাপ, তোমাদের মত কঠিন শ্রমে আমারও আঙুল ফেটে রক্ত ঝরছে। ভিস্তিওয়ালা যে জল নিয়ে চলেছে তার ভারে আমারও পিঠ নুয়ে পড়ছে। তবুও আমি তোমাদের মাঝে থেকেই আনন্দে আছি। দেবতার মুখ চেয়ে জীবন কাটে তোমাদের। ওগো পথিক, আমাকেও অমনি করে ইষ্টের মুখপানে চেয়ে হাসতে শেখাও'।

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের
সেবাধর্ম রূপায়িত হলো তব পুণ্য জীবনের
প্রতি কর্মেঃ মর্মে মর্মে বুঝে নিলে বেদান্তের বাণী,
'যত জীব তত শিব'—গীতাপাঠে তুমিই কল্যাণি,
জানিতে পারিলে শুধু ত্যাগী আর ত্যাগের মহিমা,
ফলাকাঙ্খাহীন কর্মসাধনার কি যে মধুরিমা'!

নিবেদিতা এদেশে প্রথম মরণকে দেখলেন। গুরুকে তিনি বললেন। স্বামী বিবেকানন্দ মন দিয়ে শুনলেন। বললেনঃ 'এই জন্যই

শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে এসেছিলেন। তিনিই জোর গলায় বলে গেছেন, সকলের সংগে অন্তরের ভাষায় কথা কইতে হবে।······মার্গট, মরণকে ভালবাসতে শেখ, ভয়ঙ্করের পূজা কর! দেবতা যেন বৃত্তের মত। সব আঁধারেই তাঁর কেন্দ্র, কিন্তু পবিধি কোথাও নাই। মৃত্যু আর কিছুই নয়, কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রান্তরে স্থিতিমাত্র। জীবনে মরণ আর মবণে জীবনকে দেখতে শেখ। রুদ্রের অর্চনা কর; মার্গট'।

নৌকা করে নিবেদিতা বাগবাজারে ফিরে এলেন। মনে হল, মাঝির সামনে নৌকার গলুইতে মৃত্যুপতি যমকে দেখছেন তিনি। সাতরঙা-দিনের সূতোয় বোনা তাঁব বাজবেশ, ঐ তো বসে তিনি! এই-যে নিবেদিতার আশেপাশে অগণ্য জীবের মেলা, সবাই কি তবে ওঁর প্রজা? এই বিশ্বপ্রকৃতি, চন্দ্র-সূর্য, মানুষ, পশু-পাখি, তরুলতা, পৃথিবী সবই স্পন্দিত হচ্ছে এক প্রাণের স্পন্দনে। এরা যেন মৃত্যুকে ডেকে বলছে: 'হে যম, শুধু তুমিই পার আমাদের বাঁধন কাঁটতে'। আলো ঠিকবে পড়ছে নদীর জলে, কলকল তানে ঢেউয়েরা যেন গুরুর বাণীই আউড়ে চলেছে: 'মৃত্যুকে ভালবাস, মার্গট, রুদ্রের অর্চনা কর'। নিবেদিতা কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যে-প্রাণ সাধনায় রত, তার কোন অবসাদ নেই, শ্রান্তিও নেই।

নিবেদিতাব জীবনের কর্মমুখরিত অগণিত দিনগুলো. নির্জনে অপ্রশস্ত পল্লীব মধ্যে কেটে গেছে। প্রাণ ঢেলে বিদ্যালয় গড়ে তুললেন তিনি। কিন্তু দারুণ অর্থাভাব। অর্থ ভিক্ষাও সহজ নয়। সহজ না হলেও তা' সফল করতেই হবে। ভগিনী নিবেদিতা তখন একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের মধ্যে যে মহান পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখছেন, তা' দেশবাসীর পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব হয় নি। মনে পড়ে স্বামিজীর বাণী: 'মেয়েদের মধ্যে তুমি যে কাজ করবে সেও একটা কাজের মত কাজ। তাদের উদ্‌বুদ্ধ কর। ইউরোপীয় নারী কাপুরুষকে ঘৃণা করে, তারাই ওদের পৌরুষকে জাগিয়ে রেখেছে।

বাঙালীর মেয়েরা কবে তাদের মত পুরুষের দুর্বলতাকে নির্মম বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করবে ?'

'.........হে বিদুষী, মায়ের মায়ায়
বসুপাড়া নিজালয়ে বিদ্যালয় করিয়া স্থাপন
মূকমুখে ভাষা দিয়া জ্ঞানালোক ঢালিয়া আপন
পরের নিরাশ প্রাণে করিলে গো আশার সঞ্চার,
'নারী বিশ্বজননীর প্রতিচ্ছবি'—বুঝে নিলে সার।
'ধর্ম শুধু কথা নয়—কাজ'
এ' তত্ত্ব তোমারই মাঝে মূর্ত হয়ে করিবে বিরাজ'।

মানুষকে ভালবেসে তার সেবা করে নিবেদিতা বিরাট ত্যাগের অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছেন। সুযোগ বুঝে স্বামিজী এবার নতুন এক ত্যাগের মন্ত্র দিলেন তাঁকে। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলেন কর্মের কোন্ আদর্শ নিবেদিতাকে গ্রহণ করতে হবে। 'ভালবাসাকে ছাপিয়ে ওঠে যে কর্ম তাকে চিনে নাও। সৃষ্টির আনন্দে নির্ঝরিত স্রষ্টার যে-প্রেম, তাই তাঁর কর্ম'।

নিবেদিতা বললেন : 'স্বামিজী, আমি শেষের ব্রত দীক্ষা দিতে চাই'। স্বামিজী উত্তর দিলেন : 'শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার প্রতীক্ষায় আছেন'। এদিকে আত্মসচেতনতা যতই নিবেদিতাকে পরম গুরুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ততই তাঁর দিশারী যে-গুরু তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন।

সাধনালব্ধ শক্তি নিবেদিতাকে জীবসেবায় নিয়োজিত করতে হবে। সব বিষয়ে সচেতন থেকেও তিনি দীন হতে শিখেছেন। গুরুর হাতে তিনি খেলার পুতুল, তাঁর প্রতিটি কথা মেনে চলাই নিবেদিতার প্রধান কাজ। তিনি অপরিগ্রহ ব্রহ্মচর্য ও ব্রতনিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী হলেন। নিবেদিতা বন্ধু 'য়ুমের' (মিস্ ম্যাক্লয়েড) কাছে নিজের অন্তরের আকুলতাকে ছন্দে রূপ দিলেন,

'হে তেজঃস্বরূপ ! আমায় তেজ দাও !
তুমি শক্তিস্বরূপ, আমায় শক্তি দাও !
বজ্র-বীর্যে উদ্বোধিত কর আমায়,
জীবন-ব্রত পালন করবার শক্তি দাও'।

তারপর লিখলেন : 'মনে হয় দু'টি কারণে উনি আমায় নৈষ্ঠিকী ব্রহ্মচারিণী করলেন। প্রথমত, প্রাচীন প্রথাটা আবার চালু করতে চান। দ্বিতীয়ত, তাঁব দৃষ্টিতে এর চেয়ে বড় আর কিছু পাওয়ার জন্য প্রস্তুত নই আমি। এটা সত্য কথা। কখনও যদি এর পরের স্তরে যেতে হয়, তার জন্য সব রকমে নিজেকে প্রস্তুত করেই তাঁর কাছে আসব'। তাঁর অন্তর বলে উঠলো আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে—'তাঁর মহিমাই প্রকাশিত হবে আমাব মাঝে, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে'।

নিবেদিতা অনেকবার কল্পনা করেছেন স্কুলটি কিভাবে করবেন। স্বামিজীর কাছে পরামর্শ চাইতে গেলে তিনি একটু হেসে বললেন : 'তোমার কাজ তুমিই কর। শ্রীরামকৃষ্ণ যে পদ্ধতি দেখিয়ে গেছেন, তা' তো ভালই, এখন তাকে হাতে-কলমে খাটানোটাই হল আসল, কথা। তিনি খৃষ্টান, মুসলমান কি পারিয়ার সংগে খেয়েছেন, তাদের পোশাক পরেছেন, তাদের আচার পালন করেছেন। উদ্দেশ্য, যেন তাদের আত্মার আত্মীয় হতে পারেন। ছাত্রীদের কাছ থেকেই সব শিখতে পারবে। এর পরে—অনেকদিন পরে—পরস্পর মেলামেশা করতে করতে তোমার কাজ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের হাজাব খুঁটিনাটি হতে উপাদান সংগ্রহ করে বিদ্যাদানের সার্থক পথটি খুঁজে পাবে'।

নিবেদিতা শিক্ষাদাত্রী হলেন। দীর্ঘকাল পুঞ্জীভূত সংস্কারে জড়িত সুপ্ত আনন্দময়ের সত্তাকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করলেন ভগিনী নিবেদিতা। সেই উদ্দেশ্যে এক অভিনব উপায় উদ্‌ভাবন করলেন তিনি। ভারতের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস বলে যেতে লাগলেন মেয়েদের কাছে। গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, পদ্মিনী, রাণী

ভবানী, গান্ধারী, অহল্যা, সংঘমিত্রার অপরূপ জীবনকাহিনী তাদের মনের নিভৃত কন্দরে ছড়িয়ে পড়লো। সোনর কাঠির স্পর্শে যেন ভারত-নারীর সুপ্ত অন্তরাত্মা জাগরিত হয়ে উঠলো। হৃদয়ের সবটুকু অনুভূতি ও দরদ উজাড় করে নিবেদিতা সে-সব পুণ্য-গাঁথা বলতেন আর নিজেও এক গভীর ভাবরাজ্যে বিভোর হয়ে যেতেন।

ভগিনী নিবেদিতা সকলের মনেই আলোড়ন তুললেন। দেশে তখন ধর্মের বিভিন্ন মতামত নিয়ে বিরুদ্ধতা জেগেছিলো। ব্রাহ্ম-সমাজীরা ভাবতেন, এদেশের জনসাধারণ স্থূল পূজার্চনা করে, তাদের আধ্যাত্মিক গতি মন্থর। এর তুলনায় ব্রাহ্মসমাজে শুদ্ধচিত্তে উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক সাধনার চরমকথা বলা চলে। কিন্তু নিবেদিতা গুরুর দিকে রইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন ঃ 'একটা জাতিকে বুঝতে হলে তার সবকিছু গ্রহণ করতে হবে। ভারতবর্ষ পৌত্তলিক ? সে যা তা-ই থাক, আমাদের কাজ শুধু তাকে সাহায্য করা'। স্বামিজীর যুক্তিকে নিবেদিতা সমর্থন করতেন। দেবতার সান্নিধ্যলাভের জন্য জনসাধারণের প্রাণের সুগভীর আকুলতা দেখে তাঁর মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠতো। তিনিও দেবতার পায়ে মাথা নত করে বলেন ঃ 'হে দেবতা, তুমি দুর্জ্ঞেয়। তোমার যতটুকু বুঝেছি, যা পেয়েছি হাতের মুঠোয়, তারই অর্চনা করি। অপূর্ণ মানুষ আমি, এর বেশী আর কী করতে পারি ?'

অধ্যাত্মজীবনে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিবেদিতা নিবেদন করে দিয়েছিলেন গুরুর কাছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ছিল তাঁর আশ্চর্য স্বচ্ছ ও শাণিত বিচারবুদ্ধি। তাঁর অন্তরের ভক্তি-বিশ্বাসের ধারাটি উচ্ছল। নিবেদিতা মনে মনে ভাবেন ঃ 'নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো বয়ে চলেছে এ-জিনিস, এক খাত হতে অন্য খাতে বয়ে যাচ্ছে, নির্ঝরের তুষার শীতল প্রবাহ। সে-প্রবাহিণীতে সকল পাত্রই পূর্ণ করা চলে, তা' সে স্ফটিকেরই হোক আর মাটিরই হোক। তারপর অমূল্য সম্পদের মতো আপন ঘরে বয়ে আনা তাকে। অরুণরাগে

যেমন করে ফুল পাপ্ড়ি মেলে তেমনি করে হৃদ্পদ্ম ফুটে ওঠে গুরুর ছোঁয়ায়…’।

ব্রাহ্মসমাজের একটি লোককে দেখে নিবেদিতার মন আকৃষ্ট হয়েছিলো। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি সত্যান্বেষী। জগদীশচন্দ্র বসু আর নিবেদিতার জীবনব্যাপী সৌহার্দ্য একটা আশ্চর্য জিনিস! দু’জনেই যাঁর যাঁর আদর্শ রক্ষা করে চলেছেন।

ধ্যানের নিভৃত প্রদেশে তলিয়ে নিবেদিতা নিজেকে চিরে-চিরে দেখেছেন। মায়েব কাছে যাবার কথা ইংগিতে বলেন গুরু। কিন্তু কোথায় সেই পথ? স্বামিজী শুধু বলেন: ‘নিজেকে সঁপে দাও তাঁর কাছে’।

সত্যি স্বামী বিবেকানন্দ জীবন-মরণ-সমস্যার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন নিবেদিতাকে। তিনি শুধু আপন সত্তার গভীরে উপলব্ধি করতে চান একটিমাত্র জিনিস—তাঁর প্রাণস্পন্দন। নিজেকে বিলোপ করে আকুল হয়ে ডাকেন মাকে: ‘জয় মা কালী, জয় মা কালী’—এই তাঁর মন্ত্র। ধ্যান করতে গিয়ে নিবেদিতার মন পূর্ণতায় ভরে ওঠে। বলেন: ‘মা, মা, আমি তোমার দাসী, তোমায় তুষ্ট করবার মতো কিছুই জানি না। প্রাণ ঢেলে শুধু তোমায় ভালবাসি’।

স্বামিজীর সব ভাবনাই সব উপদেশই নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে ঘুরতো। গুরুর উপদেশ শুনতে নিবেদিতা ভাবেন: ‘আমি তো মুক্ত, আমার সংকল্প নেই, বাসনা নেই……’। সংগে সংগে আতংকে শিউরে উঠতেন নিবেদিতা: ‘একলা এগিয়ে যাবার শক্তি আমার আছে কি?’ একমাত্র ভাই মৃত্যুশয্যায়—খবর পেয়ে মিস্ ম্যাক্লয়েড গেছেন ক্যালিফর্ণিয়ায়। তাঁকে লেখা নিবেদিতার একখানা চিঠি থেকে বোঝা যায়, এই সময় স্বামিজী তাঁর মধ্যে কিভাবে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। ‘সকালে নীচে নেমে এলাম! স্বামিজী ঘণ্টা দেড়েক পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করতে করতে

তথাকথিত ভদ্রতা সম্বন্ধে আমায় সতর্ক করে দিতে লাগলেন। 'কী মিষ্টি, কী সুন্দর'—এসব বাঁধি গৎ চলবে না, আর অনবরত এই বাইরের দিকে নজর। ভাবুকতা ছেড়ে নিজেকে জানো। নিজেকে যখন জানতে পারবে, তখন আকাশ হতে বজ্রের মতো ভেঙে পড়বে দুনিয়ার উপরে। যারা বলে 'আমার কথা কি কেউ শুনবে?' তাদের উপর আমার কোন আস্থা নাই। কিছু বলবার মত পুঁজি যার আছে তার কথা না শুনে ফিরিয়ে দিতে দুনিয়া এপর্যন্ত পারে নি। নিজের শক্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। এ'করতে পারবে? পারবে তুমি? যদি না পার তো হিমালয়ের শিখরে গিয়ে শিখে এস'। বলেই শংকরাচার্যের মোহমুদ্গর আবৃত্তি করে চললেন, তার শেষে চর্পট পঞ্জরিকার সেই ধুয়া: 'ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে'! কখনও-বা তাকে পাল্টে করেন: 'মার্গট, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে'!

স্বামিজী গম্ভীরকণ্ঠে নিবেদিতাকে সতর্কবাণীও বলেন: "এখন বুঝেছ, শিবই পরম গুরু। জ্ঞানবৃক্ষের মূলে যোগারূঢ় হয়ে তিনি শিক্ষা দেন, অজ্ঞান্ নাশ করেন। তাঁকেই সব কর্ম সমর্পণ করতে হবে। নইলে সুকৃতিও বন্ধন হয়ে ওঠে, তা' হতেও কর্মের সৃষ্টি হয়। নিত্যবুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পুরুষই শিব। জগতের হলাহল পান করেন বলে তিনি নীলকণ্ঠ। অনায়াসে কালকূট জীর্ণ করেন এমন মহাপ্রাণ শুধু তিনিই।......জীবনের তারুণ্যকে উৎসর্গ করা কী যে কঠিন! বৃদ্ধবয়সে আত্মত্যাগ করতে আসে যারা তারা নিজেদের মুক্তির পথ সাফ করে বটে, কিন্তু অন্যের গুরু হতে পারে না। যৌবন-মধ্যাহ্নে যে নিজের জীবন ডালি দিতে পারে সে-ই ধন্য, সে-ই তো সদ্গুরু'।

নিউইয়র্কে যাবার আগে, স্বামী বিবেকানন্দের আনন্দঘন প্রশান্ত মূর্তি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। দু'বাহু প্রসারিত করে তিনি বললেন: 'আমার সন্তান তোমরা, আমি এসেছি, এই যে আমি...'। নিবেদিতা মিস্ ম্যাকলয়েডকে একটি চিঠিতে এই দৃশ্যটি বর্ণনা করে

লিখেছেন: 'সুতী পোশাকটা আলখাল্লা উড়ানির মত করে ধীরামাতার কোমরে জড়িয়ে দিয়ে বললেন: 'আজ থেকে তুমি সন্ন্যাসিনী'। তারপর আমাদের দু'জনের মাথায় হাত রেখে বললেন: 'পরমহংসদেব আমায় যা-কিছু দিয়েছিলেন সবই তোমাদের দিয়ে দিলাম। একটি নারীর কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তা' তোমাদেব দু'জনকেই দিলাম—দিলাম নারীকেই। এ নিয়ে যা' পাব কব…'। গুরুকে প্রণাম করতেই তিনি নিবেদিতাব মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। এই পবমমুহূর্তে নিবেদিতা নিজের গভীরে অনুভব করলেন তারায় তারায় আলোর কম্পনের মতো একটা সর্বব্যাপী বিবাট শক্তির স্পন্দন। তখন তাঁর মনে হচ্ছিলো, যেন তাঁর মাথার উপরে বীর সন্ন্যাসীব উষ্ণস্পর্শ আব তাঁর হাতখানা হতে যেন শক্তির বিদ্যুৎস্ফুরণ হচ্ছে।

সম্পূর্ণ চেতনা নিয়েই নিবেদিতা জীবনের চরম ব্রত গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা শুধু গুরুর বাণীই মনে মনে আবৃত্তি করেন: 'মনে রেখো, তুমি শুধু মায়েব দাসী'।

তিনি পাশ্চাত্য দেশে ঘুরে ঘুরে বললেন শান্তির বাণী। একটা নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিবেদিতা মনে মনে ভাবেন: "এই যে কাজ করছি এর মধ্যে ফলাকাঙ্ক্ষা কতখানি ঢুকেছে? ভারতের মেয়েদেব জন্য যে ভিক্ষা করছি তা' কি সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবেই করছি? মাগো! শুধু সেবা করবার আনন্দেই যেন যুগের পর যুগ সেবা করে যেন যেতে পারি'।

এই-ই ছিল নিবেদিতার অন্তরের প্রার্থনা। স্বামিজী বললেন: '…অন্তরের অন্তস্তলে ডুবে যাও। সংস্কারের সকল ছাঁচ ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে, তবেই না কূল ছাপিয়ে ছুটবে আলোর নির্ঝর। তখনই তোমার সব আয়োজন পূর্ণ হবে। যে পাঁকের ছোঁওয়ায় আজ তোমার হাতে দাগ লাগে, তখন তাই দিয়ে গড়বে প্রতিমা, তাতে সঞ্চার করবে মুক্ত প্রাণের আনন্দ। বস্তুকে দাম দিও না। তুমি

শুধু অবিশ্রাম সৃষ্টি করে চল।' মন্ত্রমুগ্ধের মতো শতবার মনে মনে উচ্চারণ করেন নিবেদিতা: 'তুমি কেবলই সৃষ্টি করে যাবে—।' মিস্ ম্যাকলয়েডকে নিবেদিতা লেখেন: 'স্বামিজী যে আঘাতে আমায় ছিটকে দিয়েছেন তা' আমার পাওনা বটে···ও একরকম ভালই হয়েছে।' 'ভাবীযুগের হিন্দুনারীর স্বপ্ন দেখছেন তিনি। তাদের জন্য আর তাঁর জন্যই আমায় বেঁচে থাকতে হবে, এছাড়া আর কোনও অবলম্বন আমার নাই···।' মিসেস্ বুলকে লেখেন: 'মানুষের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হ'লো জ্ঞান লাভ করা। জানতে চাই। বৃহৎ কেউ আছে। এমন কারও সন্ধান চাই যিনি সকল দুর্বলতার উর্ধ্বে। তিনি সত্যস্বরূপ। তাঁর খবর জানি না, এ খুবই ঠিক কথা। স্বামিজী অলৌকিক উপায়ে সে জ্ঞান যদি আমাতে সঞ্চারিত না করেন তা'হলে নিজে থেকে তার নাগাল পাব এমন আশাও রাখি না। এখন এইখানে এসে ঠেকেছি। শুধু বাইরের দুনিয়া আর তিনি, আর সবকিছু তিক্ত চিত্তে সয়ে যাওয়া। যা চাই তা' কি দেবেন তিনি? দেবেন কি? হায়রে···আজ চুপি চুপি বলি তোমায়, দিতে তিনি পারবেন না। এর আগে ওঁকে চেষ্টা করতে দেখেছি আমি। সত্যকে লাভ করেছেন তিনি, দেওয়ার শক্তিও রাখেন। কিন্তু আমার নিজেরও কিছু করবার আছে। অথচ সে সাধ্য আমার নাই, সত্যি নাই। এমন চাওয়া কি জেগেছে যার জন্য হেন জিনিস নাই যা'ছাড়া না যায়? নিজের ভাবনা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর বাসনা-লালসা একি কেউ ছাড়তে পারে?'

নানা প্রশ্নের সংঘাতে নিবেদিতার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। নিজের উপর ধিক্কারে তাঁর চোখে জল আসে। নিবেদিতা ভাবেন: 'মুক্তা তুলে আনতে পারব কি?···কোথায় সেই শুভ্র-শুচি অজানা রত্নের ঝলক? মুক্তা যদি খুঁজে পাই, নিয়ে যাব দক্ষিণেশ্বরে, মায়ের পায়ে অর্ঘ্য দেব।' স্বামিজী নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করে বললেন: '···শক্তিধর পুরুষ কর্মী তৈরি করে দূরে সরে যান,—এই নিয়ম। কারণ, তিনি কাছে থাকলে তারা পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারে না।

আমিও এখন তোমার কেউ নই। আমার যা' শক্তি ছিল তা' তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। আমি এখন শুধু সন্ন্যাসী। এক শ্রেণীর মুসলমান আছে, তারা এমন ধর্মান্ধ যে শিশু জন্মাতেই তাকে বাইরে ফেলে রেখে বলে: 'ভগবান যদি তোকে বানিয়ে থাকেন তো মর, আর আলি যদি তোকে প্রাণ দিয়ে থাকেন তো বাঁচ।' নব-জাতককে তারা যা' বলে, আমিও আজ রাত্রে তোমায় তাই বলছি—অবশ্য উল্‌টো করে। যাও, জগতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়। আমি যদি তোমায় গড়ে থাকি, তুমি টিঁকবে না। আর মা যদি তোমায় গড়ে থাকেন, অমৃতা হবে।'

কম্পিত হৃদয়ে নিবেদিতা মনে মনে বলেন: 'আমি চললাম। গুরু আমার! রাজা আমার! পিতা আমার! তোমার জয় হোক। তোমার করুণার তোমার মহিমার পারাপার দেখি না দেবতা। এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে হাত রেখেছেন আমার মাথায়।'

বন্ধুদের কাউকে না জানিয়ে নিবেদিতা লণ্ডন থেকে ভারতের পথে রওনা হলেন। স্বামিজীর অসুস্থতার খবর পেয়েছেন তিনি। নিবেদিতার ভারতে প্রত্যাবর্তন স্বামিজীর পক্ষে এক বিজয় গৌরব যেন। স্বেচ্ছায় ও মেয়ে ভারতের জন্য কাজ করতে এসেছে। ওর স্বচ্ছ দৃষ্টির আলো কী যে ভালো লাগে! সত্য-স্বরূপকে আপন অন্তরে খুঁজে পেয়েছেন নিবেদিতা। বিবেকানন্দ তাঁকে দেখেন নিবেদিতার দৃষ্টিচ্ছায়ায়। তাই তিনি আসতেই নিজের পাশে সসম্মানে তাঁকে ঠাঁই দেন।

তীর্থভ্রমণ করে বিবেকানন্দ ফিরে এলেন ভাঙা শরীর নিয়ে। সকলেই বুঝলেন দিন ঘনিয়ে এসেছে। স্বামিজী নিবেদিতাকে লিখেছিলেন: 'স্নেহের নিবেদিতা, অফুরন্ত শক্তির আঁধার হও। স্বয়ং জগদম্বা তোমার দেহ-মনে আবিষ্ট হোন। তোমার মাঝে চাই দুর্নিবার বিপুলশক্তির উদ্বোধন। আর সেই সঙ্গে অসীম শান্তিও। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি সত্যের ঠাকুর হন, আমায় যেমন তিনি চালিয়ে

নিয়েছেন, তেমনি করে তোমায়ও চালিয়ে নিন···না, তার চাইতেও হাজার গুণে সার্থক করুন তোমায়।'

বুধবার। একাদশী। নিবেদিতা ব্যাকুল হৃদয়ে গুরুকে দেখতে এলেন। তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা গুরুর চরণে লুটিয়ে পড়লো। স্বামিজী নিবেদিতার যাওয়ার পরে তাঁব হাত ধুইয়ে দিলেন। পরিপূর্ণ অমৃতেব ঘট বহন করে নিবেদিতা ফিরে এলেন। সকালে একজন সাধু স্বামিজীর তৈরী পাঁউরুটি নিয়ে এলেন নিবেদিতার কাছে। তিনি লক্ষ্য করলেন, রুটি খানিকটা। 'এ যে প্রসাদ! গুরু তাঁকে ভাগ করে দিচ্ছেন ঠাকুরভোগের।' রুটিখানি অসীম শ্রদ্ধাভরে কপালে ছুঁইয়ে নিবেদিতা মনে মনে বলেন: 'স্বামিজীর মানস-কন্যা হয়ে আজ ধন্য আমি।'

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই—স্বাম। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ-তিথি। চিতার আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। শেষ পর্যন্ত নিবেদিতা বসে থাকেন: 'ঠাকুর, এ-জীবনেব সব কাজে নিয়ত যেন তোমারই অন্তরের কামনাকে রূপ দিতে পারে, আমার নয়। হর! হর! শিব! শিব! * * ···তাঁর কর্ম-গৌরবের প্রমাণ দেওয়াব জন্য একজন কারও বেঁচে থাকা দরকার। তাঁর বোঝা তাঁরই হয়ে বইতে চাই আমি, আর কিছু চাই না। যদি নিয়তির বিপাকে পথভ্রষ্টও হই, তুমি তো জান, আমি তোমারই থাকতে চেয়েছি চিরকাল······'। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো পৃথিবীতে। সন্ধ্যা-বন্দনার মন্ত্রধ্বনি উঠলো চারদিকে।

নিবেদিতা উঠলেন। বললেন: 'সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা উপাসনা করছেন, কিন্তু আমার সময় কই! আমায় বিশ্বাস করে একটা ব্রতের ভার দিয়ে গেছেন তিনি। আমার কেবল কাজ করা আর দেখে যাওয়া···প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

স্বামিজীর মহাপ্রয়াণে নিবেদিতা নিজেকে হারিয়ে ফেললেন না। বিরাট কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। গুরু যে শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিলেন তাঁকে, তার সত্যিকার মূল্য উপলব্ধি করলেন।

স্বামিজী তাঁকে কর্ম-যোগিনী করে গড়ে তুলেছিলেন। প্রথমে ব্যক্তিত্বের অহংটাকে ত্যাগ করতে শিখিয়েছিলেন গুরু। তারপর বাধ্য করেছেন আত্মসমর্পণে। সকলের শেষে দিয়েছেন পরিপূর্ণ জিতাত্মার আদর্শ ও আত্ম-কর্তৃত্বের সাধনা। এখন নিবেদিতা একা নিজের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে অনুভব করেন, কেন তাঁকে গড়ে তুলতে স্বামিজী এত আয়াস স্বীকার করেছিলেন। এই ভারতবর্ষের মধ্যেই নিবেদিতা তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত-দীক্ষার শান্তি খুঁজে পেলেন।

নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্য, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে ছিল এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। জাতির মধ্যে তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে নতুন প্রাণ সঞ্জীবিত করলেন। দৈহিক ও মানসিক কষ্টের মধ্যেও তিনি দিনের পর দিন গ্রন্থ রচনা করেছেন। পরাধীনতার গ্লানি দূর করবার জন্য যখন দেশের তরুণদের বুকে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিলো, তখন তিনি সব দুর্দশা সহ্য করে তরুণদের প্রাণে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন।

এদিকে ভগিনী নিবেদিতার দেহ ক্ষীণ হয়ে এলো। তিনি এলেন শৈল-শিখরে। কর্মক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম দেওয়াই ছিল তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। কিন্তু মহাকালের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ।

তপস্যা সাঙ্গ হয়েছে। শিব-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। এখানেই পূর্ণবিরতি। অন্তরে অনন্ত শান্তি নিয়ে শুভ্র তুষারের কোলে মিলিয়ে গেলেন মহাশ্বেতা ভগিনী নিবেদিতা—

······'হে ব্রহ্মবাদিনি !
অমৃত-আস্বাদ-ধন্যা অমরাত্মা মৃত্যুবিজয়িনী।
তোমারে স্মরণ করে আজও সারা ভারতবাসীর
অন্তর পবিত্র হয়, শ্রদ্ধাভরে নত হয় শির'।

ভগিনী নিবেদিতার ভারতপ্রীতি এবং ভারতের বেদীতে আত্মবলিদান যুগ যুগান্তর ধরে মানব হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'তিনি যখন 'our people' বলিতেন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি লাগে না।' মিঃ র‍্যাটক্লিফ ভগিনীর প্রবন্ধাবলীর সঙ্কলন 'Religion & Dharma' পুস্তকের ভূমিকাতে অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—প্রবন্ধগুলিতে ভগিনীর 'আমরা' এবং 'আমাদের' শব্দ প্রয়োগ পাঠক মাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন ভারত এবং ভারতীয় ভাবের সহিত নিবেদিতা কিভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন বোধ করতেন।

নিবেদিতার ভারত-প্রেমের মূল প্রেরণা তাঁর গুরু বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন। কি সেই জীবন-দর্শন এবং কিভাবে তা নিবেদিতা-চরিত্র-রূপায়ণে সাহায্য করেছে তাই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

মনীষী ঈঙ্গারসোল একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন—'আপনার ধর্ম কি, আপনার দেশ কি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'সমগ্র বিশ্ব আমার দেশ, সত্য আমার ধর্ম'। এহেন সত্যব্রতী বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রেমকে যে গতানুগতিক স্বদেশ প্রেমের সমপর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না তা সহজেই অনুমেয়। সন্ন্যাসীর 'দেশ' এবং 'ধর্ম' বিরাট ও ব্যাপক। একমাত্র আধ্যাত্মিকতার পরিপ্রেক্ষিতে তার সম্যক অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব।

নিবেদিতা ছিলেন সন্ন্যাসিনী। নিঃশেষে নিজেকে বলি দেবার নাম সন্ন্যাস। সে আক্ষরিক অর্থের সার্থক উপমাস্থল নিবেদিতা-চরিত্র। 'আমি'ত্ব শূন্য সন্ন্যাসিনীর 'আমরা', 'আমাদের' প্রয়োগ যে

ভৌগোলিক সীমায়িত ভূমিখণ্ডে আবদ্ধ থাকতে পারে না তা বলা বাহুল্য। ভারত, আর্য ঋষিগণের আত্ম-উপলব্ধি-গবেষণাগার, সর্বজনীন সনাতন ধর্মের শাশ্বত প্রকাশভূমি। যথার্থ সত্যসন্ধিৎসু, যথার্থ আত্মসাক্ষাৎকার-লাভেচ্ছু এর মহিমা উপলব্ধি করে আবহমান কাল সপ্রেম শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করবে—এ অতি সত্য কথা। তথাপি যে নিবেদিতা অতি অনায়াসে স্বীয় গুণমুগ্ধ অনুগামীদের পুরোভাগে নেত্রীপদলাভ করতে পারতেন তিনি কেন সেবিকার ভাবে আত্মনিবেদন করে গেলেন, কেন 'নিজেকেই ফল-পুষ্পে বিকশিত করিবার জন্য নহে' অন্যান্যগুলির সাররূপে ব্যবহৃত হবার জন্য 'সর্ব প্রচেষ্টা সাধন করে গেলেন তা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য।'

সুদূর অতীতের একখানা অনবদ্য চিত্র আমাদের মানস নয়নে ভেসে আসে—রাজকুমার সিদ্ধার্থ দীর্ঘ তপস্যান্তে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণান্তে সশিষ্য বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুর পথে সমাগত। সংবাদ শুনে পিতা শুদ্ধোদন আনন্দোৎফুল্ল। পুত্রকে রাজসমারোহে বরণ করার জন্য বিপুল আয়োজন—হস্তী, অশ্ব, রথ, সৈন্য সামন্ত নগরের প্রবেশদ্বারে সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান। কিন্তু বাহ্য সমারোহের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, কাষায়বস্ত্র পরিহিত বুদ্ধদেব, নগ্নপদে এগিয়ে চলেছেন—হস্তে ভিক্ষাপাত্র, বদনে প্রশান্তি। পুত্রসমীপে ত্বরান্বিত হয়ে রাজা স্মরণ করিয়ে দেন, 'বৎস! কেন এ ভিখারীর বেশ! তোমার বংশের মর্যাদা অনুসারে রথারোহণে রাজসমারোহে নগরে প্রবেশ কর।' তথাগতের সুমধুর সুস্পষ্ট দৃঢ়তাব্যঞ্জক উত্তর এল—'আমাদের বংশের এই রীতি।' পিতাকে জানিয়ে দিলেন তিনি সমস্ত জাগতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করেছেন। বুদ্ধ-বংশের, সচ্চিদানন্দ-বার্তাবহদের এই ধারা। সে বংশের রীতিমাত্র তিনি অনুসরণ করে চলেছেন।

মানবের অন্তরে সুপ্ত চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, আত্মবিস্মৃতি

অপনয়নপূর্বক দেবত্ব-প্রকাশ-সাধন মানসে, হৃদয়ে হৃদয়ে ত্রি-তাপাতীত সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্-এর প্রতিষ্ঠা কামনায় 'মানব দুয়ারে দেবতা ভিখারী'—, যুগ যুগ ধরে এ লীলা অভিনীত হয়ে আসছে। সে ভিখারীর মূল্যায়নে স্বল্প লোকই সমর্থ। যাচ্ঞার আবরণে আবরিত পরমদানের আকৃতি মুষ্টিমেয় লোকের অন্তর স্পর্শ করে থাকে। সে মহাভিক্ষুদের, সে 'বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ' পথচারীদের দ্বারে দ্বারে করাঘাত, আত্মতৃপ্ত আত্মারাম যোগীদের ভিখারীর সাজে ভ্রমণ কোন মহান্ উদ্দেশ্যে সাধিত—ক'জন তার অর্থ অনুধাবনে সমর্থ, ক'জনই বা এর অর্থ গ্রহণে সচেষ্ট। সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্না সিংহরূপিণী নিবেদিতার ব্রত-উদ্‌যাপনের কাহিনীও অপূর্ব।

আমাদের মহাপুরুষেরা বলেন—আসল গুরু সচ্চিদানন্দ। তিনি অন্তরে রয়েছেন এবং শরণাগত মুমুক্ষু সাধককে শ্রেয়ের পথে সর্বদা চালিত করছেন। সাধকের ব্যাকুলতায় স্থূল দেহধারী গুরুরূপে আবির্ভূত হন এবং যথার্থ মুমুক্ষু শিষ্যকে মুক্তির সন্ধান এবং পন্থা নিরূপণ করে দেন—

যা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসার সিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥

সুদূর ইংলণ্ডে মার্গারেট নোবল্ যখন যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসা নিয়ে আকুল, নানা নিরীক্ষা-পরীক্ষা, গবেষণায় রত, স্বামী বিবেকানন্দ উপনীত হলেন পাশ্চাত্যের দ্বারে—সনাতন-ধর্ম-নিহিত শাশ্বত সত্যের মহান্ উদার বার্তাবহরূপে। মুমুক্ষু শিষ্যার গুরুকে চিনে নিতে বিলম্ব হোল না। বিবেকানন্দের বাণী শোনামাত্র নিবেদিতার মনে হোল —The people who walked in darkness have seen a great light. ভারতাগত আচার্যের মহিমময়ী বাণীতে খুঁজে পেলেন তৃষ্ণাবারি। সে অমৃতময় সর্বজনীন উদার আহ্বান তাঁর মর্মে মর্মে

অনুরণিত হোল। 'আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা'—উপনিষদ্ বাণীর সত্যতা আবার জগৎসমক্ষে প্রমাণিত হোল বিবেকানন্দ-নিবেদিতা চরিত্রে। গুরু-নির্দেশ, গুরুদত্ত সত্যের জ্যোতির্ময় রূপ শুভ্রা চন্দ্রিমার ন্যায় এমন সুন্দরভাবে গ্রহণ আর বিকীরণ জগৎ অতি অল্পই প্রত্যক্ষ করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন বজ্রনির্ঘোষে আহ্বান জানালেন—'জগৎ এমন বিশজন লোক চায় যারা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে ভগবান ছাড়া কিছু চাই না…।' নিবেদিতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করলেন,— তিনি সেই বিশজনের একজন। যথার্থই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন—'হ্যা, আর কিছুই চাই না, জাতি-কুল-মান-যশ আমার জন্য নয়, আমি মরজগতের নই, আমার বংশ আলাদা। আমি সত্যকে জেনেছি, আমাব জন্মান্তর ঘটেছে।' নচিকেতারই মত তাঁর মনে শ্রদ্ধা জাগে, আত্মপ্রত্যয় আসে—'বহুনামেমি প্রথমো, বহুনামেমি মধ্যমো—বিবেকানন্দ-বিঘোষিত মহান্‌ব্রতে আমি অংশ গ্রহণ করে ধন্য হতে পারি।' সে মহান্ ভাবকে নিজস্ব করার মানসে অন্তরে তাব্র ব্যাকুলতা জাগে। গুরুকে প্রশ্ন করেন—'আপনার মিশনের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ কি হবে?' উত্তর পেলেন—'মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার আর সেই দেবত্ব বিকাশের পন্থা নিরূপণ করা।' স্বাতী নক্ষত্রের জল হৃদয়ে ধারণ করে শুক্তি মুক্তো গড়ে তোলার মানসে অগাধ জলে ডুব দিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র চিন্তা—গুরু যে আমাদের উপর সনাতন ধর্মের পুনরুজ্জীবনের ভার দিয়ে গেছেন, সে সর্বজনীন উদার ভাবের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের উপায় কি, পন্থা কি?

সে উজ্জীবন কি কেবল ভারত আর ভারতীয়দের জন্য? আর্ষ ঋষি যেমন উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থৌ……

কেবল মর্তবাসী নয়, দিব্যলোকবাসীরাও অবধান কর আমি সে দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষকে জেনেছি, যাকে জানলে মৃত্যুর পারে যাওয়া যায়। এ পথ ভিন্ন আর অন্য পথ নেই।'

শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন ও সাধনা সমগ্র জগতের জন্য। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে নবধর্মের বাণী ভারত হতেই আবার বিঘোষিত হোল—'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।' জীবনের চরম আদর্শ সম্বন্ধে পরম সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে সদা জাগ্রত থাকতে হবে। 'যত মত, তত পথ', 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—সে অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধার বিভিন্ন পন্থা মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ স্বামী বিবেকানন্দ তাই সনাতন ধর্মকে নূতনরূপে নূতন ভাষায় সর্বসমক্ষে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে, প্রতিষ্ঠা করলেন। এ কর্ম-পরিণত-বেদান্তজ্ঞানে (Practical Advaitism) সকলেই স্ব স্ব পরিবেশে পূর্ণ মর্যাদা, পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, পূর্ণ আদর্শ লাভের অধিকারী হতে পারে।

বেদান্তসূর্য বিবেকানন্দের কিরণসম্পাতে মুকুলিকা মার্গারেট নোবলের নয়ন উন্মীলিত হয়েছিল, পূর্ণ প্রস্ফুটিত নিবেদিতা-পুষ্পের প্রতিটি পাপড়ি তাই বুঝি বা বেদান্ত আভাতে সমুজ্জ্বল। নিবেদিতার অতি সাধারণ কথা, অতি সাধারণ লেখা, সাধারণ নির্দেশ পর্যন্ত সেই অদ্বৈতজ্ঞানের প্রকাশক। জীবনের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয়, গতসন্দেহ। সেখানে কোন লুকোচুরি, রাখাঢাকা বা দ্বিরুক্তির স্থান নেই। বহু স-প্রশ্ন কৌতূহল এবং জল্পনা-কল্পনাকে তিনি নিবৃত্ত করে দিয়েছেন স্বীয় অনুপম স্বাক্ষর দিয়ে—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।'

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'—এই তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁর জীবনের অন্যান্য ভূমিকা স্বীয় বহুমুখী প্রতিভার বিভিন্ন দৃক্-দর্শন মাত্র।

আমাদের শাস্ত্র বলেন, গুরুর কাজ আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া। বিবেকানন্দ প্রদত্ত আধ্যাত্মিক অঞ্জন নিবেদিতাকে ভারতমাতার মধ্যে সে পরমাত্মার সন্ধান দিয়েছিল, আত্মা পরমাত্মাতে একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন স্বামিজী—'The task before us বলতে গিয়ে বলতেন, 'আমি এমন একটা মন্দির করতে চাই যেখানে সকল দেশের লোক নিজ নিজ পূজা করতে পারবে, সেখানে কেবল 'ওঁ' থাকবে'—কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সে উক্তির মধ্যে আরও মহত্তর মন্দিরের আভাস পেয়েছিলেন ; তা হোল ভারতমাতা নিজে। মহিমময়ী মাতারূপে তিনি চির-বিরাজমানা—যিনি সকল সম্প্রদায়কে সমভাবে ক্রোড়ে ধারণ করেছেন, সকল ধর্মকে নির্বিশেষে আশ্রয় দিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য বিজয়ের পর ভারতে পদার্পণ করে বলেছিলেন—আগে একে ভালবাসতাম, এখন এর প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র, ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি। সেই পুণ্যভূমির অধঃপতন দর্শন করে ব্যাকুল হৃদয়ে মাদ্রাজবাসীকে বলেছিলেন—'তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন !...অধ্যাত্ম-পিপাসু নরনারী প্রাণবারির জন্য সতৃষ্ণনয়নে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে...।'

নিবেদিতা যে সে অধ্যাত্ম পিপাসার তীব্রতা এবং অমিয়বারির মৃত-সঞ্জীবনী ক্ষমতা—দুই-ই জানেন ! ভারতমাতা তাঁকে কন্যারূপে গ্রহণ করে তাঁকেও যে দেবদুর্লভ উত্তরাধিকার দিয়েছেন। 'দেবত্ব প্রচার আর দেবত্ব প্রকাশের পন্থা দেখিয়ে দেওয়া'—এই তাঁর সাধনা। সাধনায় তিনি পাগল হলেন। কিন্তু সে পাগলামী তাঁকে চঞ্চলা না করে শান্ত স্নিগ্ধ করে তুলেছিল, অপরের প্রতি সমালোচনা-প্রবণা না করে পরম সহানুভূতিশীলা করেছিল। সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে মলয় মারুতের কোমলতা লাভ করে, হৃদয়স্থিত পরমানন্দের প্রকাশে তিনি

দেবজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মতী হয়েছিলেন। তদানীন্তন জনসমাজ সে দেবী-সত্তাকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেনি।

ধর্মভাব নিজস্ব করার অর্থ নিজেকে তদ্ভাবে ভাবিত করা। নিবেদিতা সনাতন ধর্মকে নিজস্ব করেছিলেন, তিনি তার সঙ্গে এক এবং অভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতের ভগিনী নিবেদিতা, আধি-ব্যাধি-গ্রস্ত আপামর সাধারণের মাতা নিবেদিতা, সেবিকা নিবেদিতা—সমাজের সকল ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ বিচরণ। কেউ তাঁকে বিদেশিনী বলে পরিচয় দিলে তিনি মর্মাহত হতেন।

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন—'কি আমরা শিখেছি তাই বড় কথা নয়, সে শিক্ষাকে ধরে রাখার জন্য সম্যকরূপে কি ত্যাগ বরণ করেছি তাও ভাববার কথা।' স্বীয় জীবন দিয়ে তিনি সে উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করেছেন।

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের মতে শিষ্য তিন প্রকার। প্রথম—গুরু বলা সত্ত্বেও যে সে নির্দেশ পালন করে না। দ্বিতীয়—গুরু আদেশ করলে তা পালনে যথাসাধ্য যত্নপর হয়। তৃতীয়—গুরুর আদেশের অপেক্ষা না রেখে, তাঁর মনোগত ভাব বুঝতে পেরে তা পালনের জন্য সর্বান্তঃকরণে সচেষ্ট হয়। ভগিনী নিবেদিতা স্বীয় গুরু বিবেকানন্দের মনোগত ভাব সমষ্টিকে নিজ জীবনে, চিন্তায় ও কর্মে প্রয়োগ করার ব্রত উদ্‌যাপন পূর্বক শ্রেষ্ঠ শিষ্যার নিদর্শন রেখে গেছেন। তাঁর লেখা পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী চিরদিন সে সাক্ষ্য বহন করে থাকবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এহেন শিষ্যা কেন গুরু প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ত্যাগ করে এক ভিন্ন পরিবেশে জীবন কাটিয়ে গেলেন। মনে পড়ে একবার দেওয়ান হরিদাস বিহারী দাস স্বামী বিবেকানন্দকে স্নেহময়ী মাতা এবং ভ্রাতা ভগিনীদের অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য অনুযোগ করেছিলেন। স্বামীজী উত্তরে লিখেছিলেন—'যদি আমি সংসার ত্যাগ না করিতাম, তবে আমার

মহান্ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না।' ঐরূপ বিরাট পরিধি না হলেও অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে, ভগিনীর বহুমুখী প্রতিভা সঙ্ঘরূপ গণ্ডীর মধ্যে না থেকে বহির্জগতে সমাজের সর্বস্তরে এক ব্যাপক প্রেরণা এবং প্রভাব বিস্তার করে স্বামী বিবেকানন্দের মূল ভাবধারাকে দ্রুত রূপায়িত করতে সমর্থ হয়েছিল। ধর্মের তথাকথিত কোন বাহ্য চিহ্ন তাঁর জীবনকে সাধারণ জনসমাজ থেকে পৃথক করে রাখেনি বলে সকলেই ভগিনীকে নিঃসঙ্কোচে স্ব স্ব গোষ্ঠীর সঙ্গে এক করে নিতে পেরেছিলেন। সাহিত্যিক তাঁকে সাহিত্যসেবী ভাবে, শিল্পী শিল্পানুরাগী জ্ঞানে, রাজনীতিক রাজনীতিবিদরূপে, ঐতিহাসিক ইতিহাসবেত্তাবোধে সানন্দে সাগ্রহে ভগিনীকে বরণ করে নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা কিন্তু সর্বত্র একটি মাত্র সঙ্গীতকে নানা রাগে, নানা আলাপে সুর দিয়ে গেলেন—অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ এবং জীবনে তার প্রয়োগ; ভারতের মূল সুর আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শকে সর্বপ্রচেষ্টাতে রূপায়িত করার সাধনা। ওস্তাদ সঙ্গীতজ্ঞ বিবেকানন্দ যে অমোঘ-মন্ত্রপূত রামকৃষ্ণ-বীণা নিবেদিতার হস্তে তুলে দিয়েছিলেন যোগ্যতমা শিষ্যারূপে তিনি তার প্রতিটি তন্ত্রীতে অপূর্ব ঝঙ্কার তুলতে পরিপূর্ণভাবে সমর্থা হয়েছিলেন।

কি সরল সুস্পষ্ট নিগূঢ় ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ ভগিনী নিবেদিতার রচনাবলী! জীবনের সর্বক্ষেত্রে বহুত্বের মধ্যে একত্বের সাধনাকে কিভাবে সফল করে তুলতে পারা যায় তা তিনি নানাভাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি বলতেন—অদ্বৈতবাদীর নিকট জাগতিক পারমার্থিক বলে কোন সীমারেখা থাকতে পারে না; প্রচেষ্টা মাত্রই পূজা। Man-making education, আর আত্মবিদ্যা গবেষণার মধ্যে প্রকারগত কোন ভেদ নেই, মনুষ্যত্ব বিকাশের পূর্ণতার মধ্যে দেবত্ব প্রকাশের সূচনা।

'পৌরুষ মুক্তিরই নামান্তর মাত্র। বাস্তবিক পৌরুষসম্পন্ন ব্যক্তির স্বীয় পৌরুষ সম্বন্ধে সচেতন থাকবার পর্যন্ত অবকাশ ঘটে না। যেসব মনোবৃত্তি আমাদের কর্মের মধ্যে পৌরুষের প্রকাশ সাধনে সক্ষম তাকেই মর্যাদা দেওয়া উচিত। জীবনের সাধারণ পরিস্থিতিগুলিতে সুষ্ঠ সুন্দর নির্ভীক প্রকাশই জীবনের বৃহত্তর পরিধিতে বীরত্বরূপে স্বতঃস্ফূর্ত হতে দেখা যায়।'

কত গভীর আবেগ আর শুভেচ্ছা নিয়েই না গুরু শিষ্যাকে আশীর্বাদ করেছিলেন—'সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ কর। যদি আমি তোমায় সৃষ্টি করে থাকি তবে সেখানে বিনাশপ্রাপ্ত হও আর যদি মা ব্রহ্মময়ী তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন তবে বেঁচে থাক।'—কর্তব্য এবং পন্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ইঙ্গিত। সে স্বাধীনতাকে প্রয়োজনবোধে প্রয়োগ করতে নিবেদিতা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। নোঙ্গর কিন্তু চিরদিনের জন্য গুরু-পাদপদ্মে বাঁধা ছিল। তাই বিভিন্ন স্রোতমুখে বিভিন্ন গতি তাঁকে ভাসিয়ে নিতে পারেনি। সম্পূর্ণ স্ব-প্রতিষ্ঠ থেকে স্ব-বশে নিজেকে পরিচালিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতারূপেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন—The boat is sinking but I shall see the sunrise—তরণী ডুবছে আমি কিন্তু সূর্যোদয় দেখব—জীবনে যাকে সমগ্র সত্বা দিয়ে বরণ করেছিলেন, জীবনান্তে সেই জ্যোতির্ময় স্বরূপেই পরম মিলন সংসাধিত হোল।

ভগিনী নিবেদিতাকে অগণিত ভারত সন্তানের এক জন হিসেবে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি তাঁর জন্য অন্তরে অন্তরে যে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা বহন করে, প্রতিদিনের সেই কৃতজ্ঞতা তাঁকে নিবেদন করি। তাঁকে আমরা একান্ত আপন জনের মত জ্ঞান করি, তাই অন্তরের মমতা ও প্রীতি নিবেদন করি সেই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। সমগ্র জাতির তিনি জ্যেষ্ঠা ভগ্নীতুল্য। জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সব সম্মান, সব শ্রদ্ধা, সকল প্রীতি ও মমতা তাঁকে নিবেদন করি।

তাঁর সমগ্র জীবনকথা আলোচনা করলে একটি কথাই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, প্রীতি ও মমতা তার পরিমাণবিচার তাঁর কর্ম ও কীর্তির আপেক্ষিক নয়, তা তাঁর কর্ম ও কীর্তিনিরপেক্ষ। তাঁর কথা মনে হলেই বার বার মনে হয় ভারতবর্ষের মানুষের এক ভগ্নী বিধাতার কোন্ সকৌতুক নির্দেশে, ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে সমুদ্রপারে, ভিন্ন এক সংস্কৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর যেন বিধাতারই অমোঘ নির্দেশে আবার নিজের জীবনব্যাপী সাধনায় সেই হারানো মাতৃভূমিকে এবং ভ্রাতৃকুলকে পুনরাবিষ্কার করে আবার দ্বিগুণিত মমতায় তাকে আপনার হৃদয়ে ফিরে পেয়েছিলেন। ভগ্নী নিবেদিতার জীবন-সাধনা এই ফিরে পাবার সাধনা। তিনি আমাদের পাবার জন্য তপস্যা করেছিলেন। আমরা তাঁকে পাবার জন্য কোন তপস্যা করিনি। তাঁর সমস্ত তপস্যা আমাদের আপনার করে পাবার জন্য ব্যয়িত হয়েছে। 'দূরান্তরবাসিনী জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আবার স্বগৃহে ফিরে এসেছেন। আমাদের তাঁর স্নেহ-সমাদরে আপ্লুত করতে, আমাদের ভ্রষ্ট চরিত্রকে স্বমহিমায় পুনরায়

সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেছেন। তাই আমাদের অন্তরের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা সবই তাঁর প্রাপ্য।

তাঁর প্রাপ্যের স্বরূপটি কেমন তা তাঁর জীবনের একটি ঘটনা বিবৃত করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজী দেহত্যাগ করেন। ২রা জুলাই বাগবাজার থেকে নিবেদিতা গিয়েছিলেন বেলুড় মঠে গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং কিছু আলোচনা করতে। কথাবার্তার মাঝখানে স্বামীজী একবার বললেন—'আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।'

সেদিন ছিল একাদশী। স্বামীজী নিজে উপবাস করেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতাকে আহার করাবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং নিজেই শিষ্যাকে আহার্য পরিবেশন করলেন। আহারের মধ্যে কাঁঠালের বিচিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, ভাত আর বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা দুধ। আহারান্তে হাত ধোবার জন্য তিনি নিজেই নিবেদিতার হাতে জল ঢেলে দিলেন এবং তোয়ালে দিয়ে হাত মুছিয়ে দিলেন।

স্বামীজী গুরু, নিবেদিতা শিষ্যা—সুতরাং তাঁরই এসব করা উচিত, তাই নিবেদিতা প্রতিবাদ করে বললেন, 'স্বামীজী, এ সব আমারই আপনার জন্য করা উচিত, আপনার আমার জন্য নয়।'

স্বামীজী উত্তরে বললেন—'ঈশা তো তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।'

উপরে যে স্নেহ ও সমাদরের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, এই স্নেহ ও সমাদরই ভগ্নী নিবেদিতার প্রাপ্য ভারতবর্ষের মানুষের কাছে।

ভারতবর্ষে নিবেদিতা এসেছিলেন ভারতবর্ষকে ভালবাসতে। সংস্কারকরূপে তিনি আসেন নি। ভালবাসার জন্যই তিনি সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাই সে সংস্কারের মধ্যে কোন এক বিশেষ জাতীয় সংস্কারকেই তিনি বেছে নেন নি। তাঁর আশে পাশের মানুষের, যাদের তিনি ভালবাসেন, ভালবাসতে এসেছেন,—তাদের

জীবনে যেখানেই তিনি ভ্রষ্টতা বা আচ্ছন্নতা দেখেছেন তাকেই সংস্কাব করবার জন্যে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। মা যেমন শিশুর দেহেব কোন অংশে ময়লা লাগলে তা একান্ত স্নেহে পরিষ্কার করে দেন, তেমনি মন এবং দৃষ্টি নিয়েই সংস্কারেব কাজে এগিয়ে যেতেন।

এদেশে এসে এদেশের হৃদয়কে জয় করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়নি। তাঁর হৃদয়-অন্তঃপুরে যেমন ভারতবর্ষের বিগ্রহ মূর্তিকে স্থাপন কবে নিয়েই তিনি এদেশে এসেছিলেন তেমনি এদেশে এসে তিনিও নিজের স্থান খুঁজেছিলেন এখানকাষ হৃদয়-অন্তঃপুরে কলকাতায় এসে তিনি স্বামীজীব নির্দেশে বাঙালী সমাজেব অন্তঃপুবে, বাগবাজারে নিজের সাধনাব আসন পেতেছিলেন। তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী তাঁকে অনেক অনেক বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে বিবোধিতা অতি সূক্ষ্ম, অথচ যার আঘাতে অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়। সে সব আঘাত, সব বিরোধিতা তিনি দিনে দিনে তিলে তিলে সহ্য করেছেন এবং সে সবকে জয় করেছেন। যদি তাঁর অন্তরে অমেয় প্রেম না থাকত তাহলে তাঁকে রণে ভঙ্গ দিতে হত। সেই প্রেমই তাঁকে সমাজের অন্তঃপুর থেকে হৃদয়ের অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছে।

এই প্রেমের জন্যই বিদেশে আমেরিকায় যখন তিনি অর্থ সংগ্রহ অভিযান আরম্ভ করেন তখন সতীদাহ, পুরুষের বহুবিবাহ, জাতিভেদ, মেয়েদের উপর নানান অবিচার, শিক্ষার অভাব, নানাবিধ কুসংস্কার, গঙ্গাসাগরে শিশু বিসর্জন প্রভৃতি উপলক্ষ্য করে মিশনারীদের প্রচারিত কুৎসার জবাব দিতে তিনি ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হতেন। কন্যার যেমন জননীর নিন্দা সহ্য হয় না, মা যেমন সন্তানের কুৎসা সহ্য করতে পারেন না তেমনি নিবেদিতার কাছে ভারতবর্ষের কুৎসা অসহ্য ছিল।

তাঁর সব কর্ম ও কীর্তির অন্তরালে যে ভাবতপ্রেম ছিল তাই তাঁকে আমাদের আপনজন করে দিয়েছিল স্বামীজী তাঁকে আশীর্বাদ করে লিখেছিলেন :

মায়ের হৃদয় আর বীরের দৃঢ়তা,
মলয়-সমীরে যথা স্নিগ্ধ মধুরতা,
যে পবিত্র-কান্তি, বীর্য, আর্য-বেদীতলে,
নিত্য বাজে, বাধাহীন দীপ্ত শিখানলে ;
এসব তোমার হোক—আরও হোক শত
অতীত জীবনে যাহা ছিল স্বপ্নাতীত ;
ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে।

ভারত-সন্তানের সেই একাধারে সেবিকা-বান্ধবী-মাতা, ভগ্নী নিবেদিতাকে প্রণাম নিবেদন করে বলি—আজ শতবর্ষ পরে যে প্রণাম তাঁকে আমরা নিবেদন করছি আবও বহু শতাব্দী পরে সে প্রণাম এমনি অম্লান থাকবে।

নিবেদিতা বিনয়কুমার সরকার

নিবেদিতা তুখোর মেয়ে, মগজটা ছিল ভারী ধারালো। পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতা, ভাবনিষ্ঠা, রোমান্টিকতা ইত্যাদি রসে তাঁর চিত্তভাণ্ডার ছিল ভরপুর। । সেই চিত্ত আর ব্যক্তিত্ব তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মারফৎ ভারত, ভারতীয় জনসাধারণ আর ভারতীয় সংস্কৃতির পায়ে। ভারতীয় নরনারীর অতীত ব্যাখ্যা করা, বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যৎ বাৎলানো তাঁর পক্ষে মুড়ি-মুড়কি খাওয়ার মত সোজা কাজ ছিল। ঠিক যেন আদর্শনিষ্ঠ ও ভাবুক ভাবতীয় স্বদেশ সেবকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিবেদিতা সমগ্র ভাবতের বিকাশধারা দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন।···কোন বিদেশী পণ্ডিত ভারতীয় নবনাবীর জীবন-কথা এত গভীবভাবে বুঝতে পারে তা কল্পনা করা অসম্ভব। নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁব এই বিশ্লেষণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি সহজেই ধরা পড়ত। এই সবের ভেতরকার ভাবতীয় দরদটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।···

তিনি যুবক ভারতকে স্বদেশ-নিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। স্বদেশ-সেবকের কাজে যে লোকটা কাঠখড় জোগাতে পারে না, যুবক বাঙলা তাকে বড় একটা পুছে না দ্বিতীয় কারণ তাঁর গবেষণা শক্তি সংস্কৃতি বিশ্লেষণের কায়দা জীবন-সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টি আব ইংরেজি রচনা-কৌশল। এই দুই কারণে বহুসংখ্যক যুবা নিবেদিতাব কাছে প্রেরণা পেয়েছে।

প্রথম বৎসর [১৯০৭ সনে] রিডার হইয়া আমি ইংরেজিতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে নিযুক্ত হই। এই পুস্তকখানি সমাধা করিয়া আমি দুইজনকে দেখাইয়াছিলাম। তারমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মিস মার্গারেট নোবলের নাম—'নিবেদিতা' নামেই বঙ্গ-সমাজে তিনি পরিচিত। ...একদিন সকালবেলা তাঁর সহিত দেখা করিয়া পুস্তকখামি তাঁকে দেখাইবার প্রস্তাব করি, তিনি তখনই স্বীকার করিলেন, আমি বলিলাম, 'পুস্তকখানি খুব বড়।' 'তা হোক না, আমি যখন বলেছি, তখন দেখে দেব।' এই বলিয়া তিনি হাসিমুখে আমাকে বিদায় করিলেন।

তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পুস্তকখানি পড়িতে লাগিলেন। ইংরেজি 'ইডিয়ম' সংক্রান্ত ভুল মাঝে মাঝে না পাইতেন. এমন নহে, কিন্তু তিনি মোটের উপর বলিতেন, 'আপনার ইংরেজি ভাল'—ভাবের দিক দিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার সর্বদা তর্কবিতর্ক ও বিরোধ চলিত,...কোন একটা কথা লইয়া তর্ক বাধিত, হয়তো পুস্তকের এক লাইনও পড়া হইল না, দুইদিন তর্ক-যুদ্ধে কাটিয়া যাইত।...

কোন একটা বিষয়ের ভার লইলে তিনি এটা মনে করিতে পারিতেন না যে, উহা পরের। সেটি সম্পূর্ণ আপনার ভাবিয়া খাটিতেন,—এই ভাবের পরিশ্রম কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারে না ; কোন কোনদিন সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি খাটিয়াছেন, ইহার মধ্যে তিনি ও আমি ২।৫ মিনিটের জন্য খাইয়া লইয়াছি মাত্র, —এরূপ নিঃস্বার্থ, আত্মপর ভাববিরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে, শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী কার্যে তন্ময় লোক আমি

জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানি না। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম…

কবিতা বুঝিবার শক্তি তাঁহার অসামান্য ছিল। শূন্য পুরাণের শিব সম্বন্ধে একটা ছড়া আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তাহাতে লিখিত আছে—'শিব তুমি কেন ভিক্ষা করিয়া খাও? ভিক্ষা বড় হীনবৃত্তি, কোনদিন কিছু জোটে, আর কোনদিন রিক্ত ভাণ্ডে ফিরিয়া আস, তুমি চাষ করিয়া ধান বোন, তা'হলে তোমার এ কষ্ট দূর হইবে। হে প্রভু, তুমি কতদিন উলঙ্গ হইয়া অথবা 'কেঁওদা' বাঘের ছাল পরিয়া কাটাইবে? যদি কাপাস বুনিয়া তুলো তৈরী কর—তবে কাপড় পরিতে পাইয়া কত সুখী হইবে।'—এই ভাব-সম্বলিত পয়ারের মধ্যে যে ভারতীয় কোন অপূর্ব প্রেরণা থাকিতে পারে তাহা তো আমার মনেই হয় নাই, কিন্তু তিনি ঐ স্থানটি পড়িয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, কেবল 'আশ্চর্য, আশ্চর্য' এই কথাটি বারংবার বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, 'ভগিনী, এটাতে এমন কি জিনিস পেয়েছেন, যে দীনদরিদ্র হঠাৎ রাজ্য পেলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, আপনি সেইরূপ হয়ে পড়েছেন।' নিবেদিতা সেই কবিতাটি হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া, এক হাত দিয়া অপর হাত চাপিয়া ধরিয়া আনন্দগর্বফুল্ল চোখে কেবলই বলিতে লাগিলেন, 'ও দীনেশবাবু এটা একটা আশ্চর্য জিনিস।' আমি ভাবিলাম, ক্ষেপা মেয়ের মাথায় যেন কি হয়েছে। সেই সময় সেখানে আর একজন মেমসাহেব ছিলেন, আমি তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। পরদিন তাঁহাকে নিরালা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'নিবেদিতা এই শিবের কবিতায় এমন আশ্চর্য কি পাইয়াছেন, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কি শুনিয়াছেন?' তিনি বলিলেন, 'শুনেছি, সাধারণ ভক্ত ও উপাসক তাঁহাদের দেবতার নিকট সাহায্য চাহিয়া প্রার্থনা করেন—ঠাকুর আমায় ধন দিন, যশ দিন, মান দিন, স্বাস্থ্য দিন—তাঁহারা কত কি বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু ঐ কবিতায় ভক্ত তার উপাস্যের প্রতি

অনুরক্ত হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন, নিজের দুঃখের কথা তাঁর মনে নাই; ঠাকুরের দুঃখে তাঁর প্রাণ গলিয়া গিয়াছে, ঠাকুরের কষ্ট যাতে নিবারণ হয়, তাই তাঁর ভাবনার লক্ষ্য হইয়াছে।'

আমি তখন নিবেদিতার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম।···

একদিন ফাল্গুন মাসের মধ্যাহ্নে নিবেদিতাকে সঙ্গে করিয়া আমি ও গণেন একখানি নৌকায় খড়দহ রওনা হইলাম।···আমরা বাগবাজারের ঘাটে উঠিয়া সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আলোচনা করিতে করিতে যাইতেছি, এমন সময় একটা সাজিতে কতকগুলি মেটে পুতুল লইয়া একটা ফেরীওয়ালা বিক্রয় করিতে যাইতেছে দেখিয়া তিনি তাহাকে ডাকিলেন এবং পুতুলগুলি দেখিয়া আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইলেন। পুতুল তিনটি এক পয়সায় বিক্রী হয়। হলুদে আর কালো রঙে রঞ্জিত, স্ত্রীমূর্তি মাথায় একটা খোঁপা ও জগন্নাথের হাতের মত ছোট অর্ধসমাপ্ত দুইখানি হাত, পায়ের জায়গা মৃত্তিকায় গড়া শিবলিঙ্গ অথবা বেতের মোড়ার মত। এরূপ পুতুল তো শত শত অলিগলিতে পাওয়া যায়, বঙ্গের এমন বালক বালিকা বোধ হয় নাই যাহারা এরূপ পুতুলের দশ বিশটা শৈশবে না ভাঙ্গিয়াছে। এই পুতুল হাতে লইয়া 'oh most wonderful'—ক্রমাগত এইরূপ প্রশংসোক্তি করিতে লাগিলেন, আমি বলিলাম 'একেবারে ক্ষেপে গেলেন নাকি? এগুলির ভিতরে কি পেয়েছেন যে রাস্তায় দাঁড়াইয়া এরূপ করছেন? এখুনি আবার খড়দহের মত এখানে ভিড় জমাবেন, দেখছি।' নিবেদিতা আমার কথায় দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল 'অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত, অতি সুন্দর' এইরূপ মন্তব্য উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ করিতে করিতে এক টাকায় সেই সমস্তগুলি পুতুল কিনিয়া রামলালের হাতে দিলেন। তারপর আমি বিদায় লইলাম।

পরদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পুতুলগুলি লইয়া কাল ওরূপ করেছিলেন কেন?' তিনি বলিলেন—'আপনি ও বুঝবেন না, ওর মত

সুন্দর ও আশ্চর্য জিনিস আমি ভারতবর্ষে দেখি নাই।' এই বলিয়া অতি লুব্ধ চক্ষে তাহার একটি হাতে করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যাহাকে বাড়াইবেন, তাহার মাথা আকাশে না ঠেকাইয়া ছাড়িবেন না। আমি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু তিনদিন পরে মেজাজটা একটু পড়িয়া আসিয়াছিল, সেদিন হাসিয়া বলিলেন, 'দীনেশবাবু ওই পুতুল আমার এত ভাল লেগেছে কেন, শুনবেন। ৩০০০ খৃঃ পূর্বের অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বের অনেকগুলি জিনিস সম্প্রতি ক্রীট দ্বীপ হইতে ডাঃ ইভান্স আবিষ্কার করিয়া বিলাতে লইয়া আসিয়াছেন। আমি এবার বিলাত যাইয়া সেগুলি দেখিয়া আসিয়াছি, সেই সংগ্রহের ভিতব অবিকল এই পুতুলের মত পুতুল দেখিয়া আসিয়াছি।...'

দার্জিলিং যাওয়ার কয়েকদিন পূবে আমাব ইংরেজিতে লিখিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাস প্রকাশিত হইয়া আসিল, আমি তাহাব দুইখানি তাঁহাকে দিলাম। ভূমিকায় তাঁহার নাম না প্রকাশ করার জন্য তিনি আমাকে বাধ্য করিয়াছিলেন,—পুস্তক পাইয়া যে তিনি কতরূপে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আর কি বলিব।

তাঁহার শেষ কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছে। একটু করুণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'এই বই উপলক্ষ্যে বহুদিন আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছি, দুইজনে একত্রে কত খাটিয়াছি। এখন কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, আর বোধহয় আপনাকে তেমন ঘন ঘন পাইব না। কিন্তু যে সৌহার্দ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আপনি ভাঙ্গিবেন না, আপনি যদি পূর্ববৎ না আসেন, তবে আমি কষ্ট বোধ করিব।' বস্তুতঃ তাঁহার ভগিনীজনোচিত আদর আমার নিকট কত মূল্যবান ও প্রীতিকর ছিল, তাহা আর কি লিখিব! যেদিন তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইলাম সেদিন সমস্ত বোসপাড়াটা আমার নিকট একটা মহাশূন্যের ন্যায় বোধ হইয়াছিল।

নিবেদিতা-স্মৃতি

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসে 'মডার্ন রিভিউ' মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাহার কয়েকমাস আগে হইতে উহার জন্য প্রবন্ধ চিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি। তখন নটেশনের 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ', সচ্চিদানন্দ সিংহের 'হিন্দুস্থান রিভিউ', এবং মালাবারীর 'ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' এই তিনখানি প্রধান ইংরেজী মাসিকপত্র ছিল। সেইজন্য এইরূপ একটি কথা উঠে যে, আমার কাগজ অল্পদিনের মধ্যেই লেখার অভাবে উঠিয়া যাইবে—কে উহাতে লিখিবে? যথেষ্ট ও ভাল লেখা পাইব কিনা সে বিষয়ে আমরাও যে সন্দেহ ছিল না এমন নয়, কিন্তু আমি যখন নিঃসম্বল অবস্থায় চাকরীতে ইস্তফা দিয়া ইংরেজি মাসিকপত্র চালাইবার সংকল্প করি, তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম আর কেহ না লিখিলেও আমার নিজের সংগৃহীত নানা তথ্য দিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া কাগজ চালাইয়া দেখিব চলে কিনা। আমার প্রবন্ধে সাহিত্যিক উৎকর্ষ থাকিবে না, তাহা জানিতাম; কিন্তু জ্ঞাতব্য অনেক কথা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিব এবং যাহা প্রমাণ করিতে চাই তাহার সমর্থক যুক্তি দিতে পারিব এই ভরসা ছিল। কিন্তু শুধু আমার এইরূপ লেখায় ত পত্রিকাটি উৎকৃষ্ট হইবে না, এইজন্য লেখা ও লেখক সংগ্রহের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করি।

তখন ভগিনী নিবেদিতার সহিত পরিচয় ছিল না। আমার ইংরেজি মাসিকটিতে লিখিবার জন্য যাঁহাদিগকে অনুরোধ করি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। আমি তাঁহার ছাত্র বলিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতে সংকোচ বোধ করি নাই। তিনি বেশী লিখিতে না পারিলেও কখনো কখনো লিখিবেন বলেন এবং ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিতে অনুরোধ করেন। নিবেদিতা

দৃঢ়তার সহিত বলেন লেখার অভাব যাহাতে না হয় সে চেষ্টা হইবে। তাহার পর হইতে নিজে নাম দিয়া এবং নাম না দিয়া, তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন 'মডার্ন রিভিউ'তে বিস্তর প্রবন্ধ, নিবন্ধিকা, টিপ্পনী ও চিত্র-পরিচয় লিখিয়াছিলেন।

তাঁহাব রাজনৈতিক মত জানিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ কিছু লিখিব না। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, তিনি ভারতবর্ষেব পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়াসী ছিলেন। স্বাধীনতার পতাকা নামাইতে বা ঢাকা দিতে তাঁহার প্রাণে লাগিত, তবে আপাততঃ ঔপনিবেশিক স্বরাজ বা আভ্যন্তরীণ জাতীয় আত্মকর্তৃত্বে তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহাকে উচ্চতম বা চরম লক্ষ্য বলিতে তিনি রাজী ছিলেন না।...তিনি যোদ্ধৃ প্রকৃতিব মানুষ ছিলেন। অনেক সময় তাঁহার কথাবার্তায় ও লেখায় তাহা প্রকাশ পাইত। ধর্ম বিষয়েও তিনি সত্ত্বগুণের সহিত রাজসিকতাব মিশ্রণ ভালবাসিতেন। তাঁহার 'Aggressive Hinduism' নামক পুস্তিকা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু তিনি যেমন তেজস্বিনী ছিলেন তেমনি দয়াবতীও ছিলেন।...

তিনি আমার কাগজে লেখায় কয়েকটি বিষয়ে আমার চোখ ফুটিয়াছিল। আমি প্রথম প্রথম রবি বর্মার ছবির প্রতিলিপি এবং সেই জাতীয় অন্যান্য ছবির প্রতিলিপি ছাপিতাম। তিনি ক্রমাগত আমার সহিত তর্কযুদ্ধ করিয়া আমার এই বোধ জন্মান যে, রবি বর্মার ও তদ্বিধ অন্য ছবির রীতি ভারতীয় নহে এবং পাশ্চাত্য রীতির চিত্র হিসাবেও সেগুলি উৎকৃষ্ট নহে। চিঠিতে ছাড়া এসব বিষয় ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সহিত মৌখিক কথা যখন হইত, তখন কথা বলাব কাজ তিনিই বেশী করিতেন, আমি বেশীর ভাগ শ্রোতার কাজ করিতাম।...

ভারতীয় অনেক রীতিনীতি আমরা জন্মাবধি দেখিয়া আসিতেছি বলিয়া অভ্যাসবশতঃ উহার ভিতরকার গূঢ় তত্ত্ব ধরিতে পারিনা, উহার

প্রাণ ও অর্থ খুঁজিয়া পাই না, এসব বিষয়ে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে ভুল করিতেন না এমন নয়, কিন্তু অনেক সময় অনেক রীতিনীতি, ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠানের মজ্জাগত প্রাণের যে সন্ধান পাইতেন, তাহা আমরা পাই না।

ভারতীয় দেশী জিনিসের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। একবার তিনি আমাকে তাঁহার সহিত প্রত্যূষেই দেখা করিতে বলেন। বোসপাড়া লেনে তাঁহার সেই জীর্ণ বাড়িতে গিয়া খবর দিতেই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। দেখিয়াই বুঝিলাম তিনি পূজা পাঠ ও জপ করিতেছিলেন। পরে নিচে আসিয়া উভয়ে জলযোগ করিলাম। তিনি আমাকে পনীর খাইতে দেওয়ায় বলিলাম তাহা খাওয়ার অভ্যাস নাই। তিনি বলিলেন, 'খান, ইহা ঢাকার তৈরী, বিদেশী নয়।' এইরূপে দেশী বলিয়া আমাকে কিছু নূতন খেজুর গুড়ও খাইতে হইল। তিনি কোথায় একটা আধ পয়সা দামের মাটির প্রদীপ পাইয়াছিলেন। তাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহা যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার বন্ধুপ্রীতি ও হিতৈষণা অসাধারণ ছিল।…একবার তিনি চরমুখে খবর জানিতে পারেন যে আমার নামে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা হইবে। খবরটা সত্য ছিল, কিন্তু কি কারণে জানি না মোকদ্দমা হয় নাই। খবর পাইয়া তিনি অনেক দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিয়া তাহা আমাকে জানান।

তাঁহার বিষয়ে আচার্য বসু মহাশয়ের নিকট অনেক কথা শুনিয়াছি, তাহা অধিকতর শিক্ষাপ্রদ ও মনোহর। আমি নিজে যাহা জানি তাহাই লিখিলাম।

১৯০৯ সালে নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে একদিন ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষামন্দির ও বাসভবনে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পাঠাবস্থায় রেঙ্গুন হইতে আসিয়া তখন আমি স্কটিশচার্চ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইয়া ১৯১০ সালের I. A. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে আমার classical ভাষা ছিল পালি। রেঙ্গুনে থাকিতেই পালি ভাষায় লিখিত কতকগুলি বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ইংরেজি মাসিক পত্রে ভগিনী নিবেদিতার প্রবন্ধাদি পাঠে তাঁহার অদ্ভুত ধীশক্তির পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম এবং তিনি যে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ইহাও জানিয়াছিলাম।…নিবেদিতা একজন ইংরেজ মহিলা হইয়া কি প্রকারে ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন তাহা বুঝিবার আগ্রহ দমন করিতে না পারিয়া উপযাচক হইয়া তাঁহার দর্শনমানসে তাঁহার ১৭নং বোসপাড়া লেনস্থিত বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

ছাত্র এবং অল্পবয়স্ক হইলেও তখন আমার সাহস ছিল অদম্য। যাঁহাকেই কোন বিষয়ের শীর্ষস্থানীয় দেখিতাম তাঁহারই সহিত জোর করিয়া দেখা করিতাম, ইহাতে মাঝে মাঝে লজ্জায়ও পড়িতে হইত। যেমন নাট্যসম্রাট গিরীশবাবুর নিকটে প্রথম আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা আলোচনা বা ধর্ম-প্রসঙ্গ করিতে যাইয়া দেখিলাম তিনি ত ধর্ম-প্রসঙ্গ করিলেনই না বরং আমি কি আহার করি, কখন পড়ি, কখন শুই, কোথায় বেড়াই ইত্যাদি প্রশ্নই করিতে লাগিলেন। যেন আমি একটি বালকমাত্র! ভগিনী নিবেদিতার নিকটে আমার প্রায় তদ্রূপ অবস্থাই ঘটিল।

উপরে সংবাদ পাঠাইবার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রথম আসিলেন সিস্টার ক্রিশ্চীন্। তাঁহার পরিচয় দিয়া তিনি এই বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করেন জানাইলেন, কিন্তু আমি ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিতে আসিয়াছি বুঝিয়া তিনি তখনই উপরে গিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। ভাবিয়াছিলাম একজন শান্ত ধর্ম-প্রসঙ্গরতা মৃদুভাষিণী বিদুষী ভক্তমহিলাকে দেখিব, কিন্তু নিবেদিতার সিংহবিক্রমে আগমন, তাঁহার শক্তিপূর্ণ অঙ্গ-সঞ্চালন, তীব্র হৃদয়ভেদী দৃষ্টি, তেজোদ্দীপ্ত কথা প্রভৃতি দেখিয়া ও শুনিয়া আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। তাঁহার নিকট আমি ক্ষুদ্র বালকই হইয়া পড়িলাম। সিস্টার ক্রিশ্চীন্ সাদা সাড়ী পরিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু নিবেদিতা ঘাগ্‌রা পরিয়াই আসিলেন। অর্থাৎ যেভাবে ছিলেন সেই ভাবেই দেখা করিতে আসিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার মেয়েদের পড়াইবার ঘরে লইয়া আসিয়া নিজে একটি পিঁড়াতে বসিলেন এবং আর একটিতে আমায় বসিতে বলিলেন। নিমন্ত্রণ বাটীতে খাওয়াইবার জায়গায় যেমন পর পর আসন পাতা থাকে তেমনই এই গৃহে মেয়েদের পড়িবার জন্য সারি সারি পিঁড়া পাতা আছে দেখিলাম। একদিকে দেওয়ালের মধ্যস্থলে একটি উচ্চ আসন রহিয়াছে; বুঝিলাম উহাতেই শিক্ষয়িত্রী উপবেশন করেন। তখনও স্কুলের পূজার ছুটি চলিতেছিল।

নিবেদিতা বলিলেন, 'এইটি মেয়েদের পড়িবার ঘর। আমি এইখানে পাড়ার মেয়েদের পড়াই। তুমি কি চাও?'

আমি বললাম, 'আমি একজন ছাত্র, আপনার যহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। রেঙ্গুনে I. A. পড়িতেছিলাম, এখানে আসিয়া I. A. ক্লাসে ভর্তি হইয়াছি; আগামী বৎসর পরীক্ষা দিব। আমার পালি classical ভাষা—আপনার নিকট ঐ বিষয় লইয়া আলোচনা করিব মনে করিয়াছি।'

নিবেদিতা একটু আশ্চর্য হইয়াই বলিলেন, 'ওঃ! তুমি পালি পড়! ালির দিকে তুমি আকৃষ্ট হইলে কেন?'

আমি উত্তর করিলাম, 'রেঙ্গুনে সকলকেই পালি পড়িতে হয়; কিন্তু আমার পালি ভাল লাগে, কারণ আমার মনে হয় ভারতের পূর্ব গৌরব বিশেষ করিয়া জানিতে হইলে পালি পড়া প্রয়োজন।' নিবেদিতা কৌতূহলপূর্ণ নয়নে ক্ষিপ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ভবিষ্যতে কি হইবে ঠিক করিয়াছ?' আমি বলিলাম, 'তাহা আমি বলিতে পারি না।'

তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'ইহা একটি নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক (This is foolishness)। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মনে রাখা উচিত সে ভবিষ্যতে কি হইতে চায়।' তাহার পর সহাস্যে আমায় বলিলেন, 'তুমি যখন বড় হইয়া পালি ভাষায় M.A. পাশ করিবে তখন আমার নিকটে আসিও; আমরা এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিব। এখন আমি বড় ব্যস্ত, আমায় বিদায় লইতে হইবে।'—মুহূর্ত মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা তেজোময়ী বিদুষী হইতে ভক্ত নিবেদিতায় পরিণতা হইলেন। জোড়করে আমাকে বহুবার নমস্কার করিতে করিতে এবং মনে হয় তাঁহার গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।···

পরবর্তী অক্টোবর মাসে রেঙ্গুনে রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া শুনিলাম 'Sister Nivedita no more.' ভগ্নী নিবেদিতা আর ইহজগতে নাই—এই সংবাদ কলিকাতা হইতে তারযোগে রেঙ্গুনে প্রচারিত হইয়াছিল। ভগ্নি, তুমি যে বলিয়াছিলে M.A. পাশ করিবার পর আমার সহিত প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করিবে। আমি ত বসিয়া আছি, তুমি কোথায়? তুমি ঠিকই বুঝিয়াছিলে শৃঙ্খলা-রহিত শিক্ষা হয় না, তুমি বলিয়াছিলে স্বাস্থ্য-উন্নতি করিতে না পারিলে পড়াশুনা বিড়ম্বনা। আজ ভারত স্বাধীন। তোমার একটি ব্রত পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আজ বাঙ্গালী আদর্শভ্রষ্ট, তুমি আসিয়া শিক্ষা দাও। ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দাও কি করিয়া দেহের ও মনের উন্নতি সাধন করিতে হয়।

নিবেদিতা-স্মৃতি

কুমুদবন্ধু সেন

…ভগিনী নিবেদিতার নানা স্মৃতি মনে আসিয়া ভিড় করিতেছে, কিন্তু সীমাবদ্ধ প্রবন্ধে আমাকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে। যখন টাউন হলে তাঁহার মৃত্যুর পর স্মৃতিসভার উদ্যোগ হইতেছিল—তখন আমাকে স্যার রাসবিহারী ঘোষ বলিয়াছিলেন, 'এঁর স্মৃতিসভা তাড়াতাড়ি একটা গোলমালে সারবেন না। এখন সম্রাটের আগমনে হৈ চৈ চলছে; এটা থেমে গেলে তাঁর স্মৃতিসভা আহ্বান করবেন। নিবেদিতার মত প্রতিভাশালিনী নারী জগতে দুর্লভ।' স্মৃতিসভায় রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি হন।

উপসংহারে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কথা প্রসঙ্গে আমার নিকট নিবেদিতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

'নিবেদিতা প্রতিভাশালিনী নারীদের মধ্যেও অনেক উঁচুতে। তাঁর ত্যাগ অতুলনীয়—কি ত্যাগ তিনি করেছেন তা এদেশের লোক বুঝবে না। সাহিত্যে, বর্তমান যুগের সমস্যা-সমাধানে, নানা-বিষয়িনী বিদ্যায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। যদি তিনি পাশ্চাত্য দেশে থেকে কাজ করতেন—যশ-মান-প্রতিষ্ঠা-ঐশ্বর্য তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ত; আর তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ শোক প্রকাশ করতো। কিন্তু তিনি সে প্রলোভন ত্যাগ করে এই দেশকে এমন আপনার করে নিয়েছিলেন যা এদেশে বড় বড় নেতার মধ্যেও দেখতে পাবে না। তাঁর সঙ্গে গঙ্গার তীরে যেতে যেতে দেখতুম তিনি এক টুকরো পাথর, একটা পুতুল, একটা জীর্ণ ভাঙা মন্দির দেখে আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। এমনি ভালবাসতেন তিনি এই দেশকে। তাঁর মত দৃষ্টি, তাঁর মত সৌন্দর্যবোধ, তাঁর মত গভীর স্বদেশপ্রেম, তাঁর মত শিল্পী মন আমাদের দেশে কারো নেই। সময়ে সময়ে তাঁর

সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গী দেখে অবাক হয়েছি—মনে মনে শ্রদ্ধা করেছি তাঁর শ্রেষ্ঠতাকে। বোসপাড়ায় একটা ভাঙা জীর্ণ বাড়িতে অর্ধাহারে—প্রায় অনাহারে এই দেশের সেবায় তিনি তিলে তিলে আত্মদান করেছেন। কত অনুরোধ করা হয়েছে ভাল বাড়িতে নিয়ে আসবার জন্য—তাঁর পুষ্টিকর আহারের জন্য। তিনি হাসিমুখে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। দধীচির মত আত্মবলিদান, উমার মত তপস্যা যা পুরাণে কাব্যে বর্ণনা শুনেছি—তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বতোভাবে নিজেকে নিবেদন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নাম ঠিক রেখেছিলেন—নিবেদিতা।'

এই সর্বত্যাগিনী ব্রহ্মচারিণী তেজস্বিনী তপস্বিনীকে কি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিব না?

পরমারাধ্যা নিবেদিতা

গিরিবালা ঘোষ

পরমারাধ্যা সিস্টার নিবেদিতার কথা কিছু লিখিয়া দেওয়ার জন্য আমার এক ভগ্নী কর্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হই। এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদ চাহিলে তিনি উত্তরে লিখেন—'বেশ তো নিবেদিতা সম্বন্ধে লিখো না—এ তো খুব ভাল কথা। তোমরাই পুরানো আছো। নিবেদিতার শিক্ষা দীক্ষার কথা বাহির হইলে অনেকের উপকার হইবে। তিনি এদেশের জন্য প্রাণ দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবনের কথা কেহ বেশী তো জানে না, তোমরা যেমন জানো। তাঁর বাহিরের সঙ্গে অনেকের পরিচয় আছে মাত্র। তোমরা এক জোট হয়ে লিখো, ভালই হইবে।...'

আমি লেখিকা নহি, বিদ্বান নহি—নিতান্ত মূর্খ। তবে আমি যাঁহার কন্যা, তাঁহার পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া কিছু লিখিতে আরম্ভ করিলাম, তিনিই চালাইবেন এইমাত্র ভরসা। দেবী নিবেদিতার পবিত্র সাহচর্য লাভ করিয়াছি, তাঁহার হাতে শিক্ষা পাইয়াছি, কাজেই তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে, তাঁহার কথা কিছু বলিতে প্রাণ আনন্দে ভরপুর হইয়া ওঠে।

আমি যখন সিস্টারের শুভসঙ্গ লাভ করি তখন আমি বিধবা; বয়স ২২।২৩ বৎসর হইবে। ছোটবেলায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতুলালয়েই আমাদের বাসস্থান ছিল। আমি বাসা হইতে পরমারাধ্যা নিবেদিতার স্কুলে যাতায়াত করিতাম। আমার ঐরূপে স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার অভিভাবকেরা অমত করিতে লাগিলেন। পাড়ার সকলে নিন্দাবাদ করিতে থাকে—এইরূপে স্কুলে যাওয়াটা বিধবা মেয়ের ভাল নয় ইত্যাদি। যাহা হউক আমার দিদিমা গঙ্গাস্নানের রাস্তায় স্কুল বাড়িতে যাইয়া সমস্বরে স্তবস্তুতি

পাঠ শুনিয়া আসিয়া সকলকে বলায় আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রত্যহ স্কুলের গাড়ি আসিলে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন না। নানা ছুতায় আমার স্কুলে যাওয়াটা যাহাতে বন্ধ হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমাদেব বাসস্থান গলির ঠিক সামনে ১নং বাড়িতে ছিল। প্রয়োজন হইলে গলির ভিতরেও গাড়ি ঢুকিত। গলির ভিতর সদর দরজা থাকায় আমার একটু হাঁটিয়াই গাড়িতে উঠিতে হইত; কারণ স্কুলেব গাড়ি বড় বলিয়া সব কোচম্যান গলির মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিত না। কোন কোন দিন ঢুকিত; কারণ ঐ গলিব মোড়ের বাড়ি হইতে আরও কয়েকটি বালিকা স্কুলে যাইত, আমি তখন ঠিক হইয়া সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। যদি একদিন কোন কারণে একটু দেরী হইত আমি যাইব না বলিয়া দিয়া, বাহির বাড়ি হইতেই গাড়ি ফিরাইয়া দেওয়া হইত। আমি ইহাতে অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়া সিস্টারকে জানাইলে তিনি কোচম্যানকে গলিতে ঢুকিয়া প্রতিদিন আমাকে আনিবার জন্য আদেশ দিলেন। তদবধি আমি যদিও স্কুলে যাইতে পারিতাম, কিন্তু বাড়ির দবজায় গাড়ি একটুমাত্র দাঁড়াইতে হইলেই, গাড়ি ফেরৎ দেওয়া হইত, একেবারে তৈরী থাকিয়া শীঘ্র শীঘ্র উঠিলে উঠিতে পারিতাম। গাড়োয়ানের দুরভিসন্ধিতে, হঠাৎ বা যে কারণেই হউক একদিন আমাদের দেওয়ালের কোণে লাগিয়া গাড়ির কিছু ক্ষতি হইল। সিস্টার শুনিয়া কিছু দুঃখিত হইলেন, কারণ কোন জিনিসের অপচয় হইলে তিনি বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেন। নিকটস্থ কোন স্থানে যাওয়ার আবশ্যক হইলে তিনি হাঁটিয়াই যাইতেন। আমরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন— 'ঘোড়ার কষ্ট হইবে'।

যাহা হউক পরদিন সিস্টাব নিজে গাড়ি লইয়া আসিয়া আমাব মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ পূর্বক অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন। আমি দূরে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—'ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য—যিনিই যতবার ধর্ম প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন—তাঁহাকেই অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা পাইতে হইয়াছিল। আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই বলুন, তবুও আপনাদের গৃহকর্মের অবসর সময়টুকুতে—মাত্র ১১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত এই কন্যাটিকে আমি ভিক্ষা চাহিতেছি। আপনাদের মেয়েরা গঙ্গাস্নানে যায় কালীঘাটে। এরূপ অল্প সময়ের জন্য মেয়েটিকে আমায় দিবেন কিনা বলুন, বলুন আপনি'—এই কথা বলিতে বলিতে আমার মামার পায়ের নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সেই করুণাময়ী মাতৃমূর্তি দর্শনে আমার মাতুল তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উঠাইয়া আমাকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে সমর্পণ করিলেন। আর সিস্টার তখন আমাকে দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া—চল আমার মেয়ে, আজ হইতে তুমি প্রতিদিন স্কুলে যাইতে পারিবে—এই বলিয়া আমাকে লইয়া গাড়িতে উঠিলেন, পরে স্কুলে গিয়া তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইলেন এবং কত আদর করিয়া বড় একখানা বোম্বাই চাদর আমার গায়ে জড়াইয়া দিয়া বলিলেন—'আমার মেয়ে এইরূপে চাদর জড়াইয়া গাড়িতে উঠিবে'। আমি সেইদিন যে কত সুখ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম।

ইহার পর প্রতিদিন স্কুলে ঢুকিতেই দেখিতাম তিনি অতি সাগ্রহে নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। কোন দিন হয়ত তাঁহার ঘরের সিঁড়ির উপর, কোন দিন বা বারান্দায়, গলা বাড়াইয়া আমাকে দেখিয়া একটু একটু হাসিতেন। আর কোন দিন বা একেবারে দরজার ধারেই থাকিতেন এবং 'এই যে, আমার মা, এসেছ?' বলিয়া তাঁহার সেই স্নেহমাখা হাসিটি হাসিতেন।

আমাদের কাহারও মুখ শুকাইয়া গিয়াছে দেখিলে অমনি ঘরে ডাকিয়া লইয়া কত স্নেহমাখা স্বরে কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। আমরা তখন তাহার কাছে সকল সুখ-দুঃখের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমরা অধিকাংশই ছিলাম বিধবা—আমি ছিলাম

বয়সে সকলের বড়; আর ক'টি ছিল ছেলেমানুষ। তাদের দিকে তিনি কি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতেই না চাহিতেন। আমরা হিন্দু ঘরের বিধবা, কাজেই খাওয়া-দাওয়া আমাদের সোজা ব্যাপার নয়। অনেক দিনই না খাইয়া স্কুলে যাইতে হইত। তিনি যে কি প্রকারে বুঝিতে পারিতেন জানি না, তখন কিছু খাওয়াইবার জন্য যে কি যত্ন, কি ব্যগ্রতা দেখাইতেন তাহা বলিবার নয়; সেই প্রফুল্লা মাতৃমূর্তি যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে।...

সিস্টার সকল কথাবার্তা বাঙ্গলায় বলিতে পারিতেন না। অথচ তিনি বাঙ্গলা বলিতেই ভাল বাসিতেন। সে জন্য পূজনীয়া সুধীরা দিদি [পরে তিনিই নিবেদিতা স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়াছিলেন] তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সকল কথা বুঝাইয়া দিতেন। সুধীরা দিদি যখন সিস্টারের কোন কথায় বাঙ্গালা করিয়া দিতেন, তিনি তখন যেন ছোট মেয়েটির মত বসিতেন আর বারবাব সেই কথাটি উচ্চারণ করিয়া মুখস্থ করিতেন।

আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন—মা আজ তোমাদের কাছে নূতন কথা শিখিলাম। বাঙ্গালা ভাষা আমি বড় ভালবাসি।

আমরা যখন স্কুলে যাইতাম 'মাষ্টারনি' 'মাষ্টারনি' বলিয়া গাড়ির দরজার কাছে আসিয়া ছেলেরা সব হাততালি দিত। একদিন ইহা সিস্টারকে বলিলে তিনি মিষ্টভাবে বলিলেন—'উহারা জানে না বলিয়া বলে, অজ্ঞানের উপর রাগ করিতে নাই। আমরা সব সহ্য করিতে শিক্ষা করিব তবেই ঠিক ঠিক হবে।'...

একদিন মাননীয় স্যার জগদীশবাবুর স্ত্রী সিস্টারের কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে লইয়া কত আনন্দ করিতে লাগিলেন, পরে অপরের ঘরে মেয়েদের দিয়া—'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটি গাওয়াইয়া তাঁহাকে শুনান হইল। সেই গানটি গাহিবার সময় সিস্টারের অঙ্গ-ভঙ্গি দেখিয়া বোঝা যাইতেছিল তিনি

আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন, তখন তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। তিনি এমনি দেশপ্রেমিকা ছিলেন।

আমরা কয়জন প্রায় সব সময়ই তাঁহার নিকট থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহাকে কিছু বুঝিতে পারিয়াছি, নতুবা স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা, ত্যাগের প্রতিমূর্তি, ব্রহ্মচারিণীকে বোঝা কাহার সাধ্য। [প্রবন্ধাংশ]

* * *

স্কুলে যাওয়ার এক বছর পর তার [মেয়ের] বিয়ে হয়েছিল বোধহয়। তাকে সিস্টার, সুধীরাদি খুব ভালবাসতেন। বাসী বিয়ের দিন সিস্টার তাকে আশীর্বাদ করতে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। সব লোক 'মেম এসেছে, মেম এসেছে' বলে চেঁচাল. শুনে আমি দৌড়ে গেলাম। দেখি এক অপূর্ব দৃশ্য, মা। মুখে কেবল শিবদুর্গা, শিবদুর্গা বলছেন আর ভাবে বিভোর। আমার সঙ্গে বাসর ঘরে এসে দুজনকে দেখলেন, হাঁটু গেড়ে বসে হাত দুটি বাড়িয়ে ঢুলে ঢুলে শিবদুর্গা, শিবদুর্গা ঐ নাম অনবরত বলছেন, তারপর আপন মনে ঐ রকমে চলে গেলেন। শান্তিরাম ঘোষ লেনে এক নম্বর বাড়ি ছিল, কতদূর সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, একটাও কথা বললেন না। দেবী ছিলেন মা তাঁরা। এখনও সেকথা মনে হলে আনন্দে বিভোর হই।...

আমি তখন বেশ বড়, বিধবা, ২৬।২৭ তো হবই। পড়ব আর কি মা, তবে তাঁদের দেবী-সঙ্গ যেটুকু পেয়েছি তাতেই জন্ম সার্থক হয়েছে। তিনি যখন দার্জিলিং যান সেদিন প্রায় রাত ৮টা পর্যন্ত জনকতক মেয়ে আমরা ছিলাম—প্রফুল্ল ওরা তো সবই জানে। কেঁদে কেঁদে মরছিলাম আমরা। কাজের অবসরে এক একবার এসে আমাদের 'আমা মেয়ে, আমা মেয়ে' করে গায়ে হাত দিয়ে কত ই সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তারপর গাড়িতে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। সেই শেষ দেখা মা। [পত্রাংশ]

ছোটবেলার স্মৃতি

নির্ঝরিণী সরকার

নিবেদিতাকে যখন আমি প্রথম দেখি, তখন আমি ১৪।১৫ বৎসরের বালিকামাত্র, প্রায় তুই বৎসর তাঁব কাছে শিক্ষা পাই।

বহুদিন চলে গেছে, কিন্তু ছোটবেলার সেই পবিত্র স্মৃতি এখনো আমার মনে অম্লান হয়ে আছে। সেই অপূর্ব চরিত্র যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম, অনুভব করেছিলাম, সেই অনুভূতি ভাষা দ্বারা বুলানো অসম্ভব, তবুও আমি নিবেদিতাকে তাঁর স্কুলে সর্বদা যেমন ভাবে দেখেছি এবং তাঁর কাছে যে ভাবে শিক্ষা পেয়েছি, ঠিক সেইভাবে তাঁর.কথা লিখবার চেষ্টা করবো।

আমি যখন নিবেদিতা স্কুলে লেখাপড়া শেখবার জন্য যাই, স্কুল তখন বাগবাজারে বোসপাড়া লেন গলির ভিতরে একটি ছোট পুরানো দোতলা বাড়িতে ছিল। নীচের তলায় খানিকটা ঢাকা বারান্দা মত ছিল, সেখানে খুব ছোট ছোট মেয়েদের ক্লাস বসত, উপর তলার তিন চারখানা ঘরও ক্লাস হিসাবে ব্যবহৃত হত, তারই মধ্যে একটি সিস্টারের শোবার ঘর ছিল, সেই ঘরেরই একপাশে সিস্টার লেখাপড়া করতেন। তখন স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তিনি ছোট ছোট মেয়েদের পড়াশুনা দেখতেন ও আমাদের কিছু কিছু সাহায্য করতেন। বড় মেয়েরা অর্থাৎ আমরাও দরকার মত ছোটদের ক্লাসে পড়াতে যেতাম, বড় মেয়ে তখন স্কুলে পনের ষোল জনের বেশী ছিল না, কারণ আমাদের সময়ে খুব অল্প বয়সেই বিদ্যাশিক্ষা শেষ করে সংসারে প্রবেশ করাই নিয়ম ছিল, কদাচ তু-এক জায়গায় হয়তো এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যেত। আমার সহপাঠিনীদের মধ্যে বেশীর ভাগই অল্প-বয়স্কা বালিকা বিধবা এবং কয়েকজন বিবাহিতাও ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই বাড়ি স্কুলের

কাছাকাছি কিংবা বোসপাড়া লেন গলির ভিতরে ছিল। অধিকাংশ বাড়িতে মেয়েদের শিক্ষা বলে কোন চর্চা ছিল না, অভিভাবকরাও তেমন পছন্দ করতেন না, এইসব বাধা বিপত্তি সত্বেও সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বালিকা বিধবা মেয়েদের যে কি করে বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্কুলে আনা সম্ভব হলো তা ভাবতে গেলে পল্লীবাসীদের নিবেদিতার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাই এর কারণ বলে মনে হয়। মেয়েদের মা ঠাকুরমাও বাগবাজার পল্লীর অন্যান্য গৃহস্থ ঘরের মহিলারাও প্রায়ই মাঝে মাঝে স্কুলে সিস্টারের কাছে সেলাই প্রভৃতি শিখতে আসতেন এবং সিস্টারকে যেন নিজেদেরই একজনের মত মনে করতেন। অনেক অভাবগ্রস্তা মহিলা তাঁদের শিশু সন্তানদের ফ্রক, প্যান্ট, পেনী প্রভৃতি স্কুল থেকে সেলাই করে নিয়ে যেতেন, সিস্টারই কাপড় ইত্যাদি ব্যয়ভার বহন করতেন। স্বল্প আয়, অথচ এই সমস্ত খরচের জন্য নিবেদিতাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আবার অনেকে তাঁর সাহায্যও চাইতে আসতেন, সিস্টারও যথাসাধ্য তাঁদের সাহায্য করবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু কিছু সামান্য সেলাই প্রভৃতির কাজ তাঁদের হাতে এইজন্য দিতেন, যেন তাঁরা শুধু শুধু সাহায্য নেওয়ার গ্লানি থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেন এবং নিজেরাও স্বাবলম্বিনী হতে শেখেন। আজকাল এই উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকগুলি বড় প্রতিষ্ঠান হয়েছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠান দ্বারা অভাবগ্রস্তা গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা সম্মানের সঙ্গে নানাবিধ সূচীকার্য, আচার, বড়ি, ইত্যাদি প্রস্তুতের দ্বারা নিজেদের সংসারের অনেক অভাব মোচন করবার সুযোগ লাভ করতে পারছেন এবং এই সঙ্গে স্বাবলম্বনের শক্তিও অর্জন করছেন। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় হতেই যে মেয়েদের এই বলবুদ্ধি ও আত্মচেতনা বিকাশের বীজ বপন প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, তার আর ভুল নাই। দীর্ঘ চল্লিশ্ বৎসর আগে নিবেদিতা এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই বাগবাজার বোসপাড়ার মত পুরাতন অখ্যাত পল্লীতে অল্প সংখ্যক মেয়েকে নিয়ে নিরাড়ম্বরভাবে স্কুল

স্থাপন করেছিলেন। শক্তিমতী, প্রতিভাশালিনী নিবেদিতা অনেক বিশিষ্ট পরিবারের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ও বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তথাপি তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে এইদিক বর্জন করেছিলেন। আমি তাঁকে সর্বদাই দরিদ্র গৃহস্থ পল্লীবধূ ও গৃহিণীদের দ্বারাই বেষ্টিত থাকতে দেখেছি। অন্যান্য স্কুলের মত এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোন মাহিনা নেওয়ার প্রথা ছিল না, বরং মেয়েদের প্রয়োজনে কাগজ বই পেন্‌সিল প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা হত। মেয়েদের অনেকেরই বাড়ির সমস্ত কাজ, ভাইবোনদের দেখাশোনা, রান্নাবান্নার সাহায্যও করতে হত, কারণ অবস্থা অনেকেরই সচ্ছল ছিল না। এইসব মেয়েদেব গৃহের বিদ্যাশিক্ষাও অতি সামান্য ছিল এবং বাইবের নানা বিষয়েব জ্ঞান বা পরিচয়ও ছিল না বললেই হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে আমার এইসব সহপাঠিনীদের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিতা হয়ে স্কুল ও ঠাকুরেব কাজে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে জীবন সার্থক করতে পেরেছিলেন। স্কুল আমাদের বড় আনন্দেব জায়গা ছিল, এখানে এসে আমরা ছোট মেয়েদের মত ছুটাছুটি, খেলাধুলা, আনন্দ করেছি।

আমি যখন প্রথম স্কুলে যোগদান করি, তখন সিস্টার নিবেদিতা স্কুলে ছিলেন না। আমি তাঁকে তখনও দেখিনি, স্কুলের ভার ছিল সিস্টার ক্রিশ্চিয়ানার উপর। যতদিন নিবেদিতা আসেননি, ক্রিশ্চিয়ানা আমাদের ইংরেজি ও অন্যান্য বিষয়ের ক্লাস নিতেন। তিনি এত মাধুর্যময়ী ছিলেন যে, তিনি যখন আমাদের পড়াতেন তখন আমরা তাঁকে শিক্ষক বা গুরুর চেয়ে বন্ধু বলেই বেশী মনে করতাম, যেন তিনি আমাদের কত আপন জন। তাঁকে আমাদের একটুও ভয় হত না, তাঁর কাছে আমরা পড়বার সময় ভুল করলে তাঁর সেই ক্ষমাপূর্ণ সস্নেহ হাসি এখনো মনে হয়। ক্রিশ্চিয়ানা আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর নিবেদিতা অনেকবার আমাদের কাছে তাঁর দৃঢ়তা, নিয়মানুবর্তিতা, সাহস ও পণ্ডিত্যের কথা বলেছেন যা শুনে আশ্চর্য হতে হয়।

নিবেদিতাকে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। সিস্টার সেইদিনই ফিরে এসেছেন। তিনি এসেছেন সে কথা তখনো আমরা জানতে পারিনি। প্রতিদিনের মত ক্লাসে পড়তে বসেছি, মেঝেতে মাদুর পেতে বসে আমাদের ক্লাস হত, সামনে নীচু কাঠের ডেস্কের উপর আমরা বই রেখে পড়তাম বা খাতায় লিখতাম। হঠাৎ সিস্টার সেই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন এবং আমাদের সকলের দিকে তাকালেন যেন একটি দৃষ্টিতেই সমস্ত দেখে নিলেন, তারপর আমাদের কাছে এসে প্রত্যেককে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে বসতে বললেন, আমরা লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসলাম কিন্তু যাদের বসা তখনও তাঁর মনোমত হয়নি, তাদের তিনি মেরুদণ্ড সোজা রেখে কিভাবে বসতে হয়, নিজে ঠিক করে বসিয়ে দেখিয়ে দিলেন, ও দৃঢ়ভাবে আমাদের বললেন, তোমরা সর্বদাই সোজা হয়ে বসবে; নীচু হয়ে কুঁজো হয়ে বা বেঁকেচুরে কখনো বসবে না। এই কয়েকটি মাত্র কথা বলেই তিনি আবার চলে গেলেন।······

সেদিন সিস্টারকে দেখে তাঁর ছবি যেন মনে আঁকা হয়ে গেল। সিস্টার যখন স্কুলে ছিলেন না, তখন প্রায়ই শুনতাম তিনি অল্পদিনের মধ্যেই আসবেন, তাঁকে দেখবার জন্য মন খুব ব্যস্ত হত, তাঁকে দেখতে পেয়ে মনে যে কি আনন্দ হলো, তা বলে বোঝান যায় না। সিস্টারকে যেন সাধারণের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা মনে হলো। প্রথম পরিচয়ে তাঁর খুব কাছে যাওয়া যায় না, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয় মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে, কিন্তু অল্প দিনের ভিতরেই সিস্টারের ভালবাসার আকর্ষণী শক্তি যে কত প্রবল তা বুঝতে দেরী হলো না।···

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারে নিবেদিতা আমাদের জীবনস্বরূপ হয়ে পড়লেন, তাঁকে আমাদের কি যে ভাল লাগত, তিনি কখন আমাদের কাছে আসবেন ও কিছু বলবেন সেইজন্য আমরা উন্মুখ হয়ে থাকতাম। তাঁর কোন প্রয়োজনে লাগলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না।···

গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রণামের উপর সিস্টার অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। স্কুলের ছুটির পর বাড়ি যাওয়ার আগে আমাদের প্রত্যেককে তিনি নমস্কার করাতেন। একবার আমাদের ক্লাসে ছুটি মাদ্রাজী মেয়ে ভর্তি হয়েছিলেন।...মেয়ে ছুটি প্রথম দিনে ছুটির পব নমস্কার না করেই চলে যাচ্ছিলেন। সিস্টার তখনই আবার তাদের ফিরিয়ে নমস্কার করিয়ে তবে ছুটি দিলেন। আমাদের পূর্বকালের হিন্দু রমণীদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, ভক্তি, সেবাপরায়ণতা, আশ্রিত-বৎসলতা ও সরলতা যেন আমারা কখনো হারিয়ে না ফেলি, সেজন্য বারবার আমাদের বলতেন। তিনি বলতেন আমাদের পুব পিতামহীদের অনেকে বহু পরিজনের মধ্যে সংসারের সেবাকার্যের ভিতরে ডুবে থেকেও আনায়াসে এত উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌঁছাতে পেরেছিলেন, যা তপস্যা দ্বারাও সম্ভব হয় না।...

একবার ছুটির আগে সিস্টার আমাদের মিউজিয়ামে বেড়াতে নিয়ে যান।...আমরা কয়েকজন গাড়িতে তাঁর সঙ্গে ছিলাম। কিসমিস আখবোট প্রভৃতি মেওয়া মিশানো একটি কাগজের বড় ঠোঙা তিনি প্রফুল্লদিদির হাতে দিয়ে আমাদের ভাগ করে দিতে বললেন।...প্রফুল্লদিদি আমাদের সকলের হাতে ভাগ করে দিয়ে সিস্টারকে হাত পাততে বললেন, এবং নিজের জন্য সামান্য মাত্র বেখে, সিস্টার বুঝতে পারার আগেই সবটা তাঁর হাতে ঢেলে দিলেন। সিস্টার তখনই প্রফুল্লদিদির দুষ্টামি বুঝতে পেরে বললেন, 'দুষ্টু মেয়ে, দেখি তোমার কতটা আছে?' কিন্তু প্রফুল্লদিদি 'আমার অনেক আছে' বলে আর কিছুতেই ঠোঙা খুলে দেখালেন না। কিন্তু সিস্টার রাগ না করে এমন মিষ্টি ভাবে হাসলেন, যেন তাঁর হাসিতে এই কথাই বলতে চাইছিলেন: 'এটাই এদেশের মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক, অন্যের জন্যই তারা ব্যস্ত হয়। নিজের জন্য কিছুই রাখতে চায় না।' মিউজিয়ামের যে ঘরটি আমরা দেখবো বলে এসেছিলাম, সেটি তখন চুণকাম ও মেরামত হচ্ছিল, অনেকগুলি মিস্ত্রি সেই ঘরে কাজ

করছিল। তাদের মধ্যে একজন কুলি বোধহয় ক্লান্ত হয়ে একপাশে কাপড় বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সিস্টার তার কাছে এসেই একেবারে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাদের কথা বলতে বা কোন শব্দ করতে বারণ করলেন। পাছে তার ঘুম ভাঙে, সেজন্য নিজে, অতি সন্তর্পণে আস্তে আস্তে চলতে লাগলেন, আমরাও খুব সাবধানে তাঁর পিছনে চলেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কুলিটি তৎক্ষণাৎ জেগে সামনেই সিস্টারকে দেখে ভীত ও চমকিত হয়ে 'মেমসাব' বলে সেলাম করে উঠে দাঁড়াল। সিস্টারের তখনকার অনুতপ্ত মুখ ভুলবার নয়। তিনি যত তাকে আবার ঘুমাবার জন্য বারবার অনুরোধ করেন, ততই সে কোন কিছু অপরাধ করে ফেলেছে মনে করে ভীত হয়ে পড়ে, কারণ এইরূপ মেমসাহেব সে কখনো দেখেনি, এ ব্যবহার তার বুঝতে পারা সম্ভব নয়। সিস্টারের সেই করুণাময়ী মূর্তি এখনো আমার মনে হয়।...

সিস্টারের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন ছোট ছোট কত সময়ের কত ঘটনার কথা স্মরণ হয়। আর সিস্টারের সেই তেজোময়ী অপরূপ মূর্তি, তাঁর সেই পরিচ্ছদের বিশেষ ধরন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, সেই অপার্থিব মধুর হাসি আবার মনের মাঝে শুভ্র শতদলের মত বিকশিত হয়ে ওঠে। সিস্টারের উপদেশ হয়তো আমাদের জীবনে ফলবতী হয়নি, কিন্তু তাঁর অমৃতময়ী স্বর্গীয় স্মৃতি চিরদিনের মত আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে স্মৃতি কখনো ভুলবার নয়।

একদিন আমার বাবা সিস্টার নিবেদিতার হাতে আমাকে সঁপে দিয়েছিলেন। দুবাহু প্রসারিত করে সেদিন জননীসমা নিবেদিতা আমাকে টেনে নিয়েছিলেন তাঁর বুকে। কি যে পেয়েছি তাঁর কাছে, কি যে দেখেছি তাঁর মধ্যে তার তুলনা নেই। কতদিনের কত কথা —কি ছেড়ে কি বলব ভেবে পাইনে।

লেডী অবলা বসু ছিলেন সিস্টারের বন্ধু। একদিন তিনি আমাদের বিদ্যালয় দেখতে এসেছিলেন। সিস্টার তাঁকে আমাদের শ্রেণীতে নিয়ে আসেন। বোর্ডে জ্যামিতির একটা প্রশ্ন দিয়ে এক একটি করে মেয়েকে ডেকে বোর্ডে গিয়ে উত্তরটি দিতে বলেন। একে একে কয়েকটি মেয়ে গিয়ে চেষ্টা করেও সঠিক উত্তর দিতে পারে না। আমি অঙ্কে ছিলাম কাঁচা, তবুও কেমন করে জানিনা সেদিন নির্ভুল উত্তর দিতে পারি। তখনি সিস্টার খুশী হয়ে ছোট বালিকাটির মত হাত তালি দিয়ে বার বার বলতে লাগলেন, 'আমার মেয়ে পেরেছে, আমার মেয়ে পেরেছে।' এখনো সিস্টারের সেই বালিকাসম সরল আনন্দোৎফুল্ল মুখ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

বালবিধবা ছাত্রীদের প্রতি সিস্টারের সহানুভূতি, স্নেহ ও সতর্ক দৃষ্টির যেন সীমা ছিল না। একাদশীর দিন আমার শুষ্ক মুখ তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত করত। তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধে প্রতি একাদশীর দিন তাঁর দেওয়া মিষ্টি ও দুধ কিংবা ঘোল খেতে হত। এক একাদশীর দিনে নানা কাজের ব্যস্ততার জন্য আমাকে খাওয়াতে তিনি ভুলে যান; বিকালে জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িতে চলে যান, সেখানে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাকালে হঠাৎ তার ভুলের কথাটি

মনে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার মাঝখানেই তিনি লাফিয়ে উঠে পড়েন এবং তাড়াতাড়ি স্কুলে ফিরে আসেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দারোয়ান পাঠিয়ে আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। আমি যাওয়ামাত্র তিনি আমাকে দু'হাতে তাঁর বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে অশ্রুসজল নয়নে বার বার আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, 'ও আমার মেয়ে, আমি খেয়েছি, কিন্তু তোমাকে খাওয়াতে ভুলে গিয়েছি।' সেদিন তাঁর সেই স্বর্গীয় স্নেহসুধাসিক্ত হয়ে আমিও অভিভূত হয়েছিলাম এবং আজও অভিভূত হই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দেশের ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর তাঁর [ভগিনী নিবেদিতার] প্রভাব ছিল বিস্ময়কর! তার কারণ সে যুগে জাতীয় চেতনার বেদীমূলে প্রাণের প্রদীপটি অনির্বাণ শিখায় যিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি হলেন ভগিনী নিবেদিতা।

১৮৯৫ থেকে ১৯১১। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে এক মহান আত্মার সংস্পর্শে যে দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তীব্র রশ্মি বিকিরণ করে তা নির্বাপিত হলো ১৯১১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে। কেবল ষোলটি বৎসর। তার মধ্যে মাত্র আট বৎসর তিনি অতিবাহিত করেছেন ভারতবর্ষে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে কি বিরাট শক্তির স্ফুরণ ঘটেছিল তার দেহ ও মন অবলম্বন করে! বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কী, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।'

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যা। মার্গারেট নোবলের অন্তরে তখন পরম সত্যকে জানবার জন্য এক বিপুল আলোড়ন। সেই সঙ্গে মহত্তম কোনও আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গের এক অব্যক্ত প্রেরণায় হৃদয় অধীর। জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আহ্বান করলেন, 'ওঠো, জাগো, মহাপ্রাণ, জগৎ দুঃখে ক্লেশে দগ্ধ হচ্ছে। তোমাদের কি নিদ্রা সাজে?' অন্তরের সুপ্ত বহ্নি উদ্দীপ্ত

হলো। মার্গারেটের মহাপ্রাণ সে আহ্বানে জেগে উঠল। তাঁর নিজের মতে তখনই তাঁর ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ এল।

ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষ। পিছনে পড়ে রইল পরিবার, সমাজ, স্বদেশ, নিশ্চিন্ত জীবন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি পদার্পণ করেন ভারতে। মার্চ মাসে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করে নাম দিলেন নিবেদিতা। সে নিবেদন কী জগন্মাতার পদতলে অথবা ভারতমাতার সেবায়? নিবেদিতার কাছে জগজ্জননী ও দেশজননী এক হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। তারই সাধনায় তাঁর তিল তিল করে আত্মদান।

নিবেদিতা ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন। সে ভালবাসার স্বরূপ অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে কঠিন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে লিখেছিলেন, 'এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কীরূপ, তা তুমি ধারণা করতে পার না। এদেশে আসবার পর তুমি নিজেকে অর্ধ উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে, তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা।' ভারতের এই পরিচয়ের সত্যতা উপলব্ধি করতে তাঁর বিলম্ব হবার কথা নয়। সুতরাং ভারতে আগমনের পূর্বে যদি ভারত সম্বন্ধে তাঁর কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা বা মোহ থেকে থাকে তবে নিশ্চয়ই তার অবসান ঘটেছিল। কিন্তু নিবেদিতার অনুতাপের কোন কারণ ঘটেনি। 'ভারতের পক্ষে যা কিছু ভারতীয়, তা যতই অর্থহীন ও তুচ্ছ হোক আমার কাছে নমস্য।' গুরুর নিকট দিব্যদৃষ্টি লাভ করে ভারতের অন্তরাত্মাকে তিনি চিনেছিলেন। তাঁর জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর স্বামীজী এক নূতন আলোকপাত করেছিলেন। ভারতের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও একাত্মবোধ পরিপূর্ণরূপে ঘটেছিল—বিন্দুমাত্র ফাঁক সেখানে ছিল না। বিদেশী সংস্কার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে তিনি মনেপ্রাণে খাঁটী ভারতীয় হয়েছিলেন। 'এই জীবনে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর' কবির একথাটি বোধহয় আক্ষরিক অর্থেই তাঁর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলে।

তারপর থেকে নিবেদিতার কর্মজীবনের শুরু। কিন্তু সে কর্ম অধ্যাত্মযোগশূন্য নয়। ধ্যানে তিনি ভারতমাতার মহিমময় রূপ দর্শন করেছেন, জপ করেছেন নিরন্তর ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, আর প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি কার্যে, প্রতি চিন্তায়, আচরণে সেই ভারতেরই সেবা করে গেছেন। 'আমি বিশ্বাস করি, ভারতের বর্তমান তার অতীতের সঙ্গে দৃঢ়সংবদ্ধ, আর তার সামনে রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।' এই গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সমাহিত চিত্তে তিনি কাজ করে গেছেন।

ভারতবাসের প্রথম যুগে তাঁর স্বপ্ন ছিল ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন। বিদেশী শাসকের শাসন ও শোষণ নীতি যখন সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল তখন সম্পূর্ণভাবে মোহমুক্ত নিবেদিতা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ভারতের মুক্তির জন্য ভারতবাসীকে জাতীয় চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শুধু জগতের সামনে ভারতকে পরিচিত করা নয়, ভারতের মর্মবাণী ভারতবাসীর হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। প্রয়োজন প্রতি ভারতীয় ভাষায় মহৎ সাহিত্যের রচনা ও অনুশীলন। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই মৌন অতীতকে মুখর করে তোলা যায় এবং আপাতনৈরাশ্যপূর্ণ বর্তমানকে জাতীয়তার ভাবে উদ্দীপ্ত করাই প্রকৃত কাজ। অতএব জাতীয়তার আদর্শ সৃষ্টি করাই বর্তমান ভারতবাসীর ও তার সাহিত্যিকদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। নিবেদিতা স্বয়ং কী নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে সাহিত্যের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে এই ঐক্যবোধ জাগ্রত করবার চেষ্টা করেছেন তার প্রমাণ তাঁর রচিত পুস্তকগুলি।

অজস্র প্রবন্ধ, পত্র ও বক্তৃতার মাধ্যমে জাতীয়ভাবে মানুষ গঠনের ব্রত নিয়ে নিবেদিতা ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উল্কার গতিতে পরিভ্রমণ করেছেন। ভারতের মর্মকথা এমনভাবে বোধহয় আর কেহ উপলব্ধি করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন, 'বর্তমান ভারত একটি সমস্যা। তার অতীত ইতিহাসের আলোকেই

কেবল এই সমস্যাকে জানা যায়। অনুরাগের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার অতীত অধ্যয়ন করলে তবেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব তার প্রকৃত স্বরূপ, তার ক্রমবিকাশের অর্থ—এবং তার সুপ্ত শক্তির প্রকাশ কীভাবে ঘটতে পারে।'

ভারতবাসীকে আহ্বান করে দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষ এক বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। তার চতুঃসীমানার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে যেসব সন্তান তাদের প্রত্যেকের উপর দায়িত্ব—ভারতমাতার সেবায় আত্মনিয়োগ। প্রত্যেকটি জীবন—যতই সাধারণ হোক্, ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।'

তিনি আরও বলেছিলেন, 'ভারতবাসী এতদিন তাদের দুর্বলতার কথাই কেবল শুনে এসেছে। এখন সময় এসেছে তাদের নিজ শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হবার—এবং সেই শক্তিকে প্রমাণ করবার জন্য তাদের অগ্রসর হতে হবে।'

নিবেদিতা বলতেন, 'প্রতীচ্যের কাছে সভ্যতা যে বস্তু, আমাদের কাছে ধর্ম (righteousness) তাই। এই ধর্ম রক্ষার জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে হবে।'

ভগিনী নিবেদিতার অভিধানে নিরাশা শব্দটি ছিল না। তাই তাঁর কণ্ঠে সেদিন ভারতের অবশ্যম্ভাবী পুনরুত্থানের কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছিল—'বিপ্লব ও বিবর্তনজনিত ক্লান্তি ও অবসাদের ফলে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের প্রকৃত সমস্যার জাতীয়মনের পরিচিতি ঘটে ওঠেনি; এবং তার স্বরূপও ভাষায় রূপায়িত হতে পারেনি। আজ প্রথম পর্বের শেষ। ভারতীয় জীবন আর জড়তাগ্রস্ত নয়; সে এক নূতন শক্তির সন্ধান লাভ করেছে; এবং বর্তমান ও বিগতকালের সমগ্র জীবনকে বিশ্লেষণ করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তারই পটভূমিকায় ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে তুলতে সে আজ কৃতসঙ্কল্প।'

আজ যখন মনে হয় বর্তমান যেন হতাশার অন্ধকারে আবৃত, ভবিষ্যৎ আলোকের আভাস দেখা যায় না, হৃদয় নৈরাশ্যে পীড়িত,

তখন ভগিনী নিবেদিতার এই দৃঢ় আশ্বাসবাণী আমাদের নূতন করে উৎসাহ দান করবে, হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করবে। নিবেদিতা যখন প্রথম ভারতে পদার্পণ করেন, প্রধানতঃ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের নারীজাতির শিক্ষাকার্যে সহায়তা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, 'আমার স্বদেশের নারীগণের উন্নতিকল্পে আমার কতকগুলি সংকল্প আছে, আমার মনে হয়, ঐগুলি কার্যে পরিণত করতে তুমি বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে পার।' ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর কালীপূজার দিন স্বামীজীর সংকল্পিত একটি মহৎকার্যের উদ্বোধন হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমা নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন পূজা সম্পন্ন করে ভাবী ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন।

একদিকে ভারতের জাতীয় চেতনা উন্মেষকল্পে তাঁর বিশাল ও মহৎ হৃদয়ে কত চিন্তা, কত পরিশ্রম! আর একদিকে ধরিত্রীর মত একান্ত স্নেহ ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টির লালন পালন! আমাদের এই বিদ্যালয় ছিল ভগিনী নিবেদিতার সাধনপীঠ। ধন্য আমরা, যারা বিদ্যার্থীরূপে, কর্মীরূপে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছি। তাঁরই তপস্যার বলে বিদ্যালয় আজ অগ্রগতির পথে। নিবেদিতা নিজেও মনে করতেন, শ্রীশ্রীমা, যুগাচার্য স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতাদের আশীর্বাদ-ধন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ভারতে নব জাগরণের উদ্বোধন-মন্ত্রস্বরূপ হবে।'

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন আমাদের মহান্ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হই। তাঁর অমর জীবনী ও বাণী যেন ভুলে না যাই বা অপরকে স্মরণ করিয়ে দিতে বিস্মৃত না হই। তিনিই আমাদের পথ প্রদর্শিকা—তাঁর নিবেদিত জীবন সামনে রেখে আমাদেরও আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। তাঁরই কথা উচ্চারণ করে বলি, 'সত্যকেই যে কেন্দ্র করে চলে উৎসাহ ও উদ্দীপনাই হয় তার অফুরন্ত পাথেয়; নৈরাশ্য তাকে প্রতিহত করতে পারে না।'

গ্রহান্তরনিক্ষিপ্ত উল্কাখণ্ডের মত একদিন অকস্মাৎ ভগিনী নিবেদিতা আমাদের দেশের স্থবির সমাজের উপরে এসে পড়লেন এবং দেখতে দেখতে আলোকে তেজে দাহিকা শক্তিতে চারিদিক উজ্জ্বল উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তাঁর এদেশে আগমনের ঘটনাকে গ্রহান্তরনিক্ষিপ্ত উল্কা ছাড়া আর কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, এ দেশের ইতিহাসের মধ্যে তাঁর কার্যকারণ-সূত্রের অভাবটা স্পষ্ট। আবার সেই উল্কা যেমন বায়ুমণ্ডলের সংঘর্ষে জ্বলে উঠে আলো দেয়, তেজ বিকিরণ করে, আলো ও তেজ বিকিরণ করতে করতে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে আসে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগে আকাশের গায়ে এঁকে দিয়ে যায় নীলাভ পীত অগ্নিময় স্বাক্ষর; আর কালের নিয়মে সে স্বাক্ষর যখন মিলিয়ে যায়, তখনো তার স্মৃতি ও প্রভাব অক্ষয় হয়ে বিরাজ করতে থাকে দর্শকের মনে। এই হচ্ছে নিবেদিতা ও তাঁর ইতিহাস।

এই বিদেশী মহিলা সাকুল্যে মাত্র পাঁচ ছয় বৎসর এদেশে বাস করেছিলেন—যদিচ শেষ বিশ্রামের স্থান এখানেই, জন্মভূমি থেকে অনেকদূরে তাঁর এই ধর্মভূমিতে। এই অল্প সময়ের মধ্যে নিবেদিতা এদেশের মনীষী সমাজের উপর যে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা সত্যই বিস্ময়কব। সত্য কথা বলতে কি, তৎকালীন কলকাতায় এমন কোন মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন না যিনি তাঁর প্রভাবাধীন হন নি। একেশ্বরবাদী রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবৈষ্ণব বিপিনচন্দ্র, বিপ্লবী ঋষি শ্রীঅরবিন্দ, রোমান ক্যাথলিক বৈদান্তিক ব্রহ্মবান্ধব, নিষ্ঠাবান হিন্দু রামেন্দ্রসুন্দর, এমন বিচিত্র পর্যায়ের আরও অনেক নাম করা যায়। স্বামীজীর কথা তুলছি না, কারণ তিনিই স্বামীজীর প্রভাবাধীন। তখন

জাতীয় চৈতন্যের নবোন্মেষের সময়, সকলেই চিন্তা করছেন, পথের সন্ধান করছেন, এমন সময়ে উল্কার ইসারা টেনে দিয়ে এসে উপস্থিত হলেন নিবেদিতা।

নূতন ভারতবোধ ছুটি স্বতোবিরুদ্ধ উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক। ভারতের আধ্যাত্মিক সত্তা সম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকে এদেশ সচেতন ছিল; রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ, শঙ্করের চতুর্মঠ স্থাপন, ধর্মাচার্যগণের ভারত প্রদক্ষিণ; এসব আধ্যাত্মিক চেতনার ফল। নূতন যুগের দাবীতে ভারতের রাজনৈতিক সত্তার বোধ ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র; অন্যপ্রান্তে তিলক ও গান্ধী, সকলেরই ঐ এক প্রচেষ্টা, ছুয়ে মেলাতে হবে, অসাধ্যসাধন করতে হবে। কেবল নেহরু একটু স্বতন্ত্র। এই অসাধ্যসাধন প্রক্রিয়ায় নিবেদিতার দান ও কৃতিত্ব অসামান্য, এখনো তার মাত্রা নির্দিষ্ট হয়নি; তাঁর জন্মের তারিখ এখন দ্বিতীয় শতকে পৌঁছলো, আশা করা যায় এবারে মাত্রা নিরূপণের চেষ্টা সফল হবে এবং তার ফলে দেশের ঐ অধ্যায়টি নূতন করে লিখতে হবে; সেই সঙ্গে অনেক পুরাতন অধ্যায়ে নূতন পাদটীকা সংযুক্ত হবে। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া অন্যায় হবে না যে, আজ দেশময় যে অশান্তি দেখা দিয়েছে, তার মূলে আছে একটা বিপরীত প্রয়াস। রাজনীতিকে আধ্যাত্মিকতাবর্জিত করবার প্রয়াস—বর্তমান অশান্তির মূল প্রেরণা। যদি তা সফল হয় (ভগবান না করুন) তবে স্বধর্ম ও বৈশিষ্ট্য বর্জিত ভারত ভাগ্যহতের গাদায় গিয়ে পড়বে, যার শেষ আশ্রয় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়। নিয়তির ইঙ্গিতে ও কালচক্রের অধীনে ঠিক এই সময়টাতে নিবেদিতার জন্ম-শতক পূর্ণ হলো, তাঁকে আর একবার স্মরণ করবার সুযোগ এলো। এ অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

কোন্ ভারতবর্ষে আমরা বাস করতে চাই স্থির করবার দিন এসেছে। একদিকে অন্নময় রূপ, একদিকে অন্নব্রহ্মময় রূপ। অন্নের

অবশ্যই প্রয়োজন আছে, নইলে প্রাণ বাঁচে না, কিন্তু সেখানেই কি শেষ। প্রাণের অতিরিক্ত যদি কিছু থাকে? তাই আবশ্যক অন্নব্রহ্মময়রূপের। যে-সব দেশ অন্নের অতিরিক্ত কিছু স্বীকার করে না, তাদের অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছি, তারা সুখে নাই, শান্তিতেও নাই। তবু সব দেখে শুনেও কি সেই পথেই অগ্রসর হতে হবে? আরও একটা পথ আছে; সে পথ প্রথমে দুর্গম ও সঙ্কীর্ণ, পরিণামে সরল ও প্রশস্ত; সে পথ অন্নব্রহ্মময় রূপের দেশে গিয়েছে; সেখানে রাজানীতি ও অধ্যাত্ম দুয়ে এক, একে দুই; শাসক ও সাধক দু'য়ে এক, একে দুই; সেখানে স্বপ্ন ও বাস্তব দুয়ে এক, একে দুই। যাদের কাছে এ আদর্শ নিছক স্বপ্ন বলে মনে হবে তাদের স্মরণ করিয়ে দি, কোনো লোকের বাস্তব যখন টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে পড়ে, তখনো এ স্বপ্ন অটুট থাকে, কারণ এ অলীক নয়, এ vision! মানুষের ইতিহাস এইসব স্বপ্নদ্রষ্টার সৃষ্টি। সেই অন্নব্রহ্মময় নবভারত স্রষ্টাদের অন্যতম প্রধান এই মহীয়সী নারী যিনি ভারতবর্ষের কাছে নিবেদিতা।

একটি বলিষ্ঠ আত্মনিবেদন

পম্পা মিত্র

সে কবেকার এক ভোরবেলার কথা! শীত-শীত হাওয়ায় ঘুমজড়ানো চোখ দুটোকে যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে ঠাকুমার হাত ধরে ঢুকেছিলাম মন্দিরের মত একটা বিরাট বাড়িতে। ওটা নাকি স্কুল, ওখানে পড়াশোনা করে বড় হতে হয়। বন্ধন-অসহিষ্ণু শিশু-মন স্কুলের সব কিছুকেই যে উষ্ণ অভ্যর্থনায় গ্রহণ করেছিল—এমন ভাববার কোন কারণ নেই। অনেক কিছুই ভাল লাগত না। যা ভাল লাগত—তার তালিকায় সবার আগে নাম ছিল ঠাকুরদালানের, যেখানে রোজ সকালবেলায় অনেকগুলো কচি-গলা আকাশে তাদের নির্মল প্রার্থনাকে ছড়িয়ে দিত। সেই ঠাকুর দালানেই তাঁর ছবি ছিল—আমাদের নিবেদিতার! সে বয়সে ছবিকে ছবির বেশি আর কিছু মনে হয়নি, শুধু জেনেছিলাম—তিনি ভগিনী নিবেদিতা। অনেক, অনেক দিন আগে আমাদের এই স্কুল তিনিই তৈরী করে দিয়েছেন। তারপর একটু একটু করে আরো বহুদিন প্রবাহিত হয়েছে। আমরা বড় হয়েছি—পরিচিত হয়েছি ভগিনী নিবেদিতা নামে এক মহান্ ঐতিহ্যের সঙ্গে। আর অনেকদিন পরে সেই শৈশবের দেখা তেল-রঙের ছবিকে ছাপার অক্ষরে স্পষ্ট হতে দেখেছি অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনায়—'সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময় নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রুপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হলো।… সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর।'—[জোড়াসাঁকোর ধারে]। অবনীন্দ্রনাথের এ বর্ণনায় লোকমাতা নিবেদিতার যে মূর্তি

ভাস্বর—তা অপার্থিব। প্রদীপ্ত অথচ স্নিগ্ধ। অনাড়ম্বর শুভ্রতায় আন্তরিক।

ভারতবর্ষের হৃদয় নিবেদিতাব এই করুণারূপা সত্তাকে বারে বারে, নানারূপে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছে। সুদূর সমুদ্রপারের এক দ্বীপ থেকে নিবেদিতা ভারতবর্ষের আদ্বিজ-চণ্ডাল মানুষের জন্য তাঁর এই হৃদয়খানি বহন করে এনেছিলেন—কোন বিরূপতা নয়, বিরোধিতা নয়—নয় কোন বিদ্বেষ। মিস্ মার্গারেট নোবল্ তাঁদেরই একজন ছিলেন যাঁরা তখন ভারতবর্ষের সর্ববিধ দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা—কিন্তু জাতি এবং পদমর্যাদার সে অপরিচয়কে সারা জীবনের সাধনা দিয়ে তিনি বহুদূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। এদেশে তাঁর পূর্বাপর একটিই পরিচয়—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।'

সংশয় ও অশান্তচিত্ততার এক সন্ধিমুহূর্তে তরুণী মার্গারেট প্রাচ্যবাণীর যোগ্যতম বাহককে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কোন সম্ভাবনা এবং আহ্বানের প্রতীক্ষায় মন তখন তাঁর চঞ্চল। সে আহ্বান—অভাবিত ভাবেই তিনি অনুভব করলেন স্বামী বিবেকানন্দের সাহচর্যে এসে! স্বামীজীর পরমতসহিষ্ণু ঔদার্য, তাঁর ধর্মপ্রচার ও ব্যাখ্যার যুক্তিশৃঙ্খলা মার্গারেটকে মুগ্ধ করেছিল। আনন্দের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—এই হিন্দু সন্ন্যাসী ধর্মের নামে তাকেই আহ্বান করেছেন মানবপ্রকৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সুন্দর—যা মানুষের 'অপরাহত মাহাত্ম্যকে' অবারিত করে। মার্গারেট তাঁকে আচার্যের বেদীতে স্থাপন করলেন এবং গুরুর সঙ্গে সেই জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাইলেন যে জগৎ নিরন্তর যন্ত্রণায়, পথভ্রান্তির বেদনায় দগ্ধ হচ্ছে।

অতঃপর ভারতবর্ষের মাটিতে এসে পৌঁছানোর পর্ব! স্বদেশ ও স্বজাতির অধিক মমতায় নিবেদিতা ভারতবর্ষকে আপন করতে চাইলেন। পরিণাম সর্বত্র শুভ হলো না। ভারতবর্ষের জনসাধারণের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, বহুতর কুসংস্কারের দৃঢ় বন্ধন এবং বহুদিনের দাসত্ব-বোধের ম্যুজতা তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে আহত করতে ছাড়লো না।

কিন্তু নিবেদিতা—তাঁর আচার্যের ভাষায়, এদেশে 'গুরুগিরি' করতে আসেন নি। আর পাঁচজন মিশনারীর মত অজ্ঞ ভারতবাসীকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবার পথ-নির্দেশ করতেও তাঁর আসা নয়। নিবেদিতা আমাদের জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠতম নৈবেদ্যটি এনেছিলেন —আপন প্রাণ। সাধারণ নারীর অতি সীমায়িত সুখ-দুঃখের গণ্ডিতে তাঁকে বাঁধতে যাওয়ার চেষ্টা—অপপ্রয়াস মাত্র। তবুও বলি—স্বদেশে এই কুশাগ্রধী, অনমনীয় ব্যক্তিত্বময়ী মহিলার জন্য যশ এবং প্রতিষ্ঠা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কর্মমুখর সে জীবনকে অনায়াসে পরিত্যাগ করে নিবেদিতা পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য নিয়ে ভারতবর্ষের কাছে এসেছিলেন। এবং এই নিবেদনের ঐকান্তিকতায় কোন ফাঁক ছিল না। তাঁর শরীর, আশৈশবলালিত য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁর আত্মীয় পরিজনের সনির্বন্ধ অনুরোধ, স্বদেশবাসীর তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা এবং যাদের জন্যই তিনি সমর্পিত-অস্তিত্ব, সেই আপামর ভারতবাসীর ঔদাসীন্য, দুর্বলতা, ত্যাগস্বীকারে অনীহা কিছুই তাঁকে প্রতিহত করতে পারেনি।

এই প্রশান্ত আত্মনিবেদন প্রথমতঃ তাঁর গুরু ও তাঁর আদর্শের প্রতি, দ্বিতীয়তঃ তাঁর আচার্যের বহুদুঃখহত দেশ ও দেশবাসীর প্রতি। এই আত্মনিবেদনের প্রকাশে তিনি লোকজননী—ভারতবর্ষের জাতিবর্ণ-ধর্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষ মানুষের প্রতি সুনিবিড় মমতায় কল্যাণময়ী। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবলোকে যে ভারতবর্ষকে নিবেদিতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন—সে ভারতবর্ষকে তিনি বন্দনা করেছেন প্রেমে, করুণায়, মৈত্রীতে।

ধর্মকে কেন্দ্র করে অদ্যাবধি যত বিদেশী ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েছেন নিবেদিতাই তাঁদের মধ্যে একমাত্র—যিনি দল তৈরী করার জন্য আসেন নি। ভারতবাসীর সব দোষ, ত্রুটি এবং অজ্ঞতাকে মেনে নিয়েও তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই ছিল তাঁর সর্ববিধ প্রচেষ্টা। নিবেদিতার স্পর্শাতুর মন, তাঁর অতিরিক্ত আবেগায়িত মানসিকতা

ভারতবর্ষে এসে বহু আঘাতকে মাথা পেতে নিয়েছে। গোপন অশ্রু ঝরেছিল কিনা—সে কথা জানা নেই, কিন্তু নিবেদিতা অসহিষ্ণু হয়ে তাঁর আরব্ধ কাজ ত্যাগ করেন নি—এ সত্য ইতিহাসের অনুমোদন পাবে। ভারতবর্ষের দরিদ্র, অশিক্ষিত, মূর্খ মানুষগুলির জন্য বহু philanthropist তাঁদের অর্থ ব্যয় করেছেন, বহু সমাজহিতৈষী দিয়েছেন সময়, কোন কোন দরদী তাঁর জীবন পর্যন্ত—কিন্তু নিবেদিতা সেই বিরলতম মানুষগুলির একজন, যাঁরা তাদের জন্য আপন হৃদয় উৎসর্গ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন,—'তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই।···তিনি যখন বলিতেন our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না।'

এই 'our people'-কে নিবেদিতা খুব কাছ থেকে স্পর্শ করেছেন। গণ্ডগ্রামের কোন সাধারণ মুসলমান রমণীর প্রতি তাঁর সৌজন্য অকৃত্রিম শ্রদ্ধার মিশ্রণে আন্তরিক হয়ে উঠেছে, বাগবাজারের সংকীর্ণ গলির নিরালোক বিদ্যালয়টির ছাত্রী সংখ্যা বাড়াবার জন্য অভিভাবকের কাছে আক্ষরিক অর্থেই নতজানু হয়েছেন, প্লেগে মরণাপন্ন শিশুর শেষমুহূর্তের শয্যায় উপস্থিত থাকতে দ্বিধাগ্রস্ত হন নি, একাদশীর দিন বালবিধবা ছাত্রীর জন্য আহার্য রেখেছেন—সযত্নে, নিজের স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে। এ তাঁর ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে, বলা ভালো—তাঁর আচার্যের শিক্ষানুযায়ী জীবের মধ্যে শিবকে সন্ধান ও প্রত্যক্ষ করার অসাধারণ দৃষ্টিরই ফল।

স্বদেশের দুঃখদুর্দশায় কাতর বিবেকানন্দ আরব্ধ কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বারবার দেহধারণের দুঃখ বহন করতে প্রস্তুত ছিলেন। আচার্যের সে বাণী নিবেদিতার আজীবন প্রেরণার উৎস। ভারতবর্ষ আর তার মানুষ তাঁর কাছে ছিল 'প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ'।

ভারতবর্ষের লোক-সাধারণ তাঁর হৃদয়ের ধন ছিল। তিনি উপকারের অনুগ্রহ দিয়ে তাদের ধন্য করতেন না, যথাসাধ্য প্রয়াস পেতেন তাদের ব্যক্তিগত আনন্দ বেদনার অংশ নিতে। ভারতবর্ষের ধর্ম-কর্ম, তার লোক সমাজে প্রচলিত উপকথা, গল্প-কাহিনী, তাদের পৌত্তলিক পূজা পদ্ধতি, জীবনযাত্রার বহুবিধ ভঙ্গি ও বৃত্তান্ত তিনি জননীর মমতায় পর্যবেক্ষণ করতেন। এই মাতৃস্নেহের করুণা ও কোমলতা তাঁর আচারে, অবয়বে, আগ্রহে, আবেগে সর্বদাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। তাঁর স্নেহে কোথাও আত্ম-ঘোষণার ফাঁক ছিল না বলেই ছাত্রীদের কাছে তাঁর আসনের মর্যাদা ছিল জননীরই মত। পল্লীবাসীর হৃদয়ে বিদেশিনীর জন্য যে প্রীতি ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়েছিল তার মূলদেশে কোন জাতিগত বিভেদ আর শিকড় ছড়াতে পারে নি। নিবেদিতা তাঁর মাতৃত্বের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বমাতা সারদার কাছে। এ শিক্ষা বিফলে যায়নি। ভারতবর্ষের অন্তর্লোক জয়ে তাঁর এই পরমাশ্চর্য সিদ্ধির কারণ নির্দেশ করে 'The web of Indian life' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'She had won her access to the inmost heart of our society by her supreme gift of sympathy···She lived our life and came to know us by becoming one of ourselves···And because she had a comprehensive mind and extraordinary, insight of love she could···discover our soul.'

কিন্তু ভুললে চললে চলবে না নিবেদিতার শ্বেতবস্ত্রাবৃত যে ছবি আমাদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে সে মূর্তির আবক্ষ প্রলম্বিত ছিল রুদ্রাক্ষের মালা! বস্তুতঃ নিবেদিতা চরিত্রের পূর্ণতা সম্পাদিত হয়েছে দুই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে। এক দিগন্তে তিনি করুণাময়ী জননী, আত্মনিবেদনের সৌন্দর্যে মহিমাময়ী। অপর দিগন্তে তিনি নিরন্তর সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা। মিশ্রিত তাঁর প্রকৃতি ললিতে-কঠোরে। একদিকে তিনি যেমন জননীর করুণায় আপ্লুতা অপরদিকে

সেই মাতৃস্নেহ আবার শাবক পরিবৃতা ব্যাঘ্রীর মতই প্রচণ্ড। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই নিবেদিতা এক নারী-দুর্লভ সম্পদের অধিকারিণী—সে তাঁর দৃঢ়কঠোর ব্যক্তিত্ব। রেক্সহ্যাম চার্চের অধীনে থেকে মার্গারেট যখন সমাজ সেবার ব্রতে নিয়োজিত তখন সাহায্যদানের ব্যাপারে চার্চের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। চার্চের সাহায্য নির্দিষ্ট নিয়ম বন্ধনের মধ্যে। মার্গারেট চান দুঃস্থমাত্রকেই নির্বিচারে সাহায্য করতে। আপোষ-মীমাংসা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সুতরাং চার্চ ত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত অভ্রস্পর্শী ব্যক্তিত্বকেও তিনি নানা প্রশ্ন, নানা তর্কে যাচাই করেছেন—আনুগত্য স্বীকার তারও পরে। পরবর্তী জীবনে এই ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা তাঁকে সর্ববিধ অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যেখানে মানিয়ে চলা যাবে না সেখানে মিলিয়ে চলার প্রশ্ন তাঁর মনে উঠতই না। তা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। স্বভাবে তিনি ছিলেন বিনম্র পরিপূর্ণ আত্ম-উৎসর্জনের পর নিজের জন্য হাতে তিনি আর কিছুই রাখেন নি। সে নিবেদনকে উচ্চকিত ঘোষণায় জগতের সামনে আনতে তাঁর স্পষ্টতঃই বিরাগ ছিল। কিন্তু তাই বলে নিতান্ত দুর্বলভাবে বিলুপ্ত হয়ে যেতেও তাঁর সম্মতি ছিল না। সর্বোপায়ে যা তিনি সত্য বলে মানতেন ও জানতেন,—তার জন্য কঠোর হতে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না।

ভারতবর্ষের অপমানে তাঁর চোখ সজল হত কিন্তু কণ্ঠস্বরে থাকত বিদ্যুতের জ্বালা। রেলের কামরা থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম-ক্ষেত্র—কোথাও ভারতবাসীর অবমাননা তিনি সহ্য করতে অপারগ ছিলেন। শাসক সম্প্রদায়ের কোন অন্যায়, কোন অবিচার তাদের আঘাত করতে উদ্যত হলে সেখানে তাঁর তেজ উঠত প্রদীপ্ত হয়ে। বহুবার বহু বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর মনোবল ভেঙে দিয়েছে, বহু নীচতায় ক্লিষ্ট হয়েছে প্রাণ, আপন সামর্থ্যের বাইরে এসেও মিটিয়েছেন বহু অযোগ্যের অসঙ্গত আবদার। একমাত্র উদ্দেশ্য—নিকটতম বন্ধুর

কাছ থেকেও এ হীনতাকে গোপন রাখা। বিদেশীর কাছে যারা গেছে অধিকারের দাবি নিয়ে নয়—পদলেহীর ঘৃণ্যতা নিয়ে, তাদের জন্য তাঁর রোষ ছিল বজ্রাগ্নির মত তীব্র। তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় পতাকার কেন্দ্রপ্রতীক বজ্র—তাঁর এই সংগ্রামী মনোভাবেরই এক শিল্পসম্মত বহিঃপ্রকাশ। এ সংগ্রামমুখীনতা একেবারে অন্তর্লোক থেকে উৎসারিত বলেই নিবেদিতা সন্ত্রাসবাদের আগ্রহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এরই জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম পরাধীন জাতির জাতীয় সঙ্গীত সগৌরবে সোচ্চারে গীত হয়েছে, এরই জন্য, বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে বিদেশী সরকারের অর্থসাহায্য তিনি সদর্পে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

নিবেদিতা এক অগ্নিকণার নির্ধূম হোমানলে পরিণত হওয়ার ইতিহাস। কোমল-কঠোরের এ আপাতবিরোধী সমন্বয় নিবেদিতার চরিত্রে মানবাত্মার সেই অপরূপ মহিমাকেই অনাবৃত করেছে যা মর্ত্যসীমাকে বারবার চূর্ণ করে স্বর্গ-প্রাঙ্গণ পর্যন্ত আপন অধিকারকে বিস্তারিত করে।

গুরু-বন্দনা — ভগিনী নিবেদিতা

আজ সন্ধ্যায় আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু বলিবার জন্য। স্মরণ রাখিবেন, আমি তাঁহার শিষ্যা. তাঁহার কন্যারূপেই আমার বক্তব্য নিবেদন করিব। ঐতিহাসিক বা সাংবাদিকের নিকট আপনারা যেরূপ আশা করিয়া থাকেন, আমার মহান্ গুরুর সম্পর্কে সেরূপ আবেগবর্জিত, নিরুত্তাপ ও নিরপেক্ষ সমালোচনা আমার পক্ষে অসম্ভব। নিজের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ অন্তরের কাহিনীই আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে আসিয়াছি।

* * *

হে আমার আচার্যদেব! আমি কি সত্যই আপনার জীবনালেখ্য রচনা করিব? হায়, আমার পক্ষে উহা সম্ভব নহে। বিভিন্ন মতাবলম্বী বহু ব্যক্তিকে, আপনি কত বিচিত্র উপায়ে তুষ্ট করিয়াছেন! আমি কি উহার সব উপলব্ধি করিতে সক্ষম? ভারতবাসীর হৃদয়ে আপনার কোন্ রূপটি সর্বাপেক্ষা অধিক সাড়া জাগায়?—গোঁড়া প্রাচীনপন্থী অথবা নবীনপন্থীর নিকট আপনার কোন্ রূপটি অধিকতর প্রিয়? সে কি শৈশবে ক্রীড়ারত আপনার শিবযোগিবেশধারী ধ্যানমগ্ন রূপ?—অথবা ভিক্ষুক বৈরাগীর আহ্বানে আত্মহারা সেই অপূর্ব রূপটি? পরবর্তী কালে ভিক্ষাপাত্র হাতে যখন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, সেই রূপ?—অথবা সুদূর বিদেশে মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইয়া যখন আপনি বিদেশীর নিকট উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন আপনার জাতীয় সম্পদ—যখন আপনার কম্বুকণ্ঠে ভারত নিজ নাম বিঘোষিত হইতে শুনিয়াছিল—আপনার সেই রূপটিই কি ভারত-হৃদয়ে স্পন্দন জাগায়? কোন্ রূপেই বা আপনি পাশ্চাত্য

দেশের হৃদয় জয় করিয়াছেন? কোন্ দৃষ্টিতে আপনাকে দেখিয়াছিল আমেরিকাবাসী? ইংরেজ জাতির নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন কোন্ রূপে? বিভিন্ন সুরের খেলা যিনি জানেন, তিনিই কেবল তাঁহার কণ্ঠে যথাযথরূপে আপনার রচিত সেই সঙ্গীত-ধ্বনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন।

* * *

অতএব, আমি আপনার জীবনালেখ্য রচনার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিলাম। আমি নিজে যতটুকু দেখিয়াছি, হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, শুধু তাহারই বর্ণনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব। এই দেখা ও বোঝা কবে হইতে শুরু হইল, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে উহা বিস্তার লাভ করিতে লাগিল, কত স্মৃতি সঞ্চয় করিলাম—তাহারই কাহিনী শুনাইয়া যাইব। সে কাহিনী খণ্ড-ছিন্ন কাহিনী—তাহার অধিক নহে। তবু প্রার্থনা, সে কাহিনীর মধ্যে এখানে ওখানে আপনার কণ্ঠনিঃসৃত দুই একটি বাণী যেন প্রকাশ পায়, যেন তাহারই মধ্য দিয়া আপনার মহৎ অন্তঃকরণের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠে।

* * *

হিমালয়ের গোপন উৎস হইতে নির্গত হিন্দুধর্মের বিপুল স্রোতধারা তাঁহারই বাণীর মধ্য দিয়া নবীন সুশীতল প্রাণপ্রদ বারিরূপে ঝরিয়া পড়িয়াছে জগতের সকল বৌদ্ধিক ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে।

আমাদের অনেকের নিকটেই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তৃষ্ণার্তের নিকট সুশীতল পানীয়ের ন্যায় উপস্থিত হইয়াছিল।

* * *

তিনি এমন একজন মহান্ পুরুষ ছিলেন, যিনি ব্যর্থতার কথা কখনো কল্পনা করেন নাই,—যাঁহার বাণীর মধ্যে নেতিবাচক কিছু ছিল না। তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন—সবই প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ।

* * *

এই মহান্ সত্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রতীচ্যের

নিকট প্রাচ্যের ভূমিকা হইল গুরুর, শিক্ষাদাতার—স্তাবক অথবা ভৃত্যরূপে সে প্রতীচ্যের সমীপস্থ হইতে পারে না।

* * *

তাঁহার শিষ্য-শিষ্যাদের নিকট বিবেকানন্দ চিরকাল আদর্শ সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্তস্থল হইয়া থাকিবেন। জ্বলন্ত ত্যাগের মন্ত্রেই তিনি আমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

* * *

যাহা কিছু ভারতীয়, বিবেকানন্দের নিকট সে সকলই একান্ত-ভাবে সমান পবিত্র।

* * *

তিনি বলিতেন, 'মনে রাখিও যদি তুমি ভারতকে সত্যই ভালবাস তবে, ভারত বর্তমানে যেরূপ—তাহাকে সেইরূপেই ভালবাসিতে হইবে। ভবিষ্যতে তাহার যে রূপ তুমি কল্পনা করিতেছ —সেই কল্পনার ভারতকে ভালবাসিলে চলিবে না।'

* * *

তাঁহার মতে স্বদেশই স্বদেশের ভরসাস্থল, বিদেশ নহে।

* * *

এই মহান্ আচার্যের নিকট জগৎ শুধু ধর্ম, দর্শন বা ভারতীয় সমাধি সম্বন্ধেই জ্ঞান লাভ করে নাই। তিনি ছিলেন বিপুল প্রতিভা-প্রবাহের উৎস—জাতীয় প্রতিভার শাশ্বত সাক্ষীস্বরূপ।

* * *

যদি গুরুর সঙ্গে ভূ-প্রদক্ষিণ করা যায়, তাহা হইলে উহাই তীর্থযাত্রা হইয়া দাঁড়ায়।

* * *

নানাস্থানে পরিভ্রমণকালে—সর্বত্রই এমন সব সময় আসিয়াছিল যাহা কখনো ভুলিবার নহে, এমন সব কথা শুনিয়াছি যাহা আমাদের সারাজীবন ধরিয়া হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।…

এমন এক প্রেমের বিকাশ আমরা দেখিয়াছি, যে প্রেম ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রকেও, অজ্ঞান হইতে অজ্ঞানকেও আলিঙ্গন করিয়া এক হইয়া যায় এবং তাহারই দৃষ্টিতে তখন সমস্ত জগতকে দেখে, যেন তাহাতে কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই।

বিরাট প্রতিভার বিশাল খেয়ালে আমরা কৌতুক করিয়াছি, বীরত্বের উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছি—এ সমস্ত দিব্যলীলায় মনে হয় যেন বালরূপী ভগবান তাঁহার শিশুশয্যা হইতে জাগিতেছেন, আর আমরা দাঁড়াইয়া সাক্ষীস্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছি।

* *

আমরা এরূপ এক মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছি, যিনি সকল লোককেই নিজের কাছে আকর্ষণ করিতেন, সকলের বক্তব্য শুনিতেন, প্রত্যেকের সঙ্গে সহানুভূতি করিতেন, কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করেন নাই। যে দীনতার কাছে সকল দৈন্য দূরীভূত হয়, যে ত্যাগ অত্যাচারীর প্রতি প্রচণ্ড ধিক্কারে এবং উৎপীড়িতের জন্য অসীম করুণায় আত্মবলিদানে উন্মুখ, যে প্রেম তীব্র উৎপীড়ন এবং মৃত্যুর আসন্ন পদসঞ্চারকেও আশিষবচনে স্বাগত-সম্ভাষণ করে—সে দীনতা, সে ত্যাগ, সে প্রেম আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

* * *

এমনি মানুষের মাঝেই হয়তো বা আমরা পাইব ভবিষ্যৎ বেদের সন্ধান।

* * *

স্বামীজীর এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার নিকট যাঁহারা অবস্থান করিতেন তাঁহাদের সকলকে তিনি বড় করিয়া তুলিতেন। তাঁহার সান্নিধ্যে মানুষ তাঁহার জীবনের অনভিব্যক্ত মহৎ উদ্দেশ্য যেন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইত এবং দেখিয়া উহাকে ভালবাসিতে শিখিত। আর দোষ-ত্রুটিগুলির কালিমা যেন অনেকটা মুছিয়া যাইত, মনে হইত, জীবনের সম্যক বিকাশের জন্য ইহাদের সংঘটন যেন ঠিকই

হইয়াছে। স্বামীজীর শিষ্যারূপে আমি যে জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহার সম্বন্ধে আমার ক্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা, কতকটা পূর্বোক্ত ধরনের। এইরূপে প্রতি পদে তাঁহারই ভাবরাজি দ্বারা পরিবৃত ও তাঁহারই প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমি যেন কোন দেবলোকের স্নিগ্ধ জ্যোতির মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম, যেখানে প্রত্যেক নরনারী তাহাদের স্বভাবের অপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিত।

* * *

স্বামীজী কখনো তাঁহার নিজের ধারণাগুলি শিষ্যদের উপর চাপাইতে চেষ্টা করিতেন না। সেরূপ করিলে, তিনি স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝিতেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করা হইত।

একদিন আমি তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলাম, এমন সময় তথায় একখানি কালীপ্রতিমা আনা হইল। প্রতিমাখানিতে কোন একটি ভাব চকিতের মত লক্ষ্য করিয়া আমি সহসা বলিয়া উঠিলাম—'স্বামীজী, হয়তো মা কালী সদাশিবেরই ধ্যানযোগে উপলব্ধ মূর্তিবিশেষ। তাই কি?' তিনি আমার দিকে মুহূর্তের জন্য চাহিলেন। পরে স্নেহভরে বলিলেন, 'বেশ, তাই হোক, তোমার নিজের ভাবেই ওটি প্রকাশ কর।'

তিনি সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণের পদাঙ্কানুসারী চেষ্টা করিতেন, এবং তাঁহার নিজের কোন বাণীর উল্লেখ যেন তাঁহার নিকট অপরাধ বলিয়া বোধ হইত। এতদ্ভিন্ন, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, যে শক্তি শুধু ভাবপ্রবণতায় ব্যয়িত হয়, তাহা বৃথাই নষ্ট হয়; শক্তিকে সংযত করিলেই তাহা সঞ্চিত হইয়া কর্মরূপে প্রকাশ পায়। তথাপি, তাঁহার যথাসর্বস্ব লোককে দান করিবার প্রবল বাসনা তাঁহাকে অভিভূত করিত, এবং তিনি উহা জানিতে পারিবার পূর্বেই আবার তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে প্রেম ও আশাপূর্ণ চিন্তাসকল চতুর্দিকে ছড়াইতে থাকিতেন।...শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ কোন পুস্তক না পড়িয়াও

বেদান্তের মূর্তিমান সারনিষ্কর্ষস্বরূপ ছিলেন, শ্রীবিবেকানন্দও সেইরূপ জাতীয় জীবনের সারনিষ্কর্ষস্বরূপ ছিলেন।...তাঁহার গুরুদেবের প্রতি প্রযুক্ত তাঁহার নিজমুখের কথাতেই বলিতে হয়, 'তিনি শুধু সেই মহৎ জীবন যাপন করিয়াই খুশী ছিলেন, তাহার ব্যাখ্যা অপরে খুঁজিয়া বাহির করুক।'

* * *

ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামীজীর নির্ভীক উপদেশ এই যে, আমাদিগকে ব্যক্তিত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া ঐ সকলের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। আমাদিগকে শত্রুর জন্যও প্রার্থনা করিতে হইবে—এই আদেশ অপেক্ষা 'সাক্ষীস্বরূপ হও' এই আদেশই অধিক শ্রুত হইত। জগতে আমার কোন শত্রু আছে, এইরূপ চিন্তা করাই এই মনীষীর চক্ষে দ্বেষ বুদ্ধির প্রমাণ। তিনি বিশেষভাবে বলিতেন, প্রেম 'অহেতুক' না হইলে প্রেমই নহে ; পাশ্চাত্য বক্তা হইলে এই ভাবটিই 'উদ্দেশ্য বিরহিত' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বোধ হয় তাহাতে বক্তার জোর কতকটা কমিয়া যাইত।

* * *

এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে করিতে আমি বেশ বুঝিতেছি যে, ইহা যে বিশাল হৃদয়ের ভাষা, তাহার বিন্দুমাত্র আভাস আমি দিতে পারিব না। জগতের যে কোন লোকের অতি সামান্য কষ্টও যেন আমাদের গুরুদেবের হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়া যাইত না, আর কোন যন্ত্রণাই, এমনকি মৃত্যুযন্ত্রণাও যেন তাঁহার মুখ হইতে প্রেম ও আশীর্বাদ ভিন্ন অন্য কিছু বাহির করিতে পারিত না।...আমরা ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, সেদিন আমরা এমন কয়েকটি ঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে কাটাইয়াছি, যাহার উজ্জ্বল বিভায় আমাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন অতিবাহিত হইবে।

* * *

সচরাচর লোকে জিনিসকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে, তিনি তৎপ্রতি

আদৌ খেয়াল করিতেন না। অত্যধিক সফলতা লাভ করিয়াও তিনি কদাপি এতটুকু চমকিত বা সন্দিহান হইতেন না। বিস্মিত না হইবার কারণ—যে মহাশক্তি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য করিতেছিল, তাহার মাহাত্ম্য তিনি অতি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

কিন্তু কোন কার্যে বিফলমনোরথ হইলেও তিনি হতাশ হইয়া পড়িতেন না। জয়, পরাজয় উভয়ই আসিবে এবং চলিয়া যাইবে ; তিনি তাহাদের সাক্ষীমাত্র। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, 'যদি জগতটাই অদৃশ্য হয়, তাতেই বা আমার কি ? আমার দর্শনের মতে সেটা তো একটা চমৎকার জিনিস হবে।' পরক্ষণেই সহসা গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, 'কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যা কিছু আপাততঃ আমার প্রতিকূলে রয়েছে, সমস্তই শেষে আমার স্বপক্ষে আসবে। আমি কি তাঁর (মহামায়ার) সৈনিক নই ?'

* * *

পাশ্চাত্যের বিলাসিতার মধ্য দিয়া তিনি নির্ভীকভাবে এবং কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বিচরণ করিতেন। ভারতে আমি যেমন তাঁহাকে অবিচলিতভাবে সাধারণ লোকদের মত বস্ত্র ও উত্তরীয়মাত্রে আচ্ছাদিত হইয়া মেঝেয় বসিয়া হাতে করিয়া গ্রাস মুখে তুলিতে দেখিয়াছি, ঠিক তেমনই ভাবে কিছুমাত্র সন্দেহ বা সঙ্কোচ না করিয়া তিনি আমেরিকা ও ফ্রান্সের নানা ভোগবহুল জীবনকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'সাধু ও রাজা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। জগতের সব শ্রেষ্ঠ বস্তু ভোগ করা এবং সে সব ত্যাগ করা—এ দু'য়ের মধ্যে অতি অল্পই ব্যবধান।'

* * *

স্বামীজীর চক্ষে প্রত্যেক জাতির জাতীয়ত্ব বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ন্যায় অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া গণ্য হইত। তিনি মনে করিতেন, প্রত্যেকেই যেন আদর্শ মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে নিজের সমগ্র ধারণাটুকু প্রকাশ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। একবার তিনি সহসা বলিয়া

উঠিয়াছিলেন, 'যত বয়স হচ্ছে, ততই আমার মনে হচ্ছে যে, এক "মনুষ্যত্ব" কথাটিতেই জাতি বল, ধর্ম বল, সবারই সার নিহিত।'

* * *

কি পুরুষে, কি স্ত্রীতে, তিনি এই একমাত্র গুণের বিকাশ দেখিতে চাহিতেন—উহা বল (strength)। কিন্তু বল কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে তিনি কী কঠোরভাবেই না বিচার করিতেন। নিজেকে জাহির করা, অথবা অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস—এ দুই-এর কোনটির তিনি প্রশংসা করিতেন না। সেই প্রাচীনকালের মৌন মাধুর্য ও নিষ্ঠার আদর্শভূত চরিত্রসমূহে তাঁহার মন এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, কেবল বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা উহা আর আকৃষ্ট হইত না।…(তাঁহার মতে) যে রমণী যত বড় হইবেন, তিনি ততই চরিত্র-মনের রমণীসুলভ দুর্বলতাগুলিকে অতিক্রম করিবেন।

* * *

কিন্তু একটি জিনিস আচার্যদেবের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল ছিল—যাহাকে তিনি কিরূপে ঠিকমত রাখিবেন, তাহা নিজেই জানিতেন না—ইহা তাঁহার স্বদেশপ্রেম এবং স্বদেশের দুর্দশার প্রতীকারেচ্ছা।

কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহাকে প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতাম, দেখিতাম, ভারতের চিন্তা তাঁহার নিকট শ্বাস-প্রশ্বাস স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সত্য বটে, তিনি কোন বিষয়ের উন্নতি করিতে চাহিলে একেবারে উহার মূলে না গিয়া ছাড়িতেন না; তিনি 'জাতীয়ত্ব' শব্দটিও ব্যবহার করিতেন না, বা বর্তমান যুগকে 'জাতি গঠনের'ই যুগ বলিয়া ঘোষণা করিতেন না, তিনি বলিতেন, 'আমার কাজ মানুষ গড়া'। কিন্তু তিনি প্রেমিকের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর জন্মভূমিই তাঁহার আরাধ্য দেবতা ছিল।

* * *

স্পাইর্যালের (ক্রম সূক্ষ্মাকার পেঁচের) বৃত্তগুলি যেমন ঘুরিয়া

ঘুরিয়া মোটা হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিতে উঠিতে শেষে এক বিন্দুতে পর্যবসিত হয়, স্বামীজীর স্বদেশভক্তিরূপ আবেগও যেন সেইরূপ একটি বিরাট বস্তু ছিল; স্বদেশের মৃত্তিকার প্রতি ভালবাসা ও নিসর্গ প্রেমই ছিল উহার সর্বনিম্ন বৃত্তগুলি; জাতি, অভিজ্ঞতা, ইতিহাস এবং চিন্তা—এই সকল সম্পর্কীয় যাহা কিছু, সমস্তই উহার পরবর্তী বৃত্তগুলির অন্তর্গত, আর সমস্তটি সরু হইয়া আসিয়া একটিমাত্র নির্দিষ্ট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত।

ভারত যে উহার সমালোচকগণের ধারণামত স্থবির ও জীর্ণ হইয়া পড়ে নাই, পরন্তু যুবাবস্থই আছে এবং উহার ভাবী সমৃদ্ধি-বীজ যে পরিপক্ক হইয়াছে, আর উহা যে, এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, পূর্বে যাহা কখনো হয় নাই, এরূপ এক মহান্ বিকাশের পথে পদার্পণ করিয়াছে—এই দৃঢ় বিশ্বাসই ঐ কেন্দ্রস্থানীয় বিন্দু।

কিন্তু একমাত্র আমি তাঁহাকে এই ভাব কথায় প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। খুব শান্তিপূর্ণ একটি মুহূর্তে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি নিজেকে বহু শতাব্দীর পর আবির্ভূত পুরুষ বলিয়া অনুভব করিতেছি। আমি দেখিতেছি যে ভারত যুবাবস্থ।'

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রত্যেক কথাটিতে এই উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার প্রত্যেক গল্পটিতে ইহার স্পন্দন অনুভূত হইত যাহা কিছু ভারত-সংক্রান্ত তাহার জন্য ন্যূনতা স্বীকার করাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন; আর কোন মিথ্যা অপবাদ ও অবজ্ঞাসূচক সমালোচনার তীব্র প্রতিবাদ করিতে করিতে, অথবা কিরূপ বিশ্বাস ভালবাসা লইয়া স্বদেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, তন্ময়ভাবে এই বিষয়ে কাহাকেও শিক্ষা দিতে দিতে কতবারই না মনে হইত, তাঁহার সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহার ভিতর হইতে যোদ্ধার বর্ম বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

* * *

(আর তাই) তাঁহার জাতির উদ্দেশ্যে, প্রতিটি ব্যক্তির উদ্দেশ্যে একটিমাত্র বাণীই তিনি বারবার উচ্চারণ করিয়াছেন: 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ ও আবেগময়ী বক্তৃতা এবং অমর লেখনী সহায়ে নানাভাবে তাঁর মহান্ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সেই সব বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ এবং 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে (Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda)' ও স্বামী মাধবানন্দ অনূদিত 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি (The Master as I Saw Him)' গ্রন্থদ্বয় হতে বিশেষ বিশেষ অংশ সংকলিত হল।

ষাট বৎসর পূর্বে যখন কলিকাতায় কলেজে পড়িতাম তখন সভা সমিতিতে ভগিনী নিবেদিতার বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। কারণ এই বিদেশিনী মহিলার জীবনকাহিনী তখন যেটুকু জানিতাম তাহাতেই আমাদের ছাত্র-মহলে তাঁহার প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধার ভাব ছিল। ব্রহ্মচারিণীর বেশে এই আইরিশ-দুহিতা যখন বক্তৃতা করিতেন শ্রোতৃগণ মুগ্ধচিত্তে তাঁহার উদ্দীপনাময় বাণী শুনিয়া অভিভূত হইতেন। তখন স্বদেশীর যুগ—ছাত্র-মহলে দেশপ্রেমের বন্যা প্রবাহিত—ভগিনী নিবেদিতার ওজস্বিনী বক্তৃতায় আমরা দেশমাতৃকার বাণীমূর্তি দেখিতাম। বহু বৎসর অতীত হইয়াছে—কিন্তু এখনো মনে পড়ে এই অধঃপতিত জাতির এক মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি শিক্ষা-দীক্ষা আচাব-ব্যবহারে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যাহাতে দৃষ্টি পড়ে নানাভাবে তাহার প্রেরণা যোগাইতেন।

জীবনের প্রারম্ভে তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল জীবনের সায়াহ্নে তাহা শতগুণে বর্ধিত হইয়াছে। তাঁহার কর্মময় জীবনের বিচিত্র কাহিনী পাঠ করিয়াছি, তাঁহার চিন্তাশীল লেখার সহিত পরিচিত হইয়াছি—বাংলাদেশের তথা ভারতের সেই নবজাতীয়তার উন্মেষের যুগে তিনি যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কতকটা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই দেশকে তিনি যে কিরূপ ভালবাসিতেন, ইহার কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রতি তাঁহার কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল—ইহার সর্ববিধ উন্নতির জন্য তিনি যে সমগ্র জীবন কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত কিরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন—ইহা ভাবিলে এই মহীয়সী মহিলার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার আবেষ্টনে জীবন যাপন করিয়াও বাংলাদেশের

সমাজে বহু দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া তিনি অবিচলিত ধৈর্যে ইহার সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন—আর্তের সেবা, নারীজাতির শিক্ষা ও আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের জন্য তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

তাঁহার গুরুর প্রতি অনন্যসাধারণ ভক্তিই এই দুর্গম জীবন যাত্রায় তাঁহার সহায় ছিল। তাঁহার জীবন ও কর্মের দ্বারা তিনি গুরুদত্ত নাম 'নিবেদিতা' যেভাবে সার্থক করিয়াছিলেন তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না।

এই মহীয়সী মহিলার মননশীলতার গভীরতা ও বিস্তার সত্যসত্যই বিস্ময়ের বস্তু। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজনীতিক বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত তিনি সহযোগিতা করিয়াছেন। ভারতীয় শিল্পের সম্বন্ধে তিনি নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারকে প্রেরণা জোগাইয়াছেন।

তাঁহার জীবনের মহত্তম ব্রত ছিল নারী-শিক্ষার উন্নতি। ইহার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা মিলে না। তাঁহার নামে পরিচিত বালিকা বিদ্যালয়টি তাঁহার স্মৃতির উপযুক্ত স্তম্ভরূপে চিরকাল বিরাজ করিবে—এই আশার বাণী উচ্চারণ করিয়াই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি সমাপ্ত করিলাম।

আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে মার্কিন নারীর ভূমিকা — স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

১৮৯৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর চিকাগো শহরের রাজপথে ভ্রমণক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসাকাতর, গৃহে গৃহে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া ব্যর্থমনোরথ, অপরিচিত বেশভূষাধারী বিদেশী বলিয়া উপহাসিত, ভগ্নহৃদয়, বিপন্ন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে পথিপার্শ্বের এক অট্টালিকার দরজা খুলিয়া যিনি সাদর অভ্যর্থনাসহ ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া বৃহৎ মাতৃহৃদয়ের স্নিগ্ধ মমতা দিয়া আগন্তুকের দেহ ও মনকে সুস্থ করিয়াছিলেন তিনি একজন আমেরিকান নারী। সেই দারুণ সংকটক্ষণে স্বামীজীর সম্মুখে দাক্ষিণ্যমূর্তি দেবীর মত এই মহীয়সীর আবির্ভাব না ঘটিলে চিকাগো ধর্মসম্মেলন-সম্পৃক্ত তাঁহার জীবনের গৌরবময় অধ্যায়টি আদৌ লিখিত হইত কিনা কে জানে? সুজাতার ভক্তিনিবেদিত পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া অনাহারক্লিষ্ট সিদ্ধার্থ শরীর-মনের হৃত সামর্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন এবং ধ্যানে বসিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মিসেস হেলের সেবাযত্নে পথশ্রান্ত বৈরাগীর দেহমনের শক্তি উজ্জীবিত হইয়াছিল। পরের দিন ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের মহান্ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সাত হাজার নরনারীর নিকট প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

য়ুরোপে এবং আমেরিকায় স্বামীজীর বেদান্ত প্রচারকার্যের সহিত মিসেস হেলের মত আরও অনেক পাশ্চাত্য নারীর নাম জড়িত। য়ুরোপে ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস সেভিয়ার, মিস মূলার এবং আমেরিকায় মিসেস ব্যাগলি, মিস ওয়ালডো, ভগিনী কৃষ্টিন, মিসেস লেগেট, মিস ম্যাকলাউড, হেল ভগিনীত্রয়, মীড ভগিনীত্রয়, মিসেস এ্যালান প্রভৃতির নাম স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-পাঠকের অবিদিত নয়।

আমেরিকায় দুই বারে স্বামীজী প্রায় চার বৎসর কাটাইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে আমেরিকান মহিলাদের নিকট তিনি যে সহানুভূতি ও সহায়তা পাইয়াছিলেন তাহার জন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। বিদেশের অপরিচিত পরিবেশে ইঁহারা মাতার করুণাময়ী মূর্তিতে এবং ভগিনীর পবিত্র স্নেহে তাঁহার হৃদয়কে উৎসাহদীপ্ত করিয়াছিলেন। কখনো কখনো বহুতর সমালোচনা ও বিরুদ্ধতার মধ্যে এই আমেরিকান নারীগণ নিজেদের আত্মীয়স্বজন এবং ধর্মযাজকদের সতর্কবাণী ও শাসন উপেক্ষা করিয়া ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য এই বিদেশী সন্ন্যাসীর পাশে বন্ধুরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

স্বামীজী চিকাগো হইতে ২৮।১২।১৮৯৩ তারিখে শিষ্য হরিপদ মিত্রকে লিখিয়াছিলেন: 'এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সৎ পুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে বড়ই কম। "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু" :—যে দেবী সুকৃতি পুরুষের গৃহে লক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা—এ কথা বড়ই সত্য। এ দেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন! সকল কাজ এরাই করে।...যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়িতে স্থান দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে—লেকচার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়; কি না করে বলতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণ মুক্ত হবো না।'

২৫।৯।১৮৯৪ তারিখে স্বামীজীর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত একটি পত্রে দেখিতে পাই: 'এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আমি এদের পুষ্যিপুত্তুর, এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা, বাবা, এদের পূজা করলে সর্ব সিদ্ধি লাভ হয়।...এই রকম মা জগদম্বা যদি ১,০০০ আমাদের দেশে তৈরি করে মরতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরব।'

স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানের পর আজ ৭০ বৎসর

অতিক্রান্ত। এই দীর্ঘকালে সারা পৃথিবীতে শিল্প, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ, পরিবার, শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, আমোদ-প্রমোদ—সর্বক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধ মানুষের জীবনের কাঠামোকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছে। স্বামীজী আমেরিকান নারীর যে ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন সে ছবি অনেকাংশে হয়তো আজ বিধ্বস্ত—কিন্তু তথাপি আমেরিকান নারীর আদর্শপ্রিয়তা, বদান্যতা, একটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য অকুণ্ঠিত আত্মত্যাগ এখনও ভুরি ভুরি পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকান নারীর প্রগতিশীলতা বর্তমানে বহু অবাঞ্ছিত ধারায় ছুটিয়া চলিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও ঐ বিপুল দেশের নানাস্থানে এখনো শত শত সহস্র সহস্র তরুণী, যুবতী, প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধা রহিয়াছেন যাঁহারা কোনও মহৎ কাজের সফলতার জন্য প্রভূত উৎসাহ, পরিশ্রম এবং স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ নন। অজস্র নারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, নানাপ্রকার সমাজ-কল্যাণকর প্রচেষ্টায়, তাঁহাদের সেবাবৃত্তি অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের যে পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন উহা গত সত্তর বৎসর ধরিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতা শিষ্য এবং প্রশিষ্যগণের দ্বারা ধীরে ধীরে বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এই বিস্তার ও দৃঢ়ীকরণের পশ্চাতে আমেরিকান নারীর যে সহযোগিতা, স্বার্থবিসর্জন, সেবা ও তপস্যা রহিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। যাঁহারা চোখে দেখিয়াছেন তাঁহাদের হৃদয়ে উহা গভীর রেখাপাত করিতে বাধ্য। আমেরিকা প্রধানতঃ খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের দেশ। খৃষ্ট যে সব উপদেশ দিয়াছেন তাহা অনেকাংশে ভারতীয় অধ্যাত্মবাণীর কাছ ঘেঁষিয়া যায়। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে খৃষ্ট এবং খৃষ্টশিক্ষার ওপর শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব পোষণ করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে গির্জা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করা হয় তাহার পটভূমি ও দৃষ্টিভঙ্গী বেদান্তের শিক্ষা হইতে বোধ করি হাজার মাইল দূরে। সাংসারিক ভোগ, সুখ,

নিরাপত্তা, মান প্রতিপত্তির অভিমুখে ব্যাকুল মানুষকে ঐ সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটি অতিলৌকিক উৎসাহ ও ভরসা দেওয়াই যেন ঐ ধর্মের কাজ। ভগবান মানুষের অশেষ বোকামি কাম মোহ হিংসা দ্বেষ ও প্রমত্ত বাসনার পরিপোষক ছাড়া আর যেন কিছু নন। খৃষ্টকে পরিত্রাতারূপে বিশ্বাস করিলে সাংসারিক সুখের সকল দরজা খুলিয়া যাইবে এবং মৃত্যুর পরও 'স্বর্গ' নামক কোন স্থানে অনন্তকাল ঐরূপ সুখ ভোগ করা চলিবে।. আর খৃষ্টকে যদি না গ্রহণ কর তাহা হইলে নরকের প্রচণ্ড বহ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া কাল-যাপন করিতে হইবে; সে শাস্তির কখনো অবসান হইবে না। আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ খৃষ্টধর্মাবলম্বী ধর্মের ঐরূপ ধারণাতেই সন্তুষ্ট। তাঁহাদের নিকট ধর্মের অভ্যাস মানে রবিবারে (অন্ততঃ বৎসরে একবার ইস্টারের সময়) গির্জায় গিয়া পাদরীর মুখ হইতে ঐ ঘোষণা শুনিয়া আসা। যে দেশে ধর্মের পরিবেশ প্রধানতঃ এবম্বিধ সেই দেশে কেহ যদি আসিয়া বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, অন্তর্দৃষ্টি, ধ্যান-ধারণা, ভগবৎপ্রেম, আত্মজ্ঞানের কথা বলেন তো তাঁহার কথা শুনিবার আগ্রহ বেশী লোকের হইবে না,—ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেই বক্তাকে এবং তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দকে যে অনেক বিদ্রূপ ও সমালোচনা সহ্য করিতে হইবে তাহাও জানা কথা। সেই জন্য যে সকল আমেরিকান মহিলা ভারতীয় সন্ন্যাসীদের নিকট বেদান্ত শিক্ষা করিতে আসেন তাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা, সাহস এবং ভাবগভীরতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ বার বার ধর্মকে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের পরিবিকাশ বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। সেই দেবত্বকে চিরকাল চাপিয়া রাখা যায় না। ভোগৈশ্বর্যবিলাসের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া মানুষ তাহার দেব প্রকৃতিকে কিছুকালের জন্য ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বরাবর নয়। একদিন ভিতরের দেবতা জাগিয়া উঠেন—একদিন জীবনের গভীর প্রশ্ন সারা অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। অতঃ

কিম্, অতঃ কিম্? আমেরিকার লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইবার সুযোগ অবশ্যই কম। কিন্তু কাহারও কাহারও প্রাণে ঐ প্রশ্ন নিশ্চিতই জাগে—মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই জাগে, তাঁহারাই ভারতের সনাতন অধ্যাত্মবাণীর প্রতি আকৃষ্ট হন।

তাঁহারা ঐশ্বর্যবিভব জাতি বিদ্যা সমাজ গৌরব পিছনে রাখিয়া সুদূর ভারতবর্ষের রিক্ত সন্ন্যাসীদের নিকট মাথা নোয়াইতে আসেন। দেশের শত সহস্র গির্জার আড়ম্বরময় প্রচার তাঁহাদিগের প্রাণের ক্ষুধা মিটাইতে পারে নাই। তাঁহারা খোঁজেন নানাপ্রকার মতবাদ দ্বারা অনাবৃত একটি সহজ শুভ্র সত্য যাহা এই পৃথিবীতেই প্রত্যক্ষ করা যায়, প্রত্যক্ষ করিয়া সকল সংশয় এবং মোহ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তাঁহারা অনেক দরজায় আঘাত করিয়াছেন, অনেক পণ্ডিতের বাগ্মিতা শুনিয়াছেন, অনেক পুরোহিতের আশ্বাস পাইয়াছেন, প্রাণ কিন্তু শান্ত হয় নাই। তাঁহারা বলেন, এবার শেষ বারের মত এই নূতন দরজায় ঘা দিয়াছি। এই খোঁজাই শেষ খোঁজা। বেদান্ত যদি প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে না পারে তো কিছুতেই পারিবে না।

আমেরিকান পুরুষের চেয়ে নারীরই হৃদয়ে এই জিজ্ঞাসা, এই ব্যাকুলতা বেশী। আমেরিকান পুরুষ অর্থ রোজগার এবং জাগতিক সিদ্ধির সিঁড়ির পর সিঁড়ি ওঠা লইয়া গলদঘর্ম। তাঁহার খাওয়ার সময় নাই, বিশ্রামের সময় নাই, সূক্ষ্ম কোন চিন্তা বা ভাববিলাসিতার সময় নাই। পরিবারের সকলকে লইয়া সপ্তাহে, মাসে বা বৎসরে একদিন গির্জায় যাওয়া—ধর্মের ব্যাপারে বড় জোর এইটুকু কোনও মতে তিনি করিতে পারেন; তদতিরিক্ত কিছু করিবার সময় ও ঝোঁক তাঁহার নাই। আমেরিকান নারীর কথা আলাদা। যদিও তিনি গৃহস্থালী, বাড়ি, বাগান, ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন, হাটবাজার, রান্নাবান্না প্রভৃতি লইয়া অত্যন্ত কর্মব্যস্ত তথাপি ঘরের বাহিরে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত কোন না কোন আন্দোলনের

সহিত জড়িত থাকিতে খুবই উৎসাহান্বিতা,—ধর্মও ইহাদের অন্যতম। যে মহিলা ধর্মের প্রতি ঝুঁকিয়াছেন তিনি ঐ ঝোঁককে পরিপুষ্ট করিতে সময় ও অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিতা নন। আমেরিকার হাজার হাজার গির্জা টিকিয়া আছে এবং পরিপুষ্ট হইতেছে অনেকটা এই সকল আমেরিকান নারীর বদান্যতায়। ইঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো ধর্মানুরাগ প্রকৃতই গভীর।

বেদান্ত আন্দোলনে যোগ দেওয়া এবং ঐ আন্দোলনকে সহায়তা করা—এই দুইটির জন্য আমেরিকান নারীর পক্ষে কয়েকটি বিষয় অনুকূল, যথা—তাঁহার সুশিক্ষা, স্বাবলম্বন, কর্মোৎসাহ এবং জাতিগত বদান্যতা। আমেরিকায় মেয়েদের সর্ববিষয়ে শিক্ষার সুযোগ অপর্যাপ্ত এবং সহস্র সহস্র নারী যথাসম্ভব সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে আগ্রহবতী। বয়স বেশী হইলেও তাঁহাদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ স্তিমিত হয় না। নাতি-নাতনীর বয়সের তরুণ তরুণীর সহিত বসিয়া প্রৌঢ়ারা কলেজে কোন কোর্স লইতেছেন, ইহা আমেরিকার একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা। 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'—এই মনোভাবটি মার্কিন মহিলার চরিত্রে বেশ গাঁথিয়া গিয়াছে। সেইজন্য যাঁহারা বেদান্তে আসেন তাঁহাদের অনেকেই একটি গভীর অনুসন্ধিৎসা লইয়া আসেন।

বেদান্তের শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত নূতন ; নিজেদের দেশের ধর্মযাজক এবং দার্শনিকদের মুখে তাঁহারা কখনো এ সকল কথা শুনেন নাই। সে জন্য বিষয়গুলি ধারণা করিবার জন্য যে ধৈর্য, অধ্যবসায়, প্রীতি ও বুদ্ধির প্রাখর্য দরকার তাহা তাঁহারা সোল্লাসে অনুশীলন করেন।

মার্কিন নারী অর্থনৈতিক ও পারিবারিক দিক দিয়া আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির অপেক্ষা বহুগুণে স্বাবলম্বী। পুরুষের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি নিজের ভরণপোষণ ভ্রমণ বা নিজের অভিলাষানুযায়ী কোনও ব্যাপৃতি চালাইয়া নিতে পারেন। বেদান্তধর্ম অনুসরণ

করিবার জন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট বহুতর বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু চরিত্রের স্বাবলম্বন বৃত্তির জন্য সেই সকল প্রতিপক্ষতা প্রতিহত করা তাঁহার পক্ষে খুব কঠিন হয় না।

কর্মোৎসাহ আমেরিকান চরিত্রের একটি বিশেষ উজ্জ্বল দিক। কি পুরুষ, কি স্ত্রী,—সকলেই কাজ করিতে উৎসাহী। 'Do it yourself' (নিজে নিজেই করে নাও) হইল আমেরিকার একটি সুপরিচিত স্লোগান। এই স্লোগান অনুসরণ করিয়া আমেরিকান দম্পতী বাড়ি মেরামত ও রং করা, বাগান করা, ঘরে বসিয়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আরও নানা প্রকার জিনিস তৈরী করা, কাপড় জামা .পরিষ্কার করা ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ কাজ আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করেন। রুটি-রোজগারের জন্য গৃহস্বামীকে অধিকাংশ সময় বাহিরেই থাকিতে হয় বলিয়া এই সকল ফালতু কাজের ভার বেশীর ভাগ গৃহলক্ষ্মীরই উপর। অবশ্য স্বামী অবসর মত সাহায্য করেন। ছেলেমেয়েদের লালন-পালন, রান্নাবান্না, বাড়ি-ঘর পরিষ্কার, বাজার-হাট এই সব নিত্যনৈমিত্তিক কাজ তো আছেই। চাকর-চাকরানী রাখা আমেরিকায় অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। খুব বড়লোকরাও উহার চেষ্টা করেন না। নিজেদের কাজ নিজেরা করিয়া লওয়ার নীতি তাঁহারাও সাদরে বরণ করেন।

আমেরিকান নারী যখন বেদান্ত সমিতিতে যোগ দেন তখন তাঁহার স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা একটি নূতন ধারা গ্রহণ করে। একদিন নিজের গৃহসংসার এবং ব্যক্তিগত আরাম ও খেয়ালের সৌকর্যার্থে তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন এখন ঐ শ্রম তিনি নিয়োজিত করতে চান তাঁহার নূতন ভালবাসার পাত্র—বেদান্ত আন্দোলনের জন্য। সেইজন্য আমেরিকার প্রত্যেক বেদান্ত সমিতিতে দেখিতে পাওয়া যায় ভক্ত মহিলারা কাজের পোশাক পরিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত হাসিমুখে সমিতির নানা কাজ দিনের পর দিন করিয়া

চলিতেছেন। ঘর ও আসবাবপত্র পরিষ্কার করা, বাগানের কাজ, হিসাবপত্র রাখা ও টাইপ করা, পুস্তক ও পত্রিকাদি সম্পাদনা, বেদান্ত সাহিত্য বিক্রয় করা, লাইব্রেরীর দেখাশোনা, সমিতির জন্য ব্যাঙ্ক ও অফিসসমূহে যাওয়া-আসা, মন্দিরে বেদীতে ফুল সাজানো, প্রয়োজন মত গাড়ি চালানো, বাজার করা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্ম-শিক্ষার জন্য সমিতির পরিচালিত রবিবাসরীয় স্কুল (Sunday School) পরিচালনা প্রভৃতি কত প্রকারের কাজই না এই সকল মহিলা কর্মীরা করিয়া থাকেন। কোনও প্রকার প্রত্যাশা না রাখিয়া কর্মযোগের বুদ্ধিতে তাঁহারা এই সব কাজ করেন।

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলস্থিত একটি বেদান্ত কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ বনভূমিতে মহিলা কর্মীগণকে বড় বড় মেশিন চালাইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিতে দেখিয়া একবার কতিপয় ভারতীয় ভ্রমণকারী অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক নারীর এইরূপ কর্মশক্তি ভারতে আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। শারীরিক শ্রমের কাজ আমেরিকায় কেহ ছোট কাজ বলিয়া মনে করে না। ভারতীয়দের চোখে মেয়েদের এই ধরনের নানা শ্রমসাধ্য কাজ যতই অস্বাভাবিক মনে হউক, আমেরিকান সমাজে ঐরূপ ধারণার কোনও অবসর নাই।

আমেরিকানরা ডলারের উদগ্র উপাসক সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থ তাহারা যেমন উপার্জন করে, তেমনি খরচও করে দুই হস্তে। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস-ব্যসন মিটাইবার পর যাহা থাকে তাহা তাহারা নানা কাজে ব্যয় করে। জনসাধারণের দানে চলে এমন শত শত প্রতিষ্ঠান আমেরিকার সব অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল বিষয়েরই পরিপোষক প্রতিষ্ঠান আছে। যাঁহারা বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা নিজেদের চরিত্রগত বদান্যতা এই নূতন আন্দোলনের জন্য প্রসারিত করিতে কুণ্ঠিত হন না। আমেরিকার জনসংখ্যার তুলনায় বেদান্তানুরাগী নরনারীর সংখ্যা

যদিও একান্তই নগণ্য, তথাপি বিগত সত্তর বৎসর ধরিয়া এই আন্দোলনের জন্য আমেরিকান ভক্তেরা কম টাকা ব্যয় করেন নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শাখাকেন্দ্র লইয়া বর্তমানে মোট ১৭টি বেদান্ত-কেন্দ্র আছে। উহাদের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বাড়ি রহিয়াছে। সকল কেন্দ্রের আর্থিক অবস্থা অবশ্য সমান নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি কেন্দ্রের যাবতীয় খরচ কেন্দ্রের ভক্ত ও বন্ধুগণই বহন করেন। যেহেতু তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, সেইজন্য মোট ব্যয় মিটাইবার জন্য প্রত্যেককে বেদান্তসমিতির জন্য বেশ স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। এমন অনেক মহিলা আছেন যাঁহারা নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ব্যক্তিগত অন্যান্য বিষয়ের খরচ যথাসম্ভব কমাইয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন তাহা সমিতির কাজে দান করেন। প্রমত্ত ভোগ-বিলাসের দেশে যদি কেহ ভোগবিমুখ হয়, সাদাসিধা অনাড়ম্বর সংযত জীবন যাপন করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের নিকট সাধারণতঃ নানা টিটকারী সহ্য করিতে হয়। বেদান্তানুরাগী ভক্তগণ—বিশেষতঃ যাঁহারা মহিলা—তাঁহারা কিন্তু এই পরিস্থিতি গ্রাহ্য করেন না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের শান্ত প্রকৃতি, অনমনীয় আদর্শনিষ্ঠা, সংযত চালচলন অনেক সময়ে বন্ধুবান্ধবীদেব হৃদয়ে উন্নত প্রভাব বিস্তার করে। বান্ধবীরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবেন, সুদূর ভারতবর্ষের শ্যামবর্ণ ধর্মশিক্ষকগণের নিকট এমন কি ইহারা পাইয়াছে যাহাতে ইহারা এত আত্মতৃপ্ত, এত সাহসী, এত আনন্দময়? কেহ কেহ কৌতূহল বশে বান্ধবীদের সঙ্গে বেদান্তেব বক্তৃতা শুনিতে আসেন। এমনও ঘটে দু-চার বার আসিবার পর তাঁহাদেরও চিত্তে বেদান্তের ছোঁয়াচ লাগে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিতা করিয়াছিলেন এবং ভগিনীও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গুরুনির্দিষ্ট সুমহান ত্যাগ ও সেবার মহাব্রত আশ্চর্য সার্থকতার সহিত উদ্‌যাপিত করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন অসাধারণ তেজস্বিনী

বৈরাগ্যপ্রাণা মহীয়সী নারী। তাঁহার ন্যায় দৃঢ়ব্রতা দলে দলে মিলে না।

তাই দেখিতে পাওয়া যায় যদিও স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় আচার্যশ্রেষ্ঠের সান্নিধ্য ও উপদেশ বহু আমেরিকান নারী লাভ করিয়াছিলেন তথাপি ত্যাগ ও সেবার আদর্শে জীবন সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করা তাঁহাদের অধিকাংশের ভাগ্যে ঘটে নাই। স্বামীজী মাদাম মেরী লুইজ নামক জনৈকা ফরাসী আমেরিকান মহিলাকে সন্ন্যাস দীক্ষা এবং অভয়ানন্দ নাম দিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন বিদুষী, লেখিকা ও বাগ্মী। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকার্যে কিছুকাল সহায়তা করিবার পর ১৮৯৯ সালে ভারতবর্ষে যান। স্বামীজী তখন বেলুড় মঠে রহিয়াছেন। ভারতের নানা স্থানে স্বামীজীর নির্দেশে তিনি বক্তৃতা করিয়া প্রশংসা অর্জন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রীগুরুর প্রতি আনুগত্য রাখিতে পারেন নাই। ভগিনী ক্রিস্টিন হইলেন দ্বিতীয় আমেরিকান মহিলা, যিনি স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ত্যাগব্রতে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার সহিত দীর্ঘকাল ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে রত থাকিয়া তিনি শ্রীগুরুর অভিলষিত কাজে ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহা ছাড়াও আমেরিকায় বেদান্ত আন্দোলনের পরিপুষ্টিতে তাঁহার ভক্তিবৈরাগ্যময় পবিত্র জীবন আমেরিকান ভক্তগণের নিকট আলোকস্তম্ভস্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দের পর স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এবং আরও পরে স্বামী পরমানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া বিভিন্ন সময়ে বহু আমেরিকান নরনারী সর্বত্যাগের আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আমেরিকার বেদান্ত আন্দোলনে এই সকল ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীগণের অবদান কম নয়। গত কুড়ি বৎসর হইল হলিউড বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে হলিউড হইতে আশী মাইল উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগরের তটস্থিত স্যান্টাবারবারা শহরের উপকণ্ঠে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীতে একটি নারী-মঠ স্থাপিত হইয়াছে। নাম—

সারদা মঠ। এই মঠের ব্রতধারিণীদের অনেকে আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। অনুরূপ একটি স্ত্রী-মঠ স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতি কর্তৃক বারো বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার ব্রতধারিণীদের কয়েকজন ব্রহ্মচর্যদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এখনো কেহ প্রব্রাজিকা হন নাই। পাশ্চাত্যদেশে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে অবশ্য নারী সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণী অনেক আছেন-- কিন্তু প্রধানতঃ প্রোটেস্টাণ্ট্ আমেরিকায় নারীদের সর্বত্যাগ করিয়া ভগবৎ সাধনা ও মানব সেবায় জীবন নিয়োগ একান্তই অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। যীশুখৃষ্টের ত্যাগ বৈরাগ্যের উপদেশ প্রোটেস্টাণ্ট্রা আদৌ বুঝিতে পারে না। বেদান্ত আন্দোলনের মাধ্যমে আমেরিকার ধর্মজীবনে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অনুপ্রবেশ ও বিস্তার সত্যই আমেরিকান জাতির পক্ষে অশেষ কল্যাণকর। যে সকল মার্কিন মহিলা ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করিতেছেন তাঁহারা নিজেদের আধ্যাত্মিক বিকাশ ছাড়া বেদান্ত আন্দোলনের পরিপুষ্টি এবং স্বদেশের ধর্মশক্তির সহায়তা এই দুই শুভকার্যের পরিবাহন হইয়াছেন। অতএব তিন দিক দিয়া তাঁহাদের জীবন সার্থক।

বেদান্ত সাহিত্যের সঙ্কলন ও প্রচারে আমেরিকান নারীর ভূয়সী সহায়তা অবিস্মরণীয়। মিসেস ওয়ালডোর উদ্যম ও পরিশ্রম ব্যতীত স্বামী বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। স্বামী অভেদানন্দের ও স্বামী পরমানন্দের বিবিধ বেদান্ত গ্রন্থাবলীর সঙ্কলন ও সম্পাদনায় কত আমেরিকান মহিলা ভক্তের অক্লান্ত পরিশ্রম রহিয়াছে তাহা আমরা ভুলিতে পারি না। ভগিনী দেবমাতা রচিত নানা পুস্তক এবং মিসেস মেরী লুই বার্ক প্রণীত Swami Vivekananda in America—New discoveries বেদান্ত সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষুতে তাঁহার সুদূর সাগরপারের গৌরবর্ণ ভক্তদের দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমেরিকায় যে সকল নারী

বেদান্তকে আবিষ্কার ও গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারা এই গৌরবর্ণ ভক্তগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের ভিতর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং অপরাপর শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদগণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শের তাঁহারা একনিষ্ঠ অনুসারী। ভারতবর্ষের সুখদুঃখ তাঁহাদের হৃদয়ে গভীরভাবে সাড়া জাগায়। ভারত তাঁহাদের নিকট স্বপ্নলোকের পুণ্য স্বর্গ। তাঁহাদের ন্যায় ভারত-বন্ধু ভারতেও খুব বেশী নাই। তাঁহারা ভারতকে ভালবাসিয়া, ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গ্রহণ করিয়া যেমন ধন্যা হইয়াছেন, ভারতজননীও তেমনি এই শুক্লচিত্তা সুকন্যাগণকে পাইয়া গর্বিতা সন্দেহ নাই।

মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুল

মিস ম্যাকলাউড

মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড ছিলেন নিউইয়র্ক সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিসম্পন্না মহিলা। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। ক্রমে স্বামীজী ও তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে নিবিড় বন্ধুত্ব। স্বামীজী তাঁকে 'জো' বা 'জয়া' বলে সম্বোধন করতেন। মিস ম্যাকলাউডের অন্তরে ছিল স্বামীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। প্যারিস থেকে স্বামীজীর সঙ্গে তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হলে সেখানেই নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং ক্রমেই পরস্পর অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। উভয়ের জীবনধারা প্রবাহিত হতে থাকে একই আচার্যকে কেন্দ্র করে। স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর মিস ম্যাকলাউড প্রশ্ন করেছিলেন—'এখন আমি কি করব?' প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন—'ভারতবর্ষকে ভালবাস।' এই নির্দেশ তিনি আজীবন পালন করেন। নিবেদিতা ও ম্যাকলাউড উভয়েরই মনোরাজ্য অধিকার করে ছিল ভারত ও ভারতবাসীর কল্যাণচিন্তা।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়াবি মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস বুল স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে ভারতে আগমন করেন। বেলুড় মঠের জন্য ক্রীত জমিতে অবস্থিত একটি পুরাতন বাড়িতে তাঁরা যখন বাস করছিলেন, তখন নিবেদিতাও তাঁদের সঙ্গিনী হন। ২২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ উৎসবে তাঁরা যোগদান করেন। ১১ই মে (১৮৯৮) স্বামীজী এই তিনজন নবাগতা বিদেশিনীকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেন উত্তর ভারতের পথে। নিছক ভ্রমণই এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল না—মূল লক্ষ্য ছিল অখণ্ড

ভারতাত্মার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় সাধন। এই যাত্রাপথের অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত নিবেদিতার অপরিসীম মনোবেদনা দূর করতে, গুরু-শিষ্যার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রসঙ্গ সমাধা করতে সাহায্য করেছিলেন ম্যাকলাউড।

মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা 'য়ম' (Yum) বলে ডাকতেন। 'য়ম'কে লেখা নিবেদিতার পত্রাবলীর মধ্যে উভয়ের অন্তরঙ্গতার সুরটি কত গভীরভাবে বেজে উঠেছে—নিবেদিতা তাঁর হৃদয়দ্বারটি সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন প্রিয় বান্ধবীর সম্মুখে। 'য়ম' ছাড়া আর কেউ ছিলেন না, যিনি নিবেদিতার ভাল-মন্দ সকল ব্যাপারে একান্ত সহানুভূতির সঙ্গে যোগদান করতে পারেন।

ম্যাকলাউড প্রথম ভারত দর্শনের প্রায় ১৪ বছর পরে দ্বিতীয়বার এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়বার ভারতে আসেন। এই বছরে ৮ই এপ্রিল সিস্টার ক্রিস্টিনের দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে চতুর্থবার পুনরাগমন করে মঠের অতিথিশালায় অবস্থান করেন।

স্বামীজীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্না ম্যাকলাউড তাঁর বেদান্ত প্রচার কার্যে প্রধান সহায়ক ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হলিউডের বেদান্ত সমিতির কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। একবার স্বামীজী কাজের জন্য অর্থাভাবের কথা ম্যাকলাউডকে জানালে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে তিনশত ডলার দান করেন এবং প্রতি মাসে পঞ্চাশ ডলার দেবেন বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ নবপ্রতিষ্ঠিত উদ্বোধন পত্রিকার জন্য ঐ তিনশত ডলার ব্যয় করেন।

স্বামীজী তাঁর এই শিষ্যাতুল্যা রমণী সম্পর্কে বলেছেন—'ইনি রত্নস্বরূপা, এঁর অন্তর সদাই দয়ায় বিগলিত।' ...'ইনি রাষ্ট্রনায়কতুল্য —ইনি রাজ্যশাসন করতে পারেন। আমি মানুষের মধ্যে এরূপ সুদৃঢ় অথচ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই দেখেছি।'

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ, ১৪ই অক্টোবর, ৯১ বছর বয়সে তিনি লস এঞ্জেল্‌সে দেহত্যাগ করেন।

মিসেস ওলি বুল

নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক মিঃ ওলি বুলের পত্নী মিসেস স্যারা ওলি বুল শিকাগো ধর্মমহাসভার পরে স্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হন। এই সদাশয়া মহিলাকে স্বামীজী কখনো 'মা' কখনো 'ধীরামাতা' বলে সম্বোধন করতেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বস্টনে এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের আগস্ট হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে স্বামীজী মিসেস বুলের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। প্রভূত বিত্তের অধিকারিণী মিসেস বুলের প্রদত্ত অর্থেই বেলুড় মঠের পুরাতন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও সন্ন্যাসীদের বাসগৃহ নির্মাণ সম্ভবপর হয়।

মিস ম্যাকলাউডের মত মিসেস বুলও ছিলেন ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরম নির্ভরস্থল। ভারতের সেবাব্রতে আত্মসমর্পিতা নিবেদিতা এই স্নেহশীলা বান্ধবীর কাছ থেকে পেয়েছেন ভালবাসা, লাভ করেছেন বুদ্ধি-পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠে বাস ও উত্তরভারত ভ্রমণকালে উভয়ের হৃদ্যতা ঘনিষ্ঠতর হবার সুযোগ পায়।

১৭ই মার্চ (১৮৯৮) নবাগতা বিদেশিনী ম্যাকলাউড, মার্গারেট নোবল্‌ ও মিসেস বুল শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করেন। 'শ্রীমার এই বিদেশিনীগণের সহিত ব্যবহার অপূর্ব। সকলকেই তিনি 'আমার মেয়ে' বলিয়া সস্নেহ অভ্যর্থনা করিলেন। কেহই কাহারও ভাষা বোঝেন না, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! ভাবের প্রকৃত বিনিময় ঘটে হৃদয়ে, ভাষা তাহার কতটুকুই বা প্রকাশ করিতে পারে!' সেদিন মিস ম্যাকলাউডের অনুরোধে শ্রীমা তাঁদের সঙ্গে একত্র আহারও করেন। ১৩ই নভেম্বর (১৮৯৮) ১৬নং বোসপাড়া লেনে

শ্রীমায়ের দ্বারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন হবার কিছুদিন পরে মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস বুল কয়েকটি দিন নিবেদিতার সঙ্গে ঐ গৃহে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে মিসেস বুল শ্রীমার ফটো তোলবার ব্যবস্থা করলে প্রথমে তিনি কিছুতেই সম্মতি দেন নি। কিন্তু মিসেস বুল যখন বিশেষ অনুনয় করে বলেন, 'মা, আমি আমেরিকায় গিয়ে পুজো করব' তখন শ্রীমায়ের সম্মতি মেলে। পর পর তিনখানি ছবি তোলা হয়। প্রথম দুখানি বর্তমানে সর্বত্র সুপরিচিত ও পূজিত।

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে স্বামীজী যখন 'রিজলি ম্যানরে' অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন ভাবাবেগে নিবেদিতা ও মিসেস বুলকে তিনি গৈরিক উত্তরীয় প্রদান করে আন্তরিক আশীর্বাদ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এঁদের মধ্যে তিনি যে দিব্যশক্তি সঞ্চার করলেন, তার দ্বারা ভবিষ্যতে বহু কল্যাণকর কাজ সুসম্পন্ন হবে।

নিবেদিতা যখন অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যে যান, তখন মানসিক সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত অন্তর ও কর্মক্লান্ত দেহের শান্তি ও শক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য মিসেস বুলের সাদর আহ্বানে ব্রিটানীর অন্তর্গত সমুদ্রতীরস্থ ল'ানিয় নামক মনোরম স্থানে এবং নরওয়েতে তাঁর ভবনে কিছুকাল বাস করেন। নরওয়েতে বাসকালীন তিনি The Web of Indian Life নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন। নিবেদিতার সব কাজে ছিল মমতাময়ী স্যারার প্রগাঢ় সহানুভূতি, প্রত্যেক গ্রন্থ রচনায় অসীম উৎসাহ ও সাহায্য। পুস্তক প্রকাশের পর নিবেদিতা শুনেছেন বান্ধবীর অকপট প্রশংসাবাণী।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর। বস্টন থেকে এল অন্তিমপথযাত্রী মিসেস বুলের ব্যাকুল আহ্বান। সে ডাক উপেক্ষা করতে না পেরে নিবেদিতা উপস্থিত হন প্রিয় বান্ধবীর শেষ শয্যাপার্শ্বে। অবশেষে ১৮ই জানুয়ারি (১৯১১) মিসেস বুল এ জগৎ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ

করেন। শোকসন্তপ্তা নিবেদিতা ও ম্যাকলাউড মিলিত হলেন। ম্যাকলাউড তাঁকে দিলেন সান্ত্বনা, আরব্ধ কাজ সম্পর্কে দিলেন উৎসাহ। নিবেদিতার হৃদয়বেদনা অনেকাংশে লাঘব হলো। ২৩শে মার্চ ম্যাকলাউডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন ভারতের পথে। ম্যাকলাউড সেদিন জানতেও পারেন নি এই তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ!

নিবেদিতার সাধন-ক্ষেত্র বালিকা বিদ্যালয়টির ব্যয় নির্বাহের জন্য মিসেস বুল তাঁর উইলে অর্থ দান করে যান। দয়াবতী ও দানশীলা বান্ধবীর অর্থ সাহায্য নিবেদিতাকে আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়।

মিসেস বুলের মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ের রিপোর্টে (১৯১৯-২২) তাঁর উদ্দেশ্যে যে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে, তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো—

'এই প্রসঙ্গে আমরা নরওয়ে-নিবাসী প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ, পরলোকগত মিঃ ওলি বুলের পত্নী পরলোকগতা মিসেস স্যারা সি. বুলের উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইনি শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের পরম অনুগতা এবং ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাকার্যের প্রধান পরিপোষক ছিলেন। প্রথম হইতেই ইনি সিস্টার নিবেদিতাকে নানাপ্রকারে উৎসাহ দান করিতেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে ইঁহারই অর্থে বিবেকানন্দ-পুরস্ত্রী-শিক্ষাকার্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এই কার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ ঘটনার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার সম্পত্তি হইতে আমরা এককালে যে টাকা পাইয়াছিলাম তাহাই বিদ্যালয়ের 'চিরস্থায়ী তহবিলের' মূল ভিত্তিস্বরূপ। তাঁহার স্মৃতিকল্পে এখনও পর্যন্ত প্রতি বৎসর যে টাকা আমেরিকা হইতে প্রেরিত হয় তাহা দ্বারাই এই কার্যের অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে। মিসেস

বুলের এই সহানুভূতি ও বদান্যতায় নিবেদিতা-বালিকা-বিদ্যালয় তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।'

ভগিনী নিবেদিতার দুটি চিঠি

ক্যাসল কারনান্
২০শে জানুয়ারি, ১৯০৩

প্রিয় মিস ম্যাকলাউড,

আজ স্বামীজীর জন্মদিন। সারা সকাল পূজায় কেটেছে, এবং ঘণ্টাখানেক ধরে আমি বিশ্রাম উপভোগ করছি। আগামীকাল কলকাতা যাত্রা করছি আর বাড়ি পৌঁছব মনে করে খুব ভাল লাগছে। স্বামী সদানন্দ চমৎকার লোক।...আমি নূতন করে স্বামীজীর অভিমতের প্রত্যেকটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করছি আর সদানন্দ সম্পূর্ণভাবে তাতে নিবিষ্ট হয়েছেন। তিনি এখন ব্যক্তির পরিবর্তে নীতির কথা বলেন ; সর্বোপরি, ভয় কাকে বলে তা তিনি জানেন না। ইন্‌টেলিজেন্স্ ডিপার্টমেণ্ট অবিরাম প্রশ্ন করে করে নিজেদের মাথা খারাপ করে, তিনি কিন্তু এতটুকু বিচলিত হন না, বরং তেমনি শান্তভাবে আমাকে বেশ ঝাঁঝালো বক্তৃতা দেবার ইঙ্গিত করেন। খুব চমৎকার নয় ?

কিন্তু এবার আমরা পাড়ি দেব। আমি বাগবাজারে মাসিক বার বা পনের টাকায় একটি ছোট বাড়ি নিয়ে সেখানে ছেলেদের রেখে নিজে ট্রেনিং দেব। যে শক্তি থেকে স্বামীজীর উদ্ভব সেখান থেকেই আমার প্রয়োজনীয় অর্থ আসবে। আমি তো ঐ কল্পনা নিয়ে মেতে উঠেছি। আমি দেখছি, যে ছেলেদের স্বামীজীর বলে ভেবেছিলাম তাদের অধিকাংশই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আহ্বানে এসেছে, আর তারা শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্র নিয়েছে। স্বামীজী কেবল আমাদের পাঁচজনকে আহ্বান করেছিলেন। তিনি আরও কয়েকজনকে গ্রহণ করলেন না কেন ? তিনি তো ইচ্ছা করলে শতশত জনকে গ্রহণ

করতে পারতেন। সদানন্দ বলেন শেষের দিকে তাঁর অর্থাভাব হয়েছিল। নিজের আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় ভিক্ষাজীবী সাধুর অপবাদকে ভয় করতেন। তাহলে দেখ, এখানে আমরা জীবনের প্রতি স্বামীজীর নিষ্ক্রিয় মনোভাবের এক নতুন দৃষ্টান্ত পাচ্ছি। তুমি আরও জেনো, যে পাঁচজনকে তিনি আহ্বান করেছিলেন সদানন্দ ও আমার মত আর কেউ তাঁর সঙ্গে এত বেশীদিন কাটায়নি। এই ব্যাপার আমাকে নতুন আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। এবং সদানন্দ আমাকে মঠের পরিকল্পনাটি কাজে পরিণত করার জন্য বিশেষ উৎসাহ দিচ্ছেন, যার ফলে নতুন ধরনের একটি মঠ হবে। আমার উদ্দেশ্য হবে একদল ছেলেকে ছ'মাস কাছে রাখা এবং পরবর্তী ছ'মাস পর্যটনে পাঠানো। আবার ছ'মাস অধ্যয়নে নিযুক্ত রাখা ইত্যাদি। অবশ্য অর্থ নিঃশেষ হলে মঠটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এক মার্কিন মহিলা আমার কাছে আসবার জন্য লিখেছেন। যদি তিনি অর্থ ব্যয় করতে পারেন, আমি খুশি মনে তাঁকে গ্রহণ করবো। আমার খুব ইচ্ছা ১৭নং বাড়িটি একটি প্রকৃত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। কিন্তু আমার কাছে যারা আসবে তাদের সম্বন্ধে লোকে যেন খবরদারি করতে না আসে। আমি চাই না যে আমার কাছে আসার আগে কেউ তাদের পরীক্ষা করুক, বা উৎসাহ দিক বা নিরুৎসাহ করুক। অনেকেই বাতিল করে দিয়েছে এমন উপাদান থেকেই আমি গৃহ গড়ে তুলতে পারি এবং যতক্ষণ তারা আমার নিজের লোক থাকবে ততক্ষণ আমি অন্য কিছু গ্রাহ্য করি না। অধিকন্তু আর্থিক সঙ্গতি সমস্ত পরিকল্পনাকে নিরাপদ করবে।… সুতরাং প্রথমে আমি একজন কর্মীকে গ্রহণ করবো, তাকে ভাল করে শিক্ষা দেবো (ছেলে বা মেয়ে যেই হোক), তারপর তাদের অন্যত্র পাঠাবো। তারা প্রথমেই অপর কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এলে আমার সেই উৎসাহ থাকবে না। ১৭নং থেকে দক্ষিণেশ্বরে এবং বেলুড় মঠে এত সহজে যাওয়া যায় যে তার মধ্যে নিশ্চিতই একটা

আকর্ষণ আছে। সেই সঙ্গে পারিশ্রমিক না দিয়ে একজন ইংরেজ মহিলাকে নেব।...আমি তার করে ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়ি সংলগ্ন জমিটি নিতে বলেছি, যদিও ভাড়া বেড়ে এখন মাসিক পনের টাকা হয়েছে কিন্তু সমস্ত পল্লীর জন্যই ওখানে একটি বাগান করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মনে ক'রো না আমি একটি যন্ত্রমাত্র; যদিও আমি সব কিছুর প্রতি অদ্ভুতভাবে নিরাসক্ত, কেবল কাজ ছাড়া—যে কাজের কোনও শেষ নেই। প্রায় একান্তভাবে নিরামিশাষী হলেও বর্তমানে আমি কোনও দ্বিধা না করে যে প্রকার আহার পাই তাই গ্রহণ করি।

ইতি—
নিবেদিতা
কলিকাতা
৮ই মার্চ, ১৯০৫

প্রিয় মিসেস বুল,

আজ বুধবার। আজ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি। সকালে গোলাপ ফুল নিয়ে মঠে গিয়েছিলাম। তারপরে দুপুর পর্যন্ত কেবল কাজ আর কাজ—আমি একেবারে পরিশ্রান্ত। মনে হয়, সেসব তোমাকে বলতে গেলে কেবল কাজের কথা বলা হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার প্রাণ একটু প্রেমভক্তির কথা বলবার জন্য আকুল।

মন্দ খবরগুলি তুমি নিজেই শুনতে পাবে। বর্তমানে বলবার মত সংবাদ সবই মন্দ। সংগ্রাম প্রতিদিন তীব্রতর হচ্ছে। মানুষের দুর্নীতি দিন দিন বাড়ছে এবং অসাধুতারই জয় হচ্ছে। ফলে তিক্ততার সৃষ্টি। হায়! মা, আমরা কি করতে পারি? এ যেন হাত দিয়ে মহাসাগরের প্রবাহ রোধের ব্যর্থ চেষ্টা। সেইরকম—ঠিক যেন সেইরকমই মনে হচ্ছে।

কিন্তু তবু আধ্যাত্মিক দিক থেকে আজ শ্রীরামকৃষ্ণ একটি শিশু।

শিশুর কাছে আমরা কিছুই চাই না। আমরা তাকে সব দিই—তাই বাতাসও পূজার ভাবে পরিপূর্ণ, আর এই মুহূর্তে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার শব্দ কি মধুর! জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই—এই চিন্তা এখন কি স্বস্তির! সন্ধ্যাবেলা তারার আলো, দ্বিতীয়ার চাঁদ আর প্রার্থনা এ সবই যেন শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মত। সেও তো গোধূলির প্রগাঢ় মাধুর্যের মত—বিশেষ করে যখন তিনি পূজারতা। আহা, কি অপরূপ! কিন্তু অন্য সবদিকে স্বাধীনতার উপর ক্রমাগত আঘাত আসছে—এবং তার ফল ক্রমশঃ মন্দ ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক। এই যে কার্জন নামে ব্যক্তিটি—যেন ঔদ্ধত্য আর দুষ্টামির প্রতিমূর্তি।

অন্যরকম কিছু একটার মধ্যে আশ্রয় নেবার প্রয়োজন আরও বেশী। আমার কত না ইচ্ছা হয় যে গভীরতর শান্তি নিয়ে আসি। আমার জন্য এই শান্তির প্রার্থনা করতে তুমি বিরত হয়ো না; অপরের জন্য সেই স্থির আলোকশিখার জন্য প্রার্থনা করতেও বিরত হয়ো না,—যা কখনো কল্পিত হয় না—যেখানে সকলই বীর্য ও মাধুর্যের সঙ্গে বিবৃত।

তোমার

এম্ (M)

বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে সনাতন ভারতের শাশ্বত বাণীর অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনে, তাঁর বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে ব্রহ্মস্বরূপা যে কয়েকজন বিদেশিনী ভারতকে ভালবেসে তার কল্যাণার্থে মন, প্রাণ নিয়োজিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মিস্ ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুলের নামও চিরস্মরণীয়। স্বামীজীকে কেন্দ্র করে নিবেদিতা, ম্যাকলাউড ও মিসেস বুল প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

রচনাকারের নামহীন এই লেখাটি নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ [নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়] থেকে প্রকাশিত হলো।

ভারতভূমিতে আগমনের পর যে দুটি দিন নিবেদিতার জীবনে স্মরণীয় হয়েছিল এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশেষ স্মরণ-মনন, ধ্যান-ধারণায় যে দিন দুটি তিনি অতিবাহিত করতেন—তার একটি হলো ১৭ই মার্চ (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ)। তাঁর ডায়েরীতে ঐ দিনটি 'Day of days'রূপে উল্লিখিত আছে। ঐ দিন তিনি সংঘজননী শ্রীশ্রীসারদামাতার প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। ছয় বছর পরে এইদিনটির কথা উল্লেখ করে তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—

Calcutta

March 17th, 1904

Dear Miss M,

Six years ago this very day, and on a Thursday too, I saw the Holy Mother for the first time, and went home with you again to the cottage. In the cycle of the years we have come round to the same days again Friday next, March 25th, will be the anniversary of the first day I was called 'Nivedita.' We are, then, entering on the seventh year;—'ছয় বৎসর পূর্বে আজিকার দিনটিতে আমি শ্রীশ্রীমার প্রথম দর্শন লাভ করি এবং তোমার সঙ্গে বেলুড়ে গমন করি। সেদিনও বৃহস্পতিবার ছিল। কালের প্রবাহে পুনরায় আমরা সেই দিনগুলিতে আসিয়াছি। পরের শুক্রবার, ২৫শে মার্চ, যেদিন আমি নিবেদিতা নামে প্রথম অভিহিত হই, তাহার বার্ষিক দিবস। সুতরাং আমরা সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিতেছি।'

শ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয় ১৯১১ সালের এপ্রিল-মে মাসে। ১১ই এপ্রিল দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করে শ্রীমা উদ্বোধনে এসে পৌঁছান। ঐদিনই শ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করতে নিবেদিতা গেলেন উদ্বোধনে। মাসখানেক পর ১৭ই মে শ্রীমা জয়রামবাটী যাত্রা করেন। এই মাসাধিক কাল নিবেদিতা শেষবারের মত তাঁর পূত-সঙ্গ লাভ করার সুযোগ পান এবং শত কাজ ফেলিয়া তিনি ছুটিয়া যাইতেন শ্রীমার নিকট। তাঁহার অন্তরে কে যেন বলিতেছে, 'আর সময় নাই, যাহা করিবার সত্বর করিয়া লও।' মাঝখানের কয়েকটি বছর শ্রীমা যখনই কোলকাতায় এসে থাকতেন, তখনই নিবেদিতা তাঁর পবিত্র সঙ্গ-লাভের সুযোগ পেতেন। প্রায় প্রতিদিনই কিছুক্ষণ তাঁর স্বর্গীয়-সান্নিধ্যে কাটিয়ে ফিরে আসতেন মন আনন্দরসে পূর্ণ করে। উভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধাভক্তি, স্নেহপ্রীতির যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, শুধুমাত্র অনুভব করা যায়। একদিকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন, আর একদিকে কত সহজ সরল স্বীকৃতি। এই যে মাতা ও কন্যার নিবিড় সম্পর্ক, সেখানে বৈষয়িক কোন দান প্রতিদানের কলুষ-ছায়া মাত্র ছিল না, ছিল কেবল অনাবিল আনন্দের আস্বাদন!

ভারতের নারী সমাজকে শিক্ষাদানের অতি দুরূহ দায়িত্ব নিয়ে যিনি এসেছিলেন, গুরুর নির্দেশে তাঁর সর্বপ্রথম প্রয়োজন হয়েছিল ভারতীয় হিন্দু নারীজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের। গুরু বিবেকানন্দ তাই তাঁকে সমর্পণ করেন শ্রীমায়ের পাদপদ্মে। কারণ তিনিই ছিলেন হিন্দু নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। গভীর আগ্রহ ও কৌতূহলে নিবেদিতা নিরীক্ষণ করেছেন তাঁর পবিত্র ও শান্ত জীবন যাত্রা। তিনি সদ্য আগত পাশ্চাত্য রমণী—স্বীয় সমাজে দেখে এসেছেন উচ্চ শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত নারীকুল, দেখে এসেছেন আত্মমর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ, সদা চঞ্চল কর্মপ্রবাহ এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মে নারীশক্তির সার্থক প্রয়োগ।

কিন্তু এখানে দেখলেন এক সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় বিধৃত শান্ত জীবনযাত্রা, যেখানে নেই কোন সোচ্চার আত্মঘোষণা, আছে সর্বজনের কল্যাণকামনায় নিরন্তর নীরব প্রার্থনা, সুষ্ঠু কর্তব্য সাধন। মুগ্ধ হলেন তিনি; তাঁর সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ল আপাত-বৈচিত্র্যহীন জীবনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও শক্তি এবং শ্রীমায়ের চরিত্র মাধুর্য ও মহিমা। 'আত্মীয়-পরিজন, ভক্তবৃন্দ, ভালমন্দ লইয়া বাহ্যতঃ যে সাংসারিক জীবন শ্রীমা যাপন করিতেন, তাহার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে আধ্যাত্মিকতা, পরম নির্লিপ্ততা, প্রেম এবং সর্বোপরি অনির্বচনীয় প্রশান্তি বিরাজ করিত নিবেদিতা তাহার আভাস পাইয়াছিলেন; তাই ভারতীয় নারী চরিত্রের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার সংশয়ের অবকাশ ছিল না।' নিবেদিতার বিস্ময়াবিষ্ট মুগ্ধ-চিত্তের অপূর্ব প্রকাশ দেখতে পাই তাঁর পত্রাবলীতে, The Master as I Saw Him গ্রন্থে।

'অনেকবার ভাবিয়াছি, তোমাকে সেই মহিলার কথা বলিব। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী। নাম সারদা। একজন হিন্দু বিধবার মতই তাঁহার পরিচ্ছদ শুভ্র। এই শুভ্র শাড়ীটি তাঁহার সারা দেহ পরিবেষ্টন করিয়া মাথা পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। যেন পাশ্চাত্য দেশের সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন। তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিলে বোঝা যায়, তাঁহার মধ্যে সাধারণ-বুদ্ধি এবং তৎপরতার কী চমৎকার প্রকাশ! তিনি মাধুর্যের প্রতিমূর্তি—অতি শান্ত, নম্র, স্নেহপ্রবণ, আবার ছোট বালিকার মতই সদা উৎফুল্ল।'

'আমার সব সময় মনে হইয়াছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, না নূতন কোন আদর্শের অগ্রদূত। তাঁহার মধ্যে দেখা যায় সাধারণতম নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্য। তথাপি আমার নিকট তাঁহার শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাঁহার দেবীত্বের মতই বিস্ময়কর মনে হইয়াছে। যত

নূতন বা জটিল কোন প্রশ্ন হউক না কেন, আমি তাঁহাকে উহার উদার ও সহৃদয় মীমাংসা করিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন একটানা নীরব প্রার্থনার মত।'

'আমার ধারণায় তিনি বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।'

'অসীম মাধুর্যে ভরপুর ইনি। কী স্নিগ্ধ ভালবাসা এঁর। অথচ বালিকার মতই হাসিখুশী।'

'সন্ধ্যাতারার আলো, চাঁদের উদয়, আর প্রার্থনার সুর এ সবকিছুই যেন আমাদের শ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মত। প্রদোষের সঘন মধুরিমার মতই তাঁর সঙ্গ—বিশেষতঃ যখন তিনি পূজার আসনে। আহা অপরূপ! অপরূপ!'

'শ্রীমা যখন পূজা করিতে বসেন, তাঁহাকে কী সুন্দর দেখায়! সেই মুহূর্তে আমি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসি।'

'গতকাল শ্রীমা আমাকে দেখতে এসেছিলেন। এমন ভালবাসায় ভরা মুখ আমি কোথাও দেখি নি।'

নিবেদিতার দৃষ্টিতে সারদামাতা ও মেরীমাতা ছিলেন অভিন্ন। বস্টনে পীড়িতা মিসেস বুলের জন্য গীর্জায় প্রার্থনান্তে ফিরে এসে ডায়েরীতে লিখেছেন—'গীর্জায় গিয়েছিলাম। সারদাদেবীকে আমাদের মেরীমাতা বলে মনে হলো। তাঁর সান্নিধ্য শুদ্ধিকর। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায়, আমরা সকলেই তাঁর (শ্রীমার) মত হই।'

নীরবে মায়ের পাশটিতে বসে থাকতেই কি তৃপ্তি, কি শান্তি? শুধু নিজের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্যই নয়, মাকে আরও কত কি দিতে ইচ্ছা হয় নিবেদিতার। ১৯০৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী শ্রীমায়ের আশীর্বাদ লাভে ধন্য নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লেখেন—

'মাতাদেবী এখানে রহিয়াছেন। কি রকম ছোট, রোগা ও কালো হইয়া গিয়াছেন। পল্লীজীবনের কঠোরতাই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ। কিন্তু পূর্বের ন্যায় সেই নির্মল অন্তঃকরণ—নারীত্বের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিতা! তাঁহাকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিবার জন্য কত

জিনিস যে দিতে ইচ্ছা করে! একটি নরম বালিশ, একটি তাক ও একখানি কম্বলের প্রয়োজন। কত জিনিসেরই দরকার!···আমার ইচ্ছা করে, তাঁহাকে একখানি সুন্দর ছবি দিই।'

শ্রীমায়ের কাছে তিনি ছিলেন 'আদরের খুকী', মুগ্ধ, অনুগত কন্যা। 'যখন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট গিয়া বসিতেন, তখন বালিকার ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভাগিনী নিবেদিতা —যাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, যাঁহার বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত নয়নের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত তাহা যেন জগতের সকল রহস্য উদ্ঘাটনেই সমর্থ,—মাতাদেবীর নিকট অবস্থিতা তাঁহাকে দেখিলে যেন পঞ্চমবর্ষীয়া নিতান্ত শিশু প্রকৃতির একান্ত মাতৃ-নির্ভরপরায়ণা বালিকা বলিয়া মনে হইত। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহ-হাস্যে চাহিতেন তখন মায়ের আদুরে বালিকার মত তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, সেদিন তাঁহার যে আনন্দ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—সে আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ঐ সময় চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন এবং অতি যত্নে ধূলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া, তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর একটু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছেন।'

অসাধারণ তেজোময়ী যে নারীর সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে মনোবলসম্পন্ন ও শক্তিমান ব্যক্তি পর্যন্ত অভিভূত হতেন, সেই নারীর এই ভক্ত, উপাসিকা ও মুগ্ধা বালিকা রূপ কি আমাদের মনে কোন প্রশ্ন জাগায় না? প্রথম দর্শনের দিন হতেই শ্বেতবস্ত্রাবৃতা অবগুণ্ঠনবতী রমণীমূর্তির ভিতরে কোন্ অসামান্য রূপকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন? কোন বাহ্যিক রূপের অন্তরালবর্তী প্রকৃত স্বরূপ চিনে নিতে বিশেষ শক্তি ও দৃষ্টির প্রয়োজন। নিবেদিতার

ছিল সেই শক্তি ও দৃষ্টি। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা ছিলেন অনন্ত শক্তির আধার। তাঁর শান্ত ও কোমল মানবীমূর্তির অন্তরাল হতে সেই দেবী-শক্তির চকিত প্রকাশ নিবেদিতা সূক্ষ্ম বোধশক্তি দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই মায়ের সম্মুখে এসে তিনি হতেন মাতৃনির্ভর ও মাতৃ-অনুরাগিনী ছোট শিশুটি।

অন্যদিকে দেখতে পাই প্রথম দর্শনেই সমস্ত সামাজিক বন্ধন ও সংস্কার দূরে ঠেলে দিয়ে আপন কন্যাটির মতই শ্রীমা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, পরিণামে সমাজের কাছ থেকে কত তিক্ত ও বিরূপ সমালোচনার আঘাত তাঁকে সহ্য করতে হবে জেনেও দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। নিবেদিতা লিখেছেন—'বরাবরই তিনি ছিলেন রক্ষণশীলা, কিন্তু আশ্চর্য, পাশ্চাত্যবাসিনীগণকে দেখিবার পর মুহূর্তে তাঁহার রক্ষণশীলতার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। তিনি আমাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া আহার করায় সকলেই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এই আচরণ আমাদিগকে মর্যাদা দান করিয়াছে, আর আমার ভবিষ্যৎ কার্যের সম্ভাবনাকে যতখানি সফল করিয়া তুলিয়াছে, আর কিছুই তেমন পারিত না।'

নানা কথা, নানা ভাবে প্রকাশিত হত নিবেদিতার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ, ভালবাসা। শ্রীমায়ের স্বহস্ত নির্মিত পশমী পাখা পেয়ে আনন্দে অভিভূতা নিবেদিতাকে দেখে মা সস্নেহে বলেন—'কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছো। আহা, কি সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে (স্বামীজী) কি ভক্তিই করে! সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি! এদেশের উপরই বা কি ভালবাসা!' যেদিন শ্রীমা স্কুল দেখতে এসেছিলেন সেদিন নিবেদিতার যেন আনন্দের আর অবধি ছিল না। শ্রীমা এসে পৌঁছানমাত্র তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সাদরে মাকে এনে বসালেন। পুষ্পাঞ্জলির ফুল তুলে দিলেন মেয়েদের হাতে।

ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের পর একদিন ভগিনী কৃষ্টীন ও সুধীরা উদ্বোধনে এলেন। তাঁরা শ্রীমাকে প্রণাম করে বসবার পর তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃষ্টীনের দিকে চেয়ে বললেন,—'আহা, দুটিতে একসঙ্গে ছিল, এখন একলা থাকতে কত কষ্ট হবে! আমাদেরই তার জন্য প্রাণ কেমন করে, তোমার ত আরও বেশী হবে, মা। কি লোকই ছিল! তাঁর জন্য আজ কত লোক কাঁদছে।'

অন্য একদিন সরলাবালার সদ্য প্রকাশিত 'নিবেদিতা' গ্রন্থখানি পাঠ করে মাকে শোনানো হচ্ছে। পাঠ শুনতে শুনতে মায়ের দু'চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। ধীরে ধীরে তিনি বলতে লাগলেন,—'আহা, নিবেদিতার কি ভক্তিই ছিল! আমার জন্য যে কি করবে ভেবে পেত না। রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে আসত, আমার চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিত। দেখতুম, যেন পায়ে হাত দিতেও সঙ্কুচিত হচ্ছে।' পুস্তক পাঠ শেষ হলে আক্ষেপ করে মা আবার বললেন, 'যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা), জান মা?'

ভক্ত ছেলের সঙ্গে শ্রীমায়ের নানা প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন—'ঠাকুর, ভাবাবস্থায় বলেছিলেন, 'এরপর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। আমার যে কত লোক তার কূল-কিনারা নেই!' নিবেদিতা বলেছিল, 'মা আমরাও বাঙালী। কর্ম-বিপাকে ওদেশে জন্মেছি। তা দেখবে আমরাও এমন বাঙালী হয়ে যাব যে ঠিক ঠিক।' ওদের (নিবেদিতা প্রভৃতির) এই শেষ জন্ম।'

বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিতা যখন আমেরিকায় কর্মব্যস্ত তখন শ্রীমা তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে পত্র দেন—'স্নেহের খুকী নিবেদিতা, তুমি আমার ভালবাসা জানিও। তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমূর্তি। আমার সহিত একত্রে তোলা তোমার ফটোটির দিকে আমি অনেক সময় চাহিয়া দেখি; তখন মনে

হয়, তুমি যেন নিকটেই রহিয়াছ। ভগবানের নিকট সর্বদা প্রার্থনা, তিনি তোমার মহৎ উদ্যমে সহায় হউন এবং তোমাকে দৃঢ় ও সুখী করুন। আমার আশীর্বাদ জানিও—আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ কর ইহাই প্রার্থনা। বাস্তবিক তুমি অতি চমৎকার কার্য করিতেছ। কিন্তু বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া যাইও না। নতুবা যখন তুমি ফিরিয়া আসিবে, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিব না।'

মিসেস বুল তাঁর অন্তিমকালে নিবেদিতাকে কাছে পাবার ব্যাকুল ইচ্ছা জানিয়ে বারংবার পত্র দেন। সেই আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে অত্যন্ত চিন্তাকুল ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি আমেরিকায় মিসেস বুলের শেষ শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। সেখান থেকে শ্রীমাকে যে পত্রটি লেখেন তা উচ্চ ভাবময় সঙ্গীতের মতই মধুর; উপলব্ধির গভীরতা ও প্রকাশভঙ্গী অননুকরণীয়।

কেম্ব্রিজ, ম্যাস

রবিবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯১০

আদরিণী মা,

স্যারার জন্য প্রার্থনা করব বলে আজ ভোরে আমি গীর্জায় গিয়েছিলাম। সবাই ওখানে যীশু-জননী মেরীর কথা চিন্তা করছে, আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার সেই মনোরম মুখখানি, সেই স্নেহভরা দৃষ্টি, পরণের সাদা শাড়ী, তোমার হাতের বালা—সবই যেন তখন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। আমার মনে হলো, তোমার সেই দিব্যসত্তাই যেন বেচারী স্যারার রোগকক্ষে নিয়ে আসবে শান্তি ও আশীর্বাদ। আমি আরও কি ভাবছিলাম, জানো মা? ভাবছিলাম, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময় তোমার ঘরে বসে আমি যে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা আমার কি নির্বুদ্ধিতাই হয়েছিল। আমি কেন বুঝিনি যে, তোমার বাঞ্ছিত চরণতলে ছোট্ট একটি শিশুর মত বসে থাকতে পারাটাই তো যথেষ্ট। মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি! আর, তাতে

নেই আমাদের বা জগতের ভালবাসার মত উচ্ছ্বাস ও উগ্রতা। তোমার ভালবাসা হলো এক স্নিগ্ধ শান্তি, যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ এবং কারও অমঙ্গল চায় না। ও যেন লীলাচঞ্চল একটি হৈমদ্যুতি!

কয়েকমাস আগের সেই রবিবারটি কী আশিসই না বয়ে এনেছিল! গঙ্গাস্নানে যাবার ঠিক আগে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার স্নান করে ফিরে এসেই মুহূর্তের জন্য দৌড়ে তোমার কাছে গেলাম। তোমার আনন্দময় ঘরখানিতে তুমি আমায় যে আশীর্বাদ জানালে, তা আমায় দিয়েছিল এক অদ্ভুত মুক্তির অনুভূতি। প্রেমময়ি মা, চমৎকার একটি স্তোত্র বা প্রার্থনা যদি তোমায় লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু তাতেও মনে হয়, বড় বেশী শব্দ করা হবে, সেটা শোনাবে কোলাহলের মত! সত্যই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি! শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম-ধারণের পাত্র। এই সঙ্গহীন দিনে তুমিই রয়েছ তাঁর সন্তানদের কাছে তাঁর প্রতীকস্বরূপ; আর আমাদের উচিত, তোমার কাছে অত্যন্ত স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে থাকা—অবশ্য, কখনো কখনো একটু মজা করা ছাড়া। বাস্তবিকই, ভগবানের যা-কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি সবই শান্ত, নীরব। গোপনে, অজ্ঞাতে তারা প্রবেশ করে আমাদের জীবনে—যেমন বাতাস ও সূর্যের আলো, যেমন বাগানের ও গঙ্গার মাধুর্য। এই সব শান্ত জিনিসই তোমার তুলনা।

বেচারী এস. স্যারাকে তোমার শান্তির উত্তরীয়খানি পাঠিয়ে দিও। রাগদ্বেষের ঊর্ধ্বে যে গহন প্রশান্তি, সময় সময় তোমার চিন্তা সেখানেই সমাহিত হয় না কি? সেই প্রশান্তি কি পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মত ভগবৎসত্তায় স্পন্দমান স্নিগ্ধ আশীর্বাদ নয়, পৃথিবীর সংস্পর্শে যা কখনো মলিন হয় না?

প্রিয়তমা মা আমার,
তোমার চিরদিনের নির্বোধ খুকী
নিবেদিতা।

নিবেদিতা বলিতেন, তিনি যে ভারতবর্ষকে ভালবাসেন, তাহার কতকগুলি কারণ আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তাঁহার মতে ভারত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মমতসমূহের জন্মদাত্রী; তাহার উত্তরে বিরাজ করিতেছে চিরতুষার-মণ্ডিত হিমালয় পর্বতমালা—যাহা সহজেই হৃদয়ে গম্ভীর ও উচ্চ ভাবের উদ্রেক করে। ভারতের পারিবারিক জীবন সহজ, সরল ও সুন্দর; ভারতই বিশেষভাবে মহীয়সী নারীকুলের জন্মদাত্রী। সর্বোপরি, ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে ছাত্র-জীবনের মহান্ আদর্শ ব্রহ্মচর্য পালন। দৃঢ়তার সহিত তিনি বলিতেন, ছাত্র-জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন ব্যতীত প্রাচীন যুগের অমিত বীর্য লাভ অসম্ভব।

নিবেদিতার দেহত্যাগের পর বহুবর্ষ অতীত হইয়াছে। পরিবর্তনশীল জগতে নিত্য পরিবর্তন ঘটিতেছে। ভারতের সমাজ-জীবনের মত ছাত্রজীবনেও বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 'ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং হি তপঃ' অথবা গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন—প্রাচীন যুগের ঐ সকল আদর্শ বা নীতির দ্বারা বর্তমান ছাত্রসমাজ আর পরিচালিত নহে। উহাকে মহৎ ও উচ্চ আদর্শ হিসাবেও যেন আর গ্রহণ করা চলে না। জীবনের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া অধ্যয়নরূপ তপস্যায় মগ্ন হইয়া থাকা নিতান্তই অর্থহীন ও হাস্যকর মনে হয়। নীতি বা আদর্শ কি চিরকাল অপরিবর্তিত থাকিবে? সুতরাং ঐ সকল আদর্শের উল্লেখ না করাই সমীচীন। নীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে রাজনীতি বা পলিটিক্স (Politics) আমাদের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ছাত্রজীবনই বা তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে কি করিয়া? ছাত্রজীবনে রাজনীতির স্থান আদৌ

থাকা সঙ্গত কি না, অথবা থাকিলেও তাহার মাত্রা নিরূপণ করা প্রয়োজন কি না—এসব জটিল প্রশ্ন না তোলাই ভাল। অনেকের মতে ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে দেশের শাসনকার্য পরিচালনায় ছাত্রের অজ্ঞতা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে; বরং ছাত্রজীবনেই ঐ বিষয়ে সর্বশেষ শিক্ষা এবং হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভ বিশেষ প্রয়োজন। অপর পক্ষ বলিবেন, তাহা হইলে ছাত্রজীবনের প্রধান লক্ষ্য তো উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায় ইত্যাদি। 'ছাত্র' শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা কী, ছাত্রজীবনের লক্ষ্যই বা কী—সে সম্পর্কে বহু মতভেদ আছে। তবে সম্ভবতঃ অনেকেই এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট কালই ছাত্রজীবন বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ সময় মূলতঃ জ্ঞানার্জনের সহিত চরিত্রগঠনের কাল, বর্তমানে পরবর্তী কালের জীবিকা-অর্জনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা লাভের কাল। বস্তুতঃ ছাত্রজীবনে চরিত্র গঠনের সঙ্গে চলে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি। অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে ঐ সময়ে লিপ্ত হওয়ার অর্থ ছাত্রজীবনের যথার্থ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া।

ভগিনী নিবেদিতা ছাত্রদের ভালবাসিতেন। তাই তাহাদের নিকট তাঁহার প্রত্যাশা বা দাবী ছিল অনেক। তাঁহার আস্থাও ছিল তাহাদের উপর গভীর। তিনি জানিতেন, তাহারাই দেশের ভবিষ্যৎ। আরও জানিতেন, স্বভাবতই প্রাণের প্রাচুর্যে পূর্ণ, আবেগে মত্ত, উৎসাহে চঞ্চল, তরুণ ছাত্র-সম্প্রদায় নিরন্তর আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছে। সকল বাধা-বিপত্তি চূর্ণ করিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে চাহিতেছে উদ্দামগতিতে। কিন্তু আত্মপ্রকাশের পথ কী ধ্বংসে অথবা সৃজন-শক্তিতে? জীবনের সার্থকতা বিনাশে অথবা সংগঠনে? কত সহজেই তো ধ্বংস করিয়া ফেলা যায়, কিন্তু কোন কিছু গড়িয়া তোলা কত কঠিন! সংসারের দায়িত্ব সম্বন্ধে ছাত্ররা উদাসীন, কর্তব্য সম্পাদনে অনিচ্ছুক, অথচ তাহাদের আগ্রহ দেশের সর্ববিধ ব্যবস্থায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহারা মতামত প্রকাশ করিবে, ইচ্ছামত অংশ

গ্রহণ করিবে;—যাহা মনে হয়, পরস্পরবিরোধী। কিন্তু এই আপাত-বিরোধী মত প্রকাশ, উচ্ছল আবেগ, সুসংযত চিন্তার অভাব এবং পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীনতার সহিত যে কোন কর্মে আত্মনিয়োগ —এ সকলের মূলে আছে অপরিণত বুদ্ধির সহিত আন্তরিকতা এবং মহৎ বা বৃহৎ কিছু করিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। কেবল তাহারা জানে না, কোন পথে সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা লাভ করিবে।

ছাত্র-হৃদয়ের এই গোপন রহস্য নিবেদিতা অবগত ছিলেন। তিনি একান্তভাবে চাহিতেন, তাহাদের মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার সুযোগ তাহারা লাভ করুক। ছাত্রদের জন্য তাই নিবেদিতার একটি কার্যসূচী ছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি চাহিতেন, খেলাধূলা ও ব্যায়ামের দ্বারা তাহারা শরীরের পুষ্টি সাধন করিবে; বিভিন্ন মনীষীর—কেবল স্বদেশের নহে, বিদেশেরও—জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা অধ্যয়ন করিয়া অনুপ্রেরণা লাভ করিবে; সকল দেশের বিভিন্ন যুগের ও জাতির ইতিহাস পাঠ করিয়া পরিমার্জিত বুদ্ধির দ্বারা বিচিত্র উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইবে। সর্বোপরি, অধ্যয়নের অবকাশকালে ছোট ছোট দল গঠন করিয়া ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা করিবে। অবশ্যই ঐ পরিক্রমাকালে যতদূর সম্ভব বিলাস বর্জন করিয়া স্বল্প ব্যয়ে সহজ জীবনযাত্রা অনুসরণ করিতে হইবে। তীর্থ ভ্রমণের মাধ্যমে অখণ্ড ভারতের সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটিবে, ভারতকে তাহারা ভালবাসিতে শিখিবে। ভারতবর্ষ এক আশ্চর্য দেশ! বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা বিভিন্ন; পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সবই পৃথক—অথচ এক মহান্ আদর্শ সমগ্র দেশের জীবনে এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করিয়াছে। সে আদর্শ আধ্যাত্মিক। বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, গুরু-গীতা-গঙ্গা সমগ্র ভারতকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে

আবদ্ধ করিয়াছে। ভারতের অধিবাসী মাত্রেই জন্মসূত্রে কতকগুলি বিশিষ্ট ভাবধারার অধিকারী।

তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল পর্যটনের মাধ্যমে ছাত্রদল ভারতের ঐ অখণ্ড রূপটি আবিষ্কার করিবে—যেমন করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার পরিব্রাজক জীবনে। ভারতের যে কোন বড় তীর্থস্থানে বিভিন্ন প্রদেশের নরনারী সম্মিলিত হয়। সুতরাং ঐ সকল স্থানে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও আচার-ব্যবহার অবলম্বী নরনারীর জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ ও তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা কত সহজ! এইভাবে সহজ মেলামেশার মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও নির্ভরতা গড়িয়া উঠিবে—সকলেই যে এক দেশমাতৃকার সন্তান এই ভাবটি জাগ্রত হইবে এবং তখনই তাহাদের মধ্যে উদ্ভূত হইবে সেই মহান্ জাতীয়তাবোধ—যে জাতীয়তার জাগরণ বিনাশ করিবে সকল বিভেদ, উদ্বুদ্ধ করিবে দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনে অগ্রসর হইতে, বিশ্বের দরবারে গৌরবের সহিত তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে।

এই রকম এক কল্পনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ভ্রমণকালে দেশের সর্বত্র ছাত্রগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতেন। তাহাদের নিকট গীতার ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন, অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করাই জাতীয় ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের জ্বলন্ত আদর্শ ও বাণী প্রচার করিয়া তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম ও দেশের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিতেন।

এই কল্পনায় বিভোর হইয়াই তিনি ছাত্রদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার পরিকল্পনা ছিল, ছাত্রগণ ঐ প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করিয়া ছয়মাস অধ্যয়নে রত থাকিবে এবং ছয়মাস পর্যটনে বহির্গত হইবে, আবার ছয়মাসকাল অধ্যয়ন করিবে। কেবল কল্পনা নহে, অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিতান্তই মধ্যবিত্ত ঘরের একদল ছেলেকে সুদূর হিমালয়ে কেদার-বদরী অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া নিজপুত্র

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঐ দলের সহিত পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, তখন ঐসব পথ অতিশয় দুর্গম ছিল এবং যাত্রীদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই; বেশ কষ্ট স্বীকার করিয়াই তাহাদের যাইতে হইয়াছিল। অর্থাভাবে অন্যান্য পরিকল্পনার ন্যায় নিবেদিতাকে এ উদ্যম পরিত্যাগ করিতে হয়। তথাপি তাঁহার পত্রে বার-বার 'বিবেকানন্দ হোমে'র উল্লেখ দেখা যায়। তিনি ছিলেন 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সোসাইটির উদ্দেশ্যে লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি ছাত্রগণের চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে নিজের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ছাত্রগণকে তিনি ভালবাসিতেন এবং সেইজন্যই তাহাদের চরিত্রে কোন প্রকার ত্রুটি বা গলদ দেখিলে বেদনা বোধ কবিতেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে এবং পরবর্তীকালেও তিনি সর্বদাই চেষ্টা করিতেন ইংলণ্ডে অবস্থিত ভারতীয়গণের সহিত পরিচিত হইতে। ঐ সময়ে তিনি বিলাতে অধ্যয়নরত বহু ছাত্রের সংস্পর্শে আসেন এবং অনেকেরই দাস মনোভাব ও বিদেশীর অনুকরণ স্পৃহা তাঁহার নিকট বিশেষ পীড়াদায়ক ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় বক্তৃতা দিতে উঠিয়া লর্ড কার্জন যখন প্রাচ্যদেশবাসীর সত্যবাদিতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করেন, তখনই ক্রোধে, অপমানে উদ্দীপ্ত নিবেদিতা কীভাবে অমৃতবাজার পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ করেন—সে কাহিনী অনেকেই অবগত আছেন। ঐ বক্তৃতা সভায় লর্ড কার্জনের ভাষণে অপমানিত বোধ করিলেও শ্রোতৃবৃন্দের কেহই কোন প্রত্যুত্তর করে নাই, নিবেদিতা উহাতে বিশেষ আহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রবন্ধে অগ্নিময়ী বাণী নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যে ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাদের নীরবতা প্রশংসনীয়, কিন্তু পূর্বপুরুষগণের প্রতি অভিযোগ নিঃশব্দে সহ্য করা সঙ্গত হয় নাই।'

ছাত্রদের অশিষ্ট আচরণ তিনি কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেন

না। ছাত্রগণ 'ডিসিপ্লিন' ভঙ্গ করিবে ইহা তাঁহার নিকট ছিল অসহ্য। একটি ছাত্রের অশিষ্ট আচরণ লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'we ought to hammer them'—অর্থাৎ উহাদের কঠোর হস্তে শাসন করা উচিত। আবার ছাত্রটি দুর্বল দেখিয়া ব্যায়াম ও ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলাধূলা করিয়া শরীর সবল করিবার উপদেশও তাহাকে স্নেহের সহিত দিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে কোন মেয়ে অন্যায় করিলে অথবা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে তিনি কঠিন কণ্ঠস্বরে তাহাদের ঐরূপ করিতে নিষেধ করিতেন; আবার সস্নেহে 'আমরা নিশ্চয় পারব, নিশ্চয় করব' ইত্যাদি বলিয়া তাহাদের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিতেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ বিভাগ আইনে পরিণত হইবার পূর্বে ও পরে ছাত্রদের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ার ও 'ফীল্ড অব একাডেমী'তে বহু সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ঐ সকল সভায় নিবেদিতা একাধিকবার জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়াছেন। নিবেদিতা তাঁহার ডায়েরীতে স্বপ্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়, স্থান, তারিখ এবং সময় লিখিয়া রাখিতেন। ঐ সময়ে ডায়েরীতে যে সব বক্তৃতার উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলির বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক। সংবাদপত্রেও ঐসব সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিবেদিতার নামোল্লেখ দেখা যায় না। বস্তুতঃ ছাত্র সভাসমিতিতে তাঁহার বক্তৃতাগুলি ছিল স্বদেশ অথবা জাতীয়তামূলক।

একথা সত্য, দেশ তখন পরাধীন এবং নিবেদিতা চাহিতেন, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ছাত্রগণ যেন নিশ্চেষ্ট না থাকে। পাটনায় 'পাটলীপুত্র হিন্দু বালক সংঘ' কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া নিবেদিতা ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, তাহাদের সর্বদা চিন্তা করা কর্তব্য ভারত তাহাদের নিকট কী প্রত্যাশা করে। মহাভারতের কথা তাহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। বক্তৃতার শেষে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের লক্ষ্য হোক মাতৃভূমির কল্যাণ। মনে রেখো, অখণ্ড ভারতই তোমার দেশ এবং এই দেশের বর্তমান প্রয়োজন কর্ম।

জ্ঞান, শক্তি, সুখ ও ঐশ্বর্য লাভের জন্য চেষ্টা কর। ঐগুলিই যেন তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়। আর যখন সংগ্রামের আহ্বান আসবে, তখন যেন তোমরা নিদ্রায় মগ্ন থেকো না।'

সাধারণতঃ ছাত্রদের জন্য তাঁহার কার্যসূচীর মধ্যে রাজনীতির স্থান ছিল না। তরুণ শিল্পীগণকে তিনি বারংবার সাবধান করিতেন, আর্টের সাধনা ত্যাগ করিয়া তাহারা যেন পলিটিক্সে যোগদান না করে। বস্তুতঃ তাঁহার অভিমত ছিল ছাত্রাবস্থায় ছেলেরা উপযুক্ত শিক্ষালাভের সহিত সর্বতোভাবে নিজেদের চরিত্র গঠন করিবে যাহাতে ভবিষ্যতে তাহারা দেশমাতৃকার জন্য সংগ্রামে এবং দেশের সংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। 'শিক্ষা' সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁহার গভীর চিন্তা বর্তমানেও সমান মূল্যবান। নিবেদিতা বলিতেন, শিক্ষার্থীকে মনে রাখিতে হইবে, তাহার উন্নতিব লক্ষ্য কেবল আত্মকল্যাণ নয়, পরন্তু জন-দেশ-ধর্মই তাহার প্রধান লক্ষ্য।

এক হিসাবে নিবেদিতাকে প্রাচীনপন্থী বলা যাইতে পারে। কারণ ছাত্রজীবনে প্রাচীন ভারতের আদর্শ ব্রহ্মচর্য পালনের উপর তিনি অতিশয় গুরুত্ব প্রদান করিতেন। তাঁহার এক বক্তৃতায় নারীগণের নিকট আকুল আবেদন জানাইয়া বলিয়াছিলেন, 'হিন্দুমাতা তাঁহার ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের তৃষ্ণা পুনরায় জাগাইয়া তুলুন। এ ছাড়া জাতির পক্ষে তাহার প্রাচীন বীর্যলাভ সম্ভব নহে। ভারত ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথাও ছাত্রজীবনের এমন মহান্ আদর্শ নাই ; এখানেই যদি উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে আর কোথায় তাহাকে রক্ষা করিবার আশা করা যাইতে পারে ? ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও মহত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রত্যেক জননী যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁহার সন্তানগণ মহৎ হইবে।'

ছাত্রগণের জন্য নিবেদিতার চিন্তাধারা বা কার্যসূচীর সার্থকতা বর্তমানে কতখানি বলা কঠিন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল বিশ্বের দরবারে

ভারতমাতার গৌরবপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। তাহার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন। উহারই পরিপ্রেক্ষিতে সকল সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা ও তদনুযায়ী কার্যধারা গ্রহণ ছিল একান্তই স্বাভাবিক। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, সেইসব সংগ্রামে বহু ছাত্র তাহাদের অমূল্য জীবন আহুতি দিয়াছে। বর্তমানে লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা কতখানি আছে তাহা বলা কঠিন। কারণ সর্বস্তরেই ধীরভাবে চিন্তা করিবার মত মানসিক স্থৈর্যের অভাব। বলা বাহুল্য, লক্ষ্য ঠিক থাকিলে কর্মপদ্ধতি স্থির করা সহজ হয়। দেশের এক সংকট মুহূর্তে নিবেদিতার আগমন। অতি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তখন সমগ্র জাতির সামনে একটা আদর্শ ছিল—ছিল এক মহৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য, লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য নিবেদিতা যোদ্ধার ন্যায় সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। সে সংগ্রাম কেবল বিদেশীর বিরুদ্ধে নহে। সর্বতোভাবে দেশকে উন্নত করিবার জন্য যে অনলস সাধনা তাহাই কঠোরতর সংগ্রাম। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে গুরুর মতই যে ঠিক এ বিষয়ে তাঁহার কোন সংশয় ছিল না। সেই সঙ্গে সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, শিক্ষায়—এক কথায় জীবনের সর্বস্তরে ভারতকে উন্নত করিবার স্বপ্নই তিনি দেখিয়াছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মেয়েদের 'ছাত্রজীবন' বলিয়া কিছু ছিল না। সুতরাং পৃথক করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রশ্ন নিবেদিতার মনে না উঠিবারই কথা; যদিও মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বহু চিন্তা করিয়াছেন, তাহাদের নানা সমস্যা সম্বন্ধেও সুচিন্তিত অভিমত সহকারে সমাধানের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে অন্যান্য অগ্রণী রাষ্ট্রগুলির সহিত তুলনায় বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেও ভারতের ছাত্রীসংখ্যা কোনক্রমেই নৈরাশ্যজনক বলা যায় না। সম্প্রতি Home Science বা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রবর্তিত করিয়া মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য আমদানী করিবার চেষ্টা

হইলেও মূলতঃ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় অভিন্ন এবং দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ছাত্রীই ছাত্র-সংস্থাগুলির বিধান মানিয়া লইয়া নির্বিবাদে তাহাদের সর্ববিধ আচরণের অনুকরণে রত। মৌলিকতা অথবা চিন্তাশক্তির অভাবই কি উহার হেতু? সে যাহা হউক, একথা বোধ করি নিশ্চয় করিয়াই বলা চলে যে, নিবেদিতার পুস্তকাবলীর পঠন-পাঠন ছাত্রীগণের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করিবে, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করিবার সহায়তা করিবে।

ছাত্রজীবনের জন্য নিবেদিতার কর্মসূচী অনুশীলন করা কতখানি সম্ভব, অথবা আদৌ সম্ভব কিনা তাহার সমাধানের ভার ছাত্র-ছাত্রীগণের উপর।

জীবন-পঞ্জী

একটি পরম আশ্চর্য জীবন কাহিনী। জড়বাদী পাশ্চাত্যের মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণ করে, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেষ্টনীতে বর্ধিত হয়ে মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল কেমন করে ধীরে ধীরে ভারতের একান্ত আপনার 'ভগিনী নিবেদিতা'য় জন্মান্তর গ্রহণ করলেন সে কাহিনী অতি বিস্ময়কর ও গভীর প্রেরণাদায়ক। জটিল ও মহৎ ঘটনাবর্তে তরঙ্গায়িত সেই অনতিবিস্তৃত জীবন-প্রবাহ। সেই অবিস্মরণীয় জীবন-কাহিনীর অতি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনার পরিচয় দেওয়া হলো।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ, ২৮শে অক্টোবর—উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের টাইরণ প্রদেশের ডানগ্যানন নামক ক্ষুদ্র শহরে জন্মলাভ করেন।

১৮৭৭ খৃঃ—পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ডের মৃত্যু।

১৮৮৪ খৃঃ—বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও শিক্ষয়িত্রীরূপে কেসউইক গমন করেন।

১৮৮৬ খৃঃ—রেক্সহ্যামে, ১৮৮৯ খৃঃ চেস্টারে, ১৮৯০ খৃঃ উইম্বলডনের বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ।

১৮৯২ খৃঃ—উইম্বলডনে স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কাজ শুরু।

১৮৯৫ খৃঃ—নভেম্বর—লণ্ডন শহরের ওয়েস্ট এণ্ডে (West End) লেডি মার্জেসনের গৃহে স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

১৮৯৮ খৃঃ—২৮শে জানুয়ারি—ভারতসেবার ব্রত নিয়ে ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় প্রথম পদার্পণ।

২৭শে ফেব্রুয়ারি—প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গমন ও বেলুড়ে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ জন্মোৎসবে যোগদান।

১১ই মার্চ—স্টার থিয়েটারে মিস্ নোব্‌লের প্রথম বক্তৃতা দান।

১৭ই মার্চ—সংঘ জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর দর্শন লাভ।

২৫শে মার্চ, শুক্রবার—'The Day of Annunciation'—মিস্ নোব্‌ল স্বামীজী কর্তৃক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন ও গুরু প্রদত্ত 'নিবেদিতা' নাম গ্রহণ করেন।

১১ই মে, বুধবার—স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণ-উদ্দেশ্যে যাত্রা।

১লা নভেম্বর—কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৩ই নভেম্বর—১৬নং বোসপাড়া লেনে শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারা বিদ্যালয়ের উদ্বোধনকার্য সুসম্পন্ন।

১৮৯৯ খৃঃ—কলিকাতায় প্লেগ মহামারীর পুনরাবির্ভাব—সেবাকার্যে নিবেদিতার আত্মনিয়োগ।

২০শে জুন—স্বামীজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতার পাশ্চত্য অভিমুখে যাত্রা।

৩১শে জুলাই—ইংলণ্ডে অবতরণ।

২০শে সেপ্টেম্বর—নিউইয়র্কের 'রিজলি ম্যানর'-এ আগমন।

২১শে সেপ্টেম্বর—স্বামীজীর নিকট নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতার নূতন পরিচ্ছদ গ্রহণের সংকল্প প্রকাশ এবং আদর্শের প্রতি শিষ্যার দৃঢ়তা ও অনুরাগ দর্শনে প্রীত স্বামীজীর 'শান্তি' নামক সুপরিচিত কবিতাটি উপহার দান।

১৯০০ খৃঃ—২৮শে জুন—প্যারিস অভিমুখে যাত্রা—প্যারিসের স্মরণীয় প্রদর্শনীর কাজে অধ্যাপক গেডিজকে সাহায্য দান।

১৯০১ খৃঃ—২১শে মে—নরওয়ে আগমন; The Web of Indian Life গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদ রচনা।

১৯০২ খৃঃ—৩রা ফেব্রুয়ারি—ভারতে পুনরাগমন।

১১ই মে—ভগিনী ক্রস্টীন ও জাপানী শিল্পী ওকাকুরা সহ নিবেদিতার মায়াবতী গমন।

২৬শে জুন—প্রত্যাবর্তন।

২৮শে জুন, শনিবার—নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য স্বামীজীর ১৭নং বোসপাড়া লেনে আগমন।

২রা জুলাই—বেলুড় মঠে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতার শেষ সাক্ষাৎ।

৪ঠা জুলাই, শুক্রবার—মহাসমাধিযোগে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ

২১শে সেপ্টেম্বর—Nation making-এর ব্রত নিয়ে ভারত ভ্রমণ ও বক্তৃতাপর্বের শুরু।

অক্টোবর—বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯০৫ খৃঃ—১১ই ফেব্রুয়ারি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রাচ্যদেশবাসীর সত্যতার প্রতি লর্ড কার্জনের অপমানজনক কটাক্ষ; পরদিবস 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় অনলবর্ষী ভাষায় বেনামীতে নিবেদিতার প্রতিবাদ প্রকাশ।

৭ই আগস্ট—বঙ্গভঙ্গ আইনের প্রতিবাদে টাউন হলের সভায় যোগদান।

ডিসেম্বর—কাশীতে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান।

১৯০৬ খৃঃ—সেপ্টেম্বর—পূর্ববঙ্গের বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে গমন।

১৯০৭ খৃঃ—আগস্ট—পুনর্বার পাশ্চাত্যে গমন।

১৯০৯ খৃঃ—২৬শে জানুয়ারি—নিবেদিতার উপস্থিতিতে মাতা মেরীর পরলোক গমন।

১৮ই জুলাই—কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৯১০ খৃঃ—১লা ফেব্রুয়ারি—The Master as I Saw Him

গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ। এই সময়ে কর্মযোগিন্ পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ।

জুন—কেদারবদরীর পথে তীর্থযাত্রা।

১৫ই নভেম্বর—মিসেস বুলের গুরুতর পীড়ার সংবাদে বস্টনে গমন।

১৯১১ খৃঃ—১৮ই জানুয়ারি—মিসেস বুলের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

৯ই এপ্রিল—কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। পূজাবকাশে দার্জিলিঙ্ যাত্রা।

১৩ই অক্টোবর, শুক্রবার—সকাল সাতটায় মহাপ্রয়াণ।